তফসীরে
নূরুল কোরআন
তৃতীয় পারা
৩

মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম

তৃতীয় খণ্ড

তফসীরে নূরুল কোরআন

তৃতীয় পারা

৩

তৃতীয় খণ্ড

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, মাসিক আল-বালাগ, তফসীরকার রেডিও বাংলাদেশ, প্রাক্তন সদস্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বোর্ড অফ গভর্নরস, মরহুম ইমাম ও খতীব লালবাগ শাহী মসজিদ এবং বহু দ্বীনি গ্রন্থ প্রণেতা

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রঃ)

আল-বালাগ পাবলিকেশন্স

ঢাকা

তৃতীয় প্রকাশ ঃ মার্চ-২০১১
চৈত্র-১৪১৭
রবিউস সানী-১৪৩২

প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান

সর্বস্বত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণে ঃ এ. এন. প্রিন্ট এণ্ড প্যাকেজ
৫/২, গির্দা উর্দূ রোড,
বখশীবাজার, ঢাকা।

হাদীয়া ঃ ৩০০ টাকা

পরিবেশক

গাউসিয়া পাবলিকেশন্স
১১, বাংলাবাজার (ইসলামী টাওয়ার) ঢাকা-১১০০
ফোন-৯৫৫৮৯১৩, মোবাইলঃ ০১৯৭৩০১৪৮৮৯

প্রাপ্তিস্থান

আল-বালাগ কার্যালয়
১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড,
মোহাম্মদপুর, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল ঃ ০১৭১৩০১৪৮৮৯

আন-নূর পাবলিকেশন্স
৫২, বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোন ঃ ৭১৭৩৭২১

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা

Tafseer-e Nurul Quran (3): By Hazrat Moulana Mohammed Aminul Islam. Published Bby Al-Balag Publications, 12/17, Sir Sayed Ahmed Road, Mohammedpur, Block-A, Dhaka-1207, Mobile : 01713014889 Price : 250.00
ISBN-978-984-33-3154-0

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ্ পাকের জন্যে যাঁর করুণা-সমুদ্রে আমরা সর্বদা নিমজ্জিত রয়েছি, যাঁর বিশেষ রহমতে তফসীরে নূরুল কোরআনের তৃতীয় খণ্ড (পারা-৩) প্রকাশিত হলো। এজন্যে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে পেশ করি সেজদায়ে শোকরানা। আল্লাহ্ পাকের তওফিক ব্যতীত এ মহান কাজ কোন ভাবেই সম্পন্ন হতোনা।

যাঁর উসিলায় পেয়েছি আল্লাহ্ পাকের তওফিক, যাঁর সৌজন্যে আমাদের প্রতি বর্ষিত হচ্ছে অহরহ আল্লাহ্ পাকের রহমতের বারিধারা, তিনিই তো আমাদের প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তাঁর প্রতি পেশ করি অগণিত দরুদ ও সালাম।

বিশ্ব মানবের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, যখনই মানব জাতি পথভ্রষ্ট হয়েছে, আদর্শচ্যুত হয়েছে এবং বিপদগ্রস্ত হয়েছে তখনই মরণোন্মুখ মানব সমাজকে রক্ষা করতে আগমন করেছেন আল্লাহ্র নবী রসূলগণ যুগে যুগে, বিভিন্ন দেশে ও পরিবেশে। তাঁরা নিয়ে এসেছেন মহান স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাকের পবিত্র বাণী, মহান শিক্ষা। এ শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমেই অধঃপতিত জাতি সমূহ পৃথিবীতে উন্নতি লাভ করেছে, মৃত-প্রায় জাতি সন্ধান পেয়েছে নব জীবনের। বণী ইসরাইল জাতি এক কালে ছিল বিপদগ্রস্ত, জালেম ফেরাউন ছিল তাদের প্রতি জুলুম অত্যাচারে খড়গহস্ত, তাদের জীবন ছিল দুর্বিষহ কিন্তু যখন তারা হযরত মূসা (আঃ)-এর নেতৃত্ব মেনে নিলো এবং তাঁর মাধ্যমে অবতীর্ণ আসমানী হেদায়েতের অনুসরণ করলো তখন এ ভাগ্যাহত জাতির ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো। জালেম ফেরাউনের জুলুম থেকে তারা নাজাত পেলো, ফেরাউন তার দলবল সহ লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হলো। বণী ইসরাইলের দুর্দিনের বদলে সুদিন এলো। আর তা সম্ভব হলো আসমানী হেদায়েত কবুল করার মাধ্যমে। যদিও পরবর্তীতে বণী ইসলাইল জাতি যখন আসমানী হেদায়েত প্রত্যাখ্যান করে তখন তারা পুনরায় আল্লাহর কোপগ্রস্ত হয়। পবিত্র কোরআনের ভাষায় ঃ

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ الاية

তাদের উপর অপমান ও দারিদ্র নিপতিত হলো। পুনরায় তারা আল্লাহর কোপগ্রস্ত হলো। এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, যখন কোন জাতি আসমানী হেদায়েত গ্রহণ করে তখন সে সম্মানিত হয়, আর সেই একই জাতি যখন আসমানী হেদায়েত প্রত্যাখ্যান করে তখন সে অপমানিত হয়।

আমরা এ পর্যায়ে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রতি দৃষ্টিপাত করি– মানব জাতি তখন গোমরাহীর ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিলো। অন্যায়-অনাচার, অত্যাচার ও অবিচারই ছিলো তখন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। স্রষ্টার সেরা সৃষ্টি মানব জাতি মাথা নত করতো হীন ও তুচ্ছ বস্তুর সম্মুখে। মানবতার চরম অধঃপতন পৌত্তলিকতা ও নাস্তিকতা বিশ্ব মানবের জন্য চরম দুর্দিন ডেকে এনেছিলো। তদানীন্তন পৃথিবীর মানুষ তখন ছিলো পশুত্বের পর্যায়ে অবনমিত, মানবতার মান হয়েছিলো লুপ্ত, মানব ইতিহাসের এমনি চরম দুর্দিনে আবির্ভাব হয়েছিলো প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের। অবতীর্ণ হয়েছিলো পবিত্র কোরআন। প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন ঘোষণা করলেন ঃ

بُعِثْتُ مُعَلِّمًا

"আমি প্রেরিত হয়েছি শিক্ষক রূপে"।

তিনি আরও এরশাদ করলেন ঃ

"আমি প্রেরিত হয়েছি চরিত্র মাধুর্যের পরিপূর্ণতার জন্যে"।

একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং প্রতিভাত যে, কোন জাতি যখন সুশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয় এবং তাদের নৈতিক মানের যখন অবনতি ঘটে তখন সে জাতির পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর মহান বাণীতে এ দুটি ব্যাধির প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন এবং পবিত্র কোরআন থেকে তার অব্যর্থ মহৌষধ উপস্থাপন করেছেন। তাই আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

الر كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ

"আলিফ, লাম, রা, (হে রসূল!) এই কিতাব আপনার নিকট নাযিল করেছি যেন আপনি গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন মানব জাতিকে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসেন তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে"।

বস্তুতঃ পবিত্র কোরআনের হেদায়েত লাভের মাধ্যমে এবং প্রিয়নবী হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণের বরকতে মানব জাতির ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। যারা স্বহস্তে নির্মিত মূর্তির সম্মুখে মাথা নত করে মানবতার অবমাননা করছিলো, তারা এক আল্লাহ্র বন্দেগীতে মশগুল হলো, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রাণ সংহারে উদ্যত ছিলো তারাই তাঁর জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হলো। যারা অবনতি ও অধঃপতনের চরম পর্যায়ে পৌঁছে

গিয়েছিলো তারা যে শুধু নিজেরাই উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করলো তাই নয়; বরং সমগ্র বিশ্ব-বাসীর জন্যে উন্নতি অগ্রগতির নব-দিগন্ত উন্মোচন করলো। ইতিহাস সাক্ষী! পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণের এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের অনুসরণের মাধ্যমে মাত্র এক যুগের মধ্যেই আরবের চেহারা বদলে গেলো। সারা বিশ্বে নব-জীবনের আলো বিকীর্ণ হলো, সুবিচার কায়েম হলো, অন্যায়-অনাচার-অবিচারের অবসান ঘটলো। মানবতার উৎকর্ষ সাধন সম্ভব হলো। তদানীন্তন পৃথিবীর প্রায় এক চতুর্থাংশের উপর ইসলামের পতাকা উড্ডীন হলো। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! যে জাতি পবিত্র কোরআনের ধারক ও বাহক হওয়ার কারণে বিশ্ব-সভায় সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলো আজ সে জাতি পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা থেকে দূরে সরে থাকার কারণে দ্বিধাবিভক্ত, কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অপমানিত এবং বিপদগ্রস্ত হয়েছে। নৈতিক অবক্ষয় জাতীয় জীবনের প্রায় সকল স্তরকে নিমজ্জিত করেছে। চুরি, ডাকাতি, হত্যা, রাহাজানি, ছিনতাই, জুলুম-অত্যাচার, অন্যায়-অনাচার অহরহ হচ্ছে। স্বার্থপরতা, হীনমন্যতা, প্রতারণা, ছলচাতুরী এর কোন্‌টি জাতীয় জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলেনি? এমনি এবস্থায় পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা ব্যতীত গত্যন্তর নেই।

ইমাম মালেক (রহঃ)-এর একটি কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তিনি বলেছেন ঃ

لايصلح اخر هذه الامة الا بما صلح به اولها

"এই উম্মতের প্রথম স্তরের লোকদের সংশোধন যে জিনিষ দ্বারা হয়েছিলো সেই জিনিষ দ্বারাই এ উম্মতের শেষ স্তরের লোকদের সংশোধন হবে আর সেই জিনিষ হলো পবিত্র কোরআন"।

পবিত্র কোরআনই ছিল সেদিন হেদায়েতের মূল উৎস। আর পবিত্র কোরআনের উপর কিভাবে আমল করতে হবে তা হাতে কলমে শিখিয়ে ছিলেন স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। যার বিবরণ সংরক্ষিত রয়েছে হাদীস শরীফে। অতএব জাতীয় জীবনের এ ক্রান্তিলগ্নে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার প্রচার প্রসারের গুরুত্ব সর্বাধিক। শুধু তাই নয়; বরং বর্তমান অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি কায়েম করতে হলে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার বাস্তবায়ন অবশ্যই করতে হবে।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, বাংলা ভাষায় আজও পবিত্র কোরআনের কোন মৌলিক, প্রামাণ্য এবং বিস্তারিত তফসীর গ্রন্থ রচিত হয়নি। তাই আমার অযোগ্যতার উপলব্ধি থাকা সত্ত্বেও এই মহান কাজ শুরু করেছি। আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ্ পাক দয়া করে এই অধমকে ইতোপূর্বে তফসীরে নূরুল কোরআনের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড এবং বর্তমানে তৃতীয় খণ্ড (তৃতীয় পারা) প্রকাশের তওফিক দান করেছেন। আল্লাহ্

পাক দয়া করে যেন অবশিষ্ট খণ্ড গুলো পাঠক সমাজে পেশ করার তওফিক দান করেন এজন্যে সকলের নিকট আমরা দোয়া প্রার্থী।

جناب عارفین صاحب جناب محمد احمد صاحب جناب قمرصاحب

جناب فرید صاحب نے تفسیر نور القران کے جلد سوم کی اشاعت کے

لے جوتعاون کیا اللہ پاك اس کےلے ان کو اجر عظیم عطاء فرمائے

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, পবিত্র কা'বা শরীফের মহা সম্মানিত ইমাম মোহাম্মদ এবনে আবদুল্লাহ এবনে সোবাইল সাহেব তফসীরে নূরুল কোরআন দেখে অত্যন্ত খুশী হয়েছেন, এ মহান কাজ সুসম্পন্ন করার জন্যে তিনি আমাকে উৎসাহিত করে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এজন্যে বিশেষ মুনাজাত করেছেন।

মহামান্য প্রেসিডেন্ট আলহাজ হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ তফসীরে নূরুল কোরআনের প্রকাশনায় আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন।

যাঁরা তফসীরে নূরুল কোরআন প্রকাশনায় সাহায্য করে এ মহান কাজে উৎসাহিত করেছেন তাঁদেরকে আল্লাহ পাক দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে সাফল্য মণ্ডিত করুন। আমীন।

বিনীত

মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

১৬-৪-৮৭ ইং

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمده ونصلی علی رسوله الکریم

তফসীরে নূরুল কোরআন সম্পর্কে

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রবীন ইসলামী শিক্ষাবিদ
জনাব ডঃ সিরাজুল হক, প্রফেসর এমিরিটাসের
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিমত

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম রচিত তফসীরে নূরুল কোরআনের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাঠের সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

মওলানা সাহেবের পরিচিতি নিঃপ্রয়োজন। তিনি একাধারে ইসলামী চিন্তাবিদ, মাসিক "আল-বালাগ" পত্রিকার সম্পাদক, বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রণেতা এবং সর্বোপরি ঢাকাস্থ প্রসিদ্ধ লালবাগ শাহী মসজিদের ইমাম ও খতীব।

তফসীর প্রণয়ন একটা অতীব কঠিন ও দুরূহ কাজ। যে কোন আলেম এতে হাত দিতে পারেনা এবং দেয়া উচিতও নয়। এ যে আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত কোরআন মজীদের ব্যাখ্যা করা। যে পর্যন্ত না কেউ সমুদয় কোরআনে পাকের অর্থ অবগত হয় এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীস শরীফের জ্ঞান লাভ না করে ও পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহের আসবাবে নুযুল না জানে, সে পর্যন্ত কোন ব্যক্তিরই এ কাজে হাতে দেয়া নিতান্ত অন্যায়। এ এমন একটি কাজ যাতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণও ভয় পেতেন এবং "লা-আ'লামু" বলে রক্ষা পেতেন। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে আজকাল যে কোন ব্যক্তি সামান্য আরবী ভাষা শিক্ষা করে বিনা দ্বিধায় এ কাজে হাত বাড়ায়। আফসোস! এর চেয়ে ধৃষ্টতার কাজ আর কি হতে পারে যে প্রকৃত যোগ্যতা হাসিল না করে আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যা করার জন্যে কলম ধরে। এ সম্বন্ধে জানতে চাইলে দেখুন মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম সাহেব রচিত তফসীরে নূরুল কোরআনের ১ম খণ্ডের অতি মূল্যবান "অবতরণিকা" (পৃঃ ১০-১৭৫ প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৪)।

বাংলা ভাষায় পবিত্র কোরআনের বহু তরজমা প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে, কিন্তু বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ কোরআনে মজীদের তফসীর যেমন হওয়া প্রয়োজন তা এ যাবত হয়নি বললেই চলে। যা কিছু আমাদের নজরে এসেছে তা কোন বিশেষ তফসীরের

বাংলা তরজমা, তা-ও আবার উর্দু থেকে বা বাংলা তরজমার সাথে কিঞ্চিৎ বাংলা নোট ব্যতীত আর কিছুই নয়।

বর্তমানে মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম সাহেব রচিত তফসীরে নূরুল কোরআন বহু খ্যাতনামা মুফাসসিরীনের লিখিত তফসীরের সারমর্ম সম্বলিত একটি অতি মূল্যবান গ্রন্থ, যাতে পাবেন অতি মূল্যবান পাদটীকা যার সাহায্যে নানা নির্ভরযোগ্য তফসীর গ্রন্থের হাওয়ালা থেকে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা আরো জ্ঞান লাভের সন্ধান পাবেন।

আমার ক্ষুদ্র মতে এই তফসীর খানা একটি আধুনিক গ্রন্থ যার মারফত আমরা আরো জ্ঞান লাভের সন্ধান পেতে পারি। তিনি অবশ্য দাবী করেন না যে এটিই সর্বোৎকৃষ্ট তফসীর, কেননা পূর্বেই বলা হয়েছে যে আল্লাহর কালাম বোঝা বড় কঠিন। আজীবন গবেষণা করেও কেউ এ মহা সমুদ্রের এক বিন্দু পরিমাণও আহরণ করতে সক্ষম হবে না।

গ্রন্থখানির মুদ্রণ প্রমাদ ও কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি আছে, তবে আশা করি দ্বিতীয় মুদ্রণে তা সংশোধিত হয়ে যাবে। আমি গুনাহগার আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর দরবারে সর্বান্তকরণে দো'আ করি যাতে মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম সাহেব শীঘ্রই এ মূল্যবান মহাগ্রন্থের যা ৩০ খণ্ডে প্রকাশিতব্য, তাঁর জীবদ্দশায় সমাপ্ত করতে সক্ষম হন এবং বাংলা-ভাষী পাঠকদের জন্যে একটি মূল্যবান তফসীর গ্রন্থ উপহার দিয়ে পবিত্র কোরআনের তফসীরের ক্ষেত্রে একটি অতি মূল্যবান অবদান রেখে আল্লাহর পেয়ারা বন্দাদের মধ্যে শামিল হন। আমীন। ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

(ডঃ সিরাজুল হক এম, এ, পি, এইচ, ডি (লণ্ডন)
প্রফেসর এমিরিটাস, ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।
৬/৪/৮৭ ইং

দৈনিক ইত্তেফাকের দৃষ্টিতে তফসীরে নূরুল কোরআন

সম্প্রতি মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম কর্তৃক রচিত তফসীরে নূরুল কেরআন (১ম খণ্ড) (পরে দ্বিতীয় খণ্ড) প্রকাশিত হয়েছে। আমরা জানি, বাংলাদেশে কোরআন মজীদের পঠন-পাঠন ও হেফজ করা শুরু হয়েছে ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই। কিন্তু বাংলা ভাষায় এর চর্চা শুরু হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশ চন্দ্র সেন বাংলা ভাষায় কোরআনের অনুবাদ করে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেন। গত দু' শত বছরে কোরআন মজীদের বহু বাংলা অনুবাদ বের হয়েছে। বের হয়েছে কোরআন বিষয়ক বহু পুস্তক-পুস্তিকা। কবি নজরুল ইসলাম ও কবি গোলাম মোস্তফাসহ বেশ কয়েকজন কবি কোরআনের অংশ বিশেষ বাংলায় কাব্যানুবাদ করেছেন। অন্য ভাষা থেকে অনূদিত কিছু তফসীর গ্রন্থও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু মৌলিক তফসীর রচনার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা তেমন একটা সমৃদ্ধি লাভ করেনি। মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম বাংলা ভাষায় মৌলিক ও প্রামাণ্য তফসীর রচনার ক্ষেত্রে এক নব দিগন্তের সূচনা করলেন। ইতোপূর্বে তাঁর কোরআন বিষয়ক বেশ কয়েকখানি গ্রন্থ সুধী মহলে সমাদৃত হয়েছে। তাঁর লেখা "বিশ্ব সভ্যতায় পবিত্র কোরআনের অবদান" শীর্ষক গ্রন্থটি তিনটি জাতীয় পর্যায়ের পুরস্কার লাভ করে। আলোচ্য "তফসীরে নূরুল কোরআন" গ্রন্থটিতে কোরআন মজীদের প্রথম পারায় বিধৃত সূরার বিস্তারিত ও প্রামাণ্য ব্যাখ্যাই শুধু উপস্থাপিত হয়নি, সে সঙ্গে এতে কোরআন বিষয়ক তত্ত্ব ও তথ্যগত বহু দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ৫৪৫ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এ গ্রন্থটির ১৬২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অবতরণিকা অংশে কোরআন সংকলনের ইতিহাস, কোরআন তেলাওয়াত করার নিয়ম-কানুন, ফাযায়েলে কোরআন, কোরআনের তফসীর প্রসঙ্গ, কোরআনে একই ঘটনা বার বার উল্লেখ করার কারণ, কিভাবে অহী নাযিল হতো, কোরআনে বর্ণিত ফেরেশতা, সাহাবায়ে কেরাম ও আম্বিয়ায়ে কেরামের বিবরণ, প্রথম যুগের তফসীরকারগণের পরিচিতি, উপমহাদেশে পবিত্র কোরআন, পবিত্র কোরআনে বিধৃত ভবিষ্যদ্বাণী ইত্যাদি সহ বহু প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা রয়েছে। বাংলা ভাষায় মৌলিক তফসীর রচনার ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটি এক অনন্য সংযোজন।

চলতি ভাষায় লেখা এ গ্রন্থটির উপস্থাপনা ভঙ্গী অত্যন্ত আধুনিক। বৈজ্ঞানিক যুক্তিসহকারে লেখক প্রতিটি আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি হাদীস,

সাহাবায়ে কেরাম এবং প্রাচীনকালের বিখ্যাত তফসীরকারগণের তফসীর করার ভঙ্গী অনুসরণ করেছেন।

কোরআন মজীদ আল্লাহ্ পাকের বাণী। এতে বিশ্ব জগতের যাবতীয় জ্ঞান সমন্বিত হয়েছে। এ এক মহা জ্ঞান-ভাণ্ডার। সকল প্রকারের জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর এতে বিদ্যমান। একে জানার জন্যে প্রকৃত উপলব্ধি শক্তি, আধ্যাত্মিক মানস ও সুদৃঢ় ঈমান থাকা প্রয়োজন। এর প্রতিটি হরফ, শব্দ, বাক্য ও আয়াতের সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। যে কারণে কোন কোন তফসীর গ্রন্থ সম্পর্কে হক্কানী আলেম মহলে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। লেখক বোধকরি এদিকে সচেতন থেকেই আলোচ্য তফসীর গ্রন্থ রচনায় হাত দেন। তাই এ গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়, লেখক প্রতিটি আয়াতের ব্যাখ্যায় কোরআনের অন্যত্র বিধৃত সংশ্লিষ্ট আয়াত এবং হাদীস শরীফে বিধৃত সংশ্লিষ্ট হাদীসের উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেছেন। এছাড়াও রয়েছে শানে নুযুল। বিশ্বে কোরআন মজীদ সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ। চৌদ্দশ' বছর ধরে প্রত্যহ মুসলিম জাহানের লক্ষ লক্ষ মানুষ এ গ্রন্থ তেলাওয়াত করে আসছে। কোরআন মজীদ তেলাওয়াতে অশেষ সওয়াব রয়েছে। কিন্তু তেলাওয়াত করাই কি যথেষ্ট? কোরআনী জিন্দেগীতে মানুষ প্রত্যাবর্তন করুক এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক এই গ্রন্থ নাযিল করেছেন। কোরআনের জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবার জন্যে এর প্রতিটি আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা তাই প্রত্যেকেরই একান্ত কর্তব্য। আলোচ্য তফসীর গ্রন্থটি যে বাংলা ভাষী মানুষকে কোরআনের যথার্থ জ্ঞান লাভে সাহায্য করবে এ বিশ্বাস আমরা করি।

এতে তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রাঃ) যে কোরআন শরীফ খানি তেলাওয়াত রত অবস্থায় শাহাদাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন তার একটি পৃষ্ঠার ফটোকপি, প্রাচীনকালে হরিণের চামড়ায় লেখা একখানা কোরআন মজীদের অংশ বিশেষের ফটোকপি দেয়া হয়েছে। দামী রেক্সিনে মোড়া এর দু' রঙা প্রচ্ছদ অত্যন্ত আকর্ষণীয়, বাঁধাই এবং মুদ্রণও সুন্দর। অবশ্য দু'-একটি স্থানে মুদ্রণ বিভ্রাট দেখা যায়। সর্বোপরি, মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলামের তফসীরে নূরুল কোরআনের ১ম খণ্ড উন্নতমানের প্রামাণ্য ও বিস্তারিত তফসীর হিসেবে সর্ব মহলে যে স্বীকৃত হবে এতে সন্দেহ করার অবকাশ নেই। আমরা অচিরেই লেখকের কাছে পরবর্তী খণ্ডগুলো প্রকাশ করার অনুরোধ করছি। গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

হাসান আবদুল কাইয়ুম

দৈনিক ইত্তেফাকের সৌজন্যে
২৫শে আষাঢ়, ১৩৯৩ বাং

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ
হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রঃ)-এর
অন্যান্য বই

১। পবিত্র কোরআনের মর্মকথা

২। বিশ্ব-সভ্যতায় পবিত্র কোরআনের অবদান

৩। পবিত্র কোরআনের দর্পণে মানব-জীবন

৪। হযরত গওসুল আযমের (রঃ) অমরবাণী

৫। ইসলামী আদর্শ ও বাস্তবায়ন

৬। দালায়েলুল খায়রাত (বাংলা)

৭। দরূদ শরীফের ফজিলত ও মাহাত্ম

৮। সাহাবা-চরিত

৯। হাজীদের সাথী

১০। বিশ্ব-সভ্যতায় মহানবীর (সঃ) অবদান

১১। এনায়েতুল কোরআন

১২। যুগ-সমস্যার সমাধানে পবিত্র কোরআন

১৩। মানব-মর্যাদায় মহানবী (সঃ)

১৪। ইসলামী মাহ্‌ফিলের তাৎপর্য

১৫। তারীখে ইসলাম (উর্দু)

১৬। শরহে বয়যাবী

১৭। ইসলামী অর্থনীতির রূপ-রেখা

১৮। মুসলমানের কর্তব্য

১৯। দুই ঈদ

২০। পবিত্র কোরআনের অনুবাদ (প্রথম খণ্ড)

২১। ইমাম মাহদীর (আঃ) আগমনের পূর্বে ও পরে

২২। তফসীরে নূরুল কোরআন (৩০ খণ্ডে সমাপ্ত)

২৩। নূরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম

সূচীপত্র

তৃতীয় খণ্ড

পৃষ্ঠা

১। তফসীরুল কোরআন.. ২
২। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ফজিলতের কয়েকটি প্রমাণ......... ৫
৩। উনবিংশতি তম প্রমান..১৪
৪। তফসীরুল কোরআন.. ১৪
৫। আল্লাহর রাহে দান করার তাগিদ.................................১৭
৬। যাকাত সম্পর্কীয় সতর্কবাণী...................................... ১৯
৭। পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক.................................... ২১
৮। তওহীদের ঘোষণা...২২
৯। আল্লাহ পাকের বিশেষ গুণাবলী...................................২২
১০। আরশ কুরসীর বিবরণ... ২৭
১১। কুরসী সম্পর্কীয় ব্যাখ্যা...২৮
১২। আয়াতুল কুরসীর ফজিলত......................................৩০
১৩। এসমে আজম...৩৩
১৪। ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই ৩৪
১৫। জিযিয়া সম্পর্কে... ৩৬
১৬। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে সালামের (রাঃ) বিস্ময়কর স্বপ্ন....................৩৭
১৭। তফসীরুল কোরআন..৩৯
১৮। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে নমরুদের বিতর্ক..........................৩৯
১৯। নমরুদের হেদায়েতের জন্য ফেরেশতা প্রেরণ..............................৪১
২০। নমরুদ ও তার সৈন্য বাহিনীর শোচনীয় পরিণাম......................... ৪১
২১। কিভাবে আল্লাহ পাক মানুষকে পুনর্জীবন দান করবেন?...................... ৪৩
২২। বিরাণ নগরে কে গমন করেছিলেন?................................. ৪৫
২৩। আল্লাহর নাফরমানীর পরিণতি....................................... ৪৫
২৪। বায়তুল মোকাদ্দাস পুনরায় আবাদ হলো...............................৪৭
২৫। হযরত ওজায়ের (আঃ)-এর স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন........................... ৪৮
২৬। কেয়ামতের দিন পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী................................. ৪৯
২৭। তফসীরুল কোরআন...৫০
২৮। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দানের শুভ পরিণতি...........................৫৯
৩০। হেদায়েতের পর গোমরাহী... ৭২
৩১। হেকমতের তাৎপর্য... ৮১
৩২। দান সদকাহ প্রকাশ্যে না গোপনে...................................... ৮৮
৩৩। শানে নুযুল.. ৯০

পৃষ্ঠা

৩৪। ইসলামের উদার নীতি.. ৯৩
৩৫। হেদায়েত শুধু আল্লাহর হাতে..৯৪
৩৬। পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক..৯৮
৩৭। আসহাবে সোফ্‌ফা..৯৯
৩৮। ভিক্ষা বৃত্তির পরিণাম.. ১০০
৩৯। দান খয়রাতের ফজিলত..১০২
৪০। সুদ প্রথার ভয়াবহ পরিণাম.. ১০৪
৪১। তফসীরুল কোরআন.. ১১১
৪২। আল্লাহর তরফ থেকে যুদ্ধের তাৎপর্য..১১৪
৪৩। ঋণ গ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হলে যা করণীয়..১১৫
৪৪। সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারে ইসলাম..১২৪
৪৫। সূরা আলে-এমরান.. ১৩৮
৪৬। সূরার ফজিলত.. ১৩৯
৪৭। সূরা বাকারা ও আলে-এমরানের মধ্যে সামঞ্জস্য..১৩৯
৪৮। শানে নুযুল..১৪০
৪৯। খৃষ্টানদের বাতিল আকিদা.. ১৪২
৫০। আলোচ্য আয়াতে মর্মকথা.. ১৪৪
৫১। মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়া.. ১৪৫
৫২। মোহকাম ও মুতাশাবিহ'র ব্যাখ্যা..১৪৭
৫৩। একটি প্রশ্ন ও তার জবাব..১৪৯
৫৪। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সতর্কবাণী..১৫২
৫৫। দক্ষ আলেম কে?..১৫৩
৫৬। পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক.. ১৫৫
৫৭। শানে নুযুল..১৫৬
৫৮। পরকালে অর্থ সম্পদ উপকারী হবেনা..১৫৬
৫৯। কাফেরদের অবস্থা ও পরিণাম.. ১৫৭
৬০। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী..১৫৯
৬১। উৎকৃষ্ট সম্পদ.. ১৬২
৬২। এ জীবনের তিনটি সাথী..১৬৩
৬৩। আয়াতের মর্মকথা..১৬৫
৬৪। সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত..১৬৬
৬৫। নেককার বন্দাদের বৈশিষ্ট্য.. ১৬৮
৬৬। শানে নুযুল..১৭১
৬৭। জ্ঞান অর্জনের বিস্ময়কর সাধনা.. ১৭২
৬৮। আল্লাহ পাক তওহীদের সাক্ষী.. ১৭৩

পৃষ্ঠা

৬৯। আ'মালুল কোরআন.. ১৭৫
৭০। নাজাতের একমাত্র পন্থা হলো ইসলাম..................................১৭৫
৭১। ইসলামের পরিপূর্ণ জীবন-বিধান.................................... ১৭৬
৭২। ইসলামের মূল শিক্ষা... ১৭৬
৭৩। আল্লাহর নাফরমানদের জন্যে কঠোর শাস্তির ঘোষণা.................... ১৮২
৭৪। শানে নুযুল..১৮৪
৭৫। বিস্ময়কর ঘটনা.. ১৮৭
৭৬। অমুসলিমদের সাথে সদাচরণের শিক্ষা................................১৯৩
৭৭। নেককার সাথীর দৃষ্টান্ত.. ১৯৫
৭৮। ঈমান অর্জনের পন্থা.. ১৯৫
৭৯। শানে নুযুল.. ২০০
৮০। আয়াতের মর্মবাণী.. ২০১
৮১। আল্লাহর মহব্বতের তাৎপর্য...২০৪
৮২। আম্বিয়ায়ে কেরাম আল্লাহর মনোনীত বন্দা................................২০৮
৮৩। আলে এমরান...২০৮
৮৪। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একমাত্র আদর্শ.................... ২১৬
৮৫। হযরত মরয়মের বৈশিষ্ট্য..২২০
৮৬। তাৎপর্যপূর্ণ বাক্য.. ২২৭
৮৭। হাওয়ারী'র ব্যাখ্যা..২৩৫
৮৮। হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের ঘোষণা.....................২৩৮
৮৯। শানে নুযুল.. ২৪৯
৯০। নবুওয়্যতের যুগ.. ২৪৯
৯১। ইহুদীদের ষড়যন্ত্র..২৫৯
৯২। 'ফজল' শব্দের ব্যাখ্যা.. ২৬০
৯৩। সঠিক নিয়ত সম্পর্কে বিস্ময়কর ঘটনা................................ ২৬৩
৯৪। অঙ্গীকার রক্ষা করা একান্ত কর্তব্য...................................... ২৬৩
৯৫। মুনাফেকের আলামত.. ২৬৪
৯৬। আল্লাহর কালামে পরিবর্তন অত্যন্ত বড় অপরাধ............................ ২৭০
৯৭। এবাদতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহ পাক....................................২৭১
৯৮। রব্বানিয়্যীন কারা..২৭১
৯৯। আম্বিয়ায়ে কেরামের নিকট থেকে অঙ্গীকার..................................২৭৪
১০০। আয়াতের মর্মকথা.. ২৭৫
১০১। তিনটি অঙ্গীকার.. ২৭৬
১০২। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের যুগ.................. ২৭৮
১০৩। ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়...............................২৭৯
১০৪। তওবার তাৎপর্য.. ২৮৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

তফসীরে নূরুল কোরআন

তৃতীয় খণ্ড **তৃতীয় পারা**

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ مِنْهُمْ
مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ
الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ
مِنْ بَعْدِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا
فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا
وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ۝٢٥٣

তরজমা

(২৫৩) এই রসূলগণ, আমি তাদের একের উপর অন্যকে অধিক মর্যাদা প্রদান করেছি, তাদের মধ্যে কারো সঙ্গে আল্লাহ্ পাক কথা বলেছেন এবং কারো পদোন্নতি দান করেছেন। আর আমি ঈসা এবনে মরয়মকে প্রকাশ্য নিদর্শন সমূহ দান করেছি এবং জিব্রাঈল (আঃ) দ্বারা তাকে সাহায্য করেছি। আর যদি আল্লাহ পাক ইচ্ছা করতেন তবে তাদের পরবর্তী লোকেরা প্রকাশ্য দলিল আসার পর যুদ্ধে লিপ্ত হতো না। কিন্তু তারা মতবিরোধ করলো, অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ ঈমান আনলো এবং কেউ কাফের হলো, আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলে তারা যুদ্ধ করতো না কিন্তু আল্লাহ্ পাক যা ইচ্ছা করেন তাই করে থাকেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ

"হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! নিশ্চয় আপনি আমার রসূলগণের অন্যতম"।

এতদ্বারা এ সন্দেহ হতে পারে যে, হয়তো হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও অন্য নবীগণের ন্যায়ই একজন নবী কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা নয়, বরং যুগে যুগে মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ্ পাক যে নবী-রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন তাঁরা সকলেই সত্য, আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত। তবু তাঁদের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে তবে সবার উপরে যাঁর স্থান, যাঁর মর্যাদা সর্বাধিক তিনি হলেন সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন রসূল হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, যাঁর উম্মত হওয়ার জন্যে অন্যান্য নবীগণ পর্যন্ত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন তিনি হলেন আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

تِلْكَ الرُّسُلُ

অর্থাৎ এই রসূলগণ! আমি তাদের একের উপর অন্যকে অধিক মর্যাদা প্রদান করেছি। তাদের মধ্যে কারো সঙ্গে আল্লাহ্ পাক কথা বলেছেন যেমন হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে যখন তিনি কোহে তূরে ছিলেন, এমনিভাবে শবে মে'রাজে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কথা বলেছেন। হযরত ঈসা (আঃ)-কে জীব্রাঈল (আঃ) দ্বারা সাহায্য করেছেন, এতদ্ব্যতীত তাঁকে কয়েকটি প্রকাশ্য মোযেজাও প্রদান করা হয়েছিল যেমন তিনি 'কুম বিইজ্‌নিল্লাহ্' বললে মৃত ব্যক্তি জীবিত হতো, এমনিভাবে তাঁর মোযেজা স্বরূপ অন্ধ ব্যক্তি দৃষ্টি শক্তি লাভ করতো এবং কুষ্ঠ রোগী আরোগ্য লাভ করতো। এমনিভাবে হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে বাদশাহাত দেয়া হয়েছিল, হযরত আইয়ুব (আঃ)-কে সবরের গুণ প্রদান করা হয়েছিল, হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে সৌন্দর্য এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে বন্ধুত্বের বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছিল।

যদিও কোন কোন রসূলকে বিশেষ মর্যাদা এবং বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে কিন্তু সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাল্লামকে, একথা সর্বজন স্বীকৃত, স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান বাণীতেও রয়েছে একথার সুস্পষ্ট ঘোষণা। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

انا سيد ولد ادم ولا فخر

'কেয়ামতের দিন আমি আদম সন্তানদের নেতা হবো। আর একথা গর্ব করে বলছিনা'। তিনি আরও এরশাদ করেছেন ঃ

انا صاحب لواء الحمد وادم ومن بعده-تحت لوائى ولا فخر

'কেয়ামতের দিন আমার হাতেই থাকবে আল্লাহ্‌র হাম্‌দের পতাকা এবং সমস্ত আদম সন্তান সে পতাকাতলে সমবেত হবে। আর একথাও আমি গর্ব করে বলছিনা'। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেছেন ঃ

انا اول من تنشق عنه الارض

আমি সর্ব প্রথম কবর থেকে উঠে আসবো (যখন যমীন বিদীর্ণ হবে) আর একথাও গর্ব করে বলছিনা'।

তিনি আরও এরশাদ করেছেন ঃ

انا اول شافع واول مشفع

অর্থাৎ কেয়ামতের দিন আমিই সর্ব প্রথম আল্লাহ্ পাকের দরবারে সুপারিশ করবো। আর আমার সুপারিশই সর্ব প্রথম কবুল করা হবে (এই হাদীস সংকলিত হয়েছে তিরমিজী, এবনে মাজা এবং আহমদে)।

আরও এরশাদ হয়েছে ঃ

انا اول من يقرع باب الجنة

অর্থাৎ আমিই সে ব্যক্তি যে সর্ব প্রথম বেহেশতের দ্বারে করাঘাত করবে।

এমনিভাবে আরও এরশাদ হয়েছে ঃ

اَنَا اَوَّلُ مَنْ يُّجِيْزُ

আমিই সে ব্যক্তি যে সর্ব প্রথম পুলসিরাত পার হবে।

اَنَا اَوَّلُ مَنْ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ

আমিই সে ব্যক্তি যে সর্ব প্রথম বেহেশতে প্রবেশ করবে।

হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে একবার কয়েকজন সাহাবী পরস্পর আলোচনায় রত ছিলেন। তখন একজন বললেন, 'আল্লাহ্ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে 'খলীল' (দোস্ত্) হিসাবে গ্রহণ করেছেন'। অপরজন বললেন, 'হযরত আদম (আঃ) 'সফিউল্লাহ্' হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন'। তৃতীয় সাহাবী বললেন, 'আল্লাহ্ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-কে 'কালেমাতুল্লাহ্' এবং 'রুহুল্লাহ্' হিসাবে ঘোষণা করেছেন'। অপর একজন সাহাবী বললেন, 'হযরত মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ্ পাক 'কলিমুল্লাহ্' খেতাব প্রদান করেছেন'। এমন সময় হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেখানে আগমন করে এরশাদ করলেন, 'আমি তোমাদের সকল কথাবার্তা শুনতে পেয়েছি। এসব নবী বাস্তবিক এমনই ছিলেন। আর আমি হাবীবুল্লাহ্ (আল্লাহ্র প্রিয়), সেজন্যে কোন অহংকার নেই'।[১]

এরশাদ হয়েছে– তোমরা আল্লাহ্র কাছে ওছিলা চাও। সাহাবাগণ তখন আরজ করলেন, 'ওছিলা কি জিনিস'? এরশাদ হলো জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর। এ স্তরটি একজন মানুষই লাভ করবে। আমি আশা করছি সে ব্যক্তিটি আমি হবো। সে ব্যক্তিটিই সফলকাম এবং সারা বিশ্বের একমাত্র নির্বাচিত ব্যক্তি হবে। "আর হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সারা বিশ্বের সরদার" (মুসলিম শরীফ)। "তিনিই সর্ব প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন" (মুসলিম শরীফ)। তিনিই ক্ষমা প্রাপ্তির সুসংবাদ শোনাবেন এবং তিনিই ভাষণ দান করবেন। আর তিনি আদম সন্তানের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং নবীগণের ইমাম, তিনি সর্ব শেষ নবী এবং তাঁর যমানা সর্ব শ্রেষ্ঠ যমানা (মুসলিম শরীফ)। অন্যান্য নবীগণ নিজ সম্প্রদায়ের জন্যে নবী হিসাবে প্রেরিত হতেন আর তিনি হয়েছেন সারা বিশ্বের মানুষের জন্যে নবী এবং রসূল (বোখারী শরীফ)।

আর মে'রাজের সফরে সমস্ত নবীর ইমাম হওয়া এবং বিশেষ নৈকট্য ও মহব্বত লাভ করা তাঁর সর্বোচ্চ স্তরের মর্যাদা প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট। কোরআনে পাকের অনেক আয়াত তাঁর মর্যাদা ঘোষণা করেছে তার কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন তাঁর সাক্ষ্যের দ্বারাই সমস্ত নবীগণ রেহাই পাবেন, মানুষের ঈমান না আনার জন্য তাঁকে জবাবদেহী না করা, সকল আম্বিয়ায়ে কেরামের নিকট থেকে তাঁর প্রতি ঈমান রাখার এবং তাঁকে সাহায্য করার অঙ্গীকার গ্রহণ করা, আল্লাহ্ পাকের এই ওয়াদা করা যে আল্লাহ পাক তাঁকে সন্তুষ্ট করবেন, তাঁর বক্ষ মোবারক বিদীর্ণ করা। তাঁর মোবারক নাম সর্বোচ্চ হারে প্রচারের ব্যবস্থা করা, তাঁর উম্মতকে উত্তম উম্মত হিসাবে ঘোষণা করা, পূর্ববর্তী শরীয়ত সমূহকে তাঁর শরীয়ত এসে বাতিল করে

১। খোলাছাতুত তাফাসীর খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৯৭
তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৮
তফসীরে কবীর খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা-১৯৭

দিয়েছে বলে ঘোষণা করা, তাঁকে কাওছার প্রদান, তাঁর কাজকে আল্লাহ্ পাকের নিজের কাজ হিসাবে আখ্যায়িত করা যেমন–وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى

(হে রসূল!) আপনি যখন মাটি নিক্ষেপ করেছিলেন তখন তা আপনি নিক্ষেপ করেননি; বরং আল্লাহ পাকই নিক্ষেপ করেছিলেন।)

আবার আল্লাহ্ পাক তাঁর নির্দোষ হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى

তিনি নিজের ইচ্ছায় কোন কথা বলেন না একথাও ঘোষণা করেন। মোট কথা কোরআনে পাক তাঁর ফজিলত বর্ণনায় ভরপুর হয়ে রয়েছে।[১]

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন যে অন্যান্য নবীগণকে যত মোযেজা দেয়া হয়েছে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে একাই সে সমস্ত মোযেজা এবং তার অতিরিক্ত অনেক মোযেজা প্রদান করা হয়েছে। যেমন চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, তাঁর বিরহে মসজিদ গৃহের খুঁটির প্রস্তর এবং বৃক্ষের ক্রন্দন করা, তাঁকে সালাম করা, চতুঃস্পদ জন্তুর তাঁর সাথে কথা বলা এবং তাঁর রসূল হওয়া সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া, তাঁর অঙ্গুলি মোবারকের মাঝখান থেকে ঝর্ণার ন্যায় পানি প্রবাহিত হওয়া এবং এমনি অসংখ্য মোযেজা রয়ে গেছে যার মধ্যে একটি হলো কোরআনে পাক। আসমান এবং যমীনে এমন কেউ নেই যে কোরআনে করীমের অনুরূপ কিছু রচনা করতে পারে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ফজিলতের কয়েকটি প্রমাণ

এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত যে নবীগণ একে অন্যের চাইতে মর্যাদায় কম-বেশী আছেন। আর এ ব্যাপারেও কোন মতভেদ নেই যে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মর্যাদার দিক থেকে সর্বোত্তম।

প্রথম প্রমাণ ঃ

আল্লাহ্ পাকের এরশাদ ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

“কেবল মাত্র আপনাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি”।

যেহেতু তিনি সমগ্র জগতের রহমত, সুতরাং একথাও মানতে হবে যে তিনি সমগ্র জগতের মধ্যে উত্তম।

১। খোলাসাতুত তাফাসীর খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৯৭
তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৯

দ্বিতীয় প্রমাণ ঃ

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন–

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

“এবং আমি আপনার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি”।

যেভাবে কলেমা তাইয়্যেবায় আল্লাহ্ শব্দের সাথেই ‘মোহাম্মদ’ শব্দটির উল্লেখ হয়েছে তেমনি আযান এবং তাশাহহুদের মধ্যেও। কিন্তু অবশিষ্ট নবীগণকে এভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

তৃতীয় প্রমাণ ঃ

আল্লাহ্ পাক হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করাকে তাঁর নিজের অনুসরণ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। যেমন ঃ

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ

“যে ব্যক্তি (এই) রসূলের অনুসরণ করেছে সে আল্লাহ্র অনুসরণ করেছে”।

আর তাঁর হাতে ‘বাইআত’ করাকে আল্লাহ্র হাতে ‘বাইআত’ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। যেমন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ

“যারা আপনার বাইআত গ্রহণ করে তারা তো আল্লাহ্রই বাইআত গ্রহণ করে; আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর”।

আর তাঁর ইজ্জতকে আল্লাহ্র ইজ্জতের সাথে বর্ণনা করেছেন ঃ

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ

“ইজ্জত তো আল্লাহ্রই আর তাঁর রসূলের”।

এমনিভাবে তাঁর সন্তুষ্টিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে বর্ণনা করেছেনঃ

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ

“আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অধিক হক্বদার যে (মোমেনগণ) আল্লাহ্ ও রসূলকে সন্তুষ্ট করে”।

তাঁর ডাকে সাড়া দেয়াকে আল্লাহ্র ডাকে সাড়া দেয়ার সাথে বর্ণনা করেছেন ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ

"হে মোমেনগণ! আল্লাহ্ ও রসূলের আহ্বানে তোমরা সাড়া দাও"।

চতুর্থ প্রমাণ ঃ

আল্লাহ্ পাক হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কোরআনে পাকের যে কোন একটি সূরা দ্বারা চ্যালেঞ্জ করার নির্দেশ দিয়েছেন যেমন ঃ

فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ

"তাহলে এমন একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো"।

দেখা যাচ্ছে যে, সব চেয়ে ক্ষুদ্র সূরা হলো সূরা কাউছার এবং এতে মাত্র তিন আয়াত রয়েছে। এতে একথাও প্রতীয়মান হয়, আল্লাহ্ পাক কোরআনে পাকের যে কোন তিন আয়াত দ্বারা চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সম্পূর্ণ কোরআনে পাকে ছয় হাজারেরও অধিক আয়াত রয়েছে। অতএব, কোরআনে পাক শুধুমাত্র একটি মোযেজা নয়; বরং দু' হাজারেরও অধিক মোযেজা। যখন এতগুলো মোযেজা প্রমাণিত হয়ে গেল তখন আমরা বলতে পারি যে আল্লাহ্ পাক ঈসা (আঃ)-এর মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে নয়টি আয়াত বর্ণনা করেছেন আর হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে এ বিপুল সংখ্যক মোযেজার আয়াত বর্ণনা করেছেন তাই তিনিই মর্যাদায় সর্বোচ্চে।

পঞ্চম প্রমাণ ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোযেজাগুলো অন্য সব নবীর মোযেজার চাইতে উত্তম অতএব, এই উত্তম মোযেজা প্রাপ্ত নবীও উত্তম হবেন।

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ

القران فى الكلام كادم فى الموجودات

"কিতাব সমূহের মধ্যে কোরআন সেরূপ উত্তম, যেরূপ সৃষ্টির মধ্যে মানুষ উত্তম"।

ষষ্ঠ প্রমাণ ঃ

হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোযেজা হলো কোরআন। আর এই কোরআন হলো অক্ষর ও শব্দের সমষ্টি। শব্দ বা অক্ষর সমাপ্ত হয় না। আর অন্যান্য নবীগণের মোযেজা হলো কর্মের সমষ্টি। এ কর্মের সমাপ্তি আছে। অতএব, আল্লাহ্ পাক হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোযেজাকে শেষ যমানা পর্যন্ত স্থায়ী রাখবেন আর অন্য সকল নবীর মোযেজা ক্ষণস্থায়ী।

সপ্তম প্রমাণ ঃ

সমস্ত নবীর অবস্থা বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

"তাদেরকেই আল্লাহ্ পাক সৎ পথে পরিচালিত করেছেন, তুমি তাদের পথের অনুসরণ কর"।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে আল্লাহ্ পাক হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন তাঁর পূর্বেকার নবীগণকে অনুসরণ করতে।

অতএব, যদি মনে করা হয় যে ইসলামের মূল বিষয়গুলোর জন্যে তাঁকে পূর্বেকার নবীগণের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে অন্য দ্বীনের 'তাকলীদ' করা হয় বলে সে অর্থ গ্রহণ যোগ্য হবে না। আর যদি মনে করা হয় যে ইসলামের শাখা বিষয়গুলোর জন্যে তাঁকে পূর্বেকার নবীগণের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে, সেক্ষেত্রে যেহেতু তাঁর শরীয়ত পূর্বেকার সকল শরীয়তকে রহিত করে দিতে এসেছে সেজন্যে এই ব্যাখ্যা করাও জায়েয হবে না। সুতরাং এখানে একটি ব্যাখ্যা ব্যতীত আর কোন গতি নেই যে, এর অর্থ হবে উত্তম চরিত্র। অতএব, আল্লাহ্ পাক যেন বলেছেন ঃ "আমি আপনাকে তাদের অবস্থা এবং জীবনী সম্পর্কে জানিয়ে দিলাম, সুতরাং আপনি সেখান থেকে যা অধিক সুন্দর ও অধিক উদার তা বেছে নিন এবং এসব কিছুতে তাঁদের অনুসরণ করুন"।

অতঃপর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্বে সকল নবীর উৎকৃষ্ট সে সব গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছে যা পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে পৃথক পৃথক ভাবে ছিল। সুতরাং তিনিই হলেন সকলের চেয়ে উত্তম।

অষ্টম প্রমাণ ঃ

প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে রসূল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। ফলে একথাও মানতে হবে যে তিনি সর্বাধিক পরিশ্রম করেছেন। আর যে ব্যক্তি অধিক পরিশ্রমের কাজ সম্পন্ন করেন তিনি অধিক উত্তম বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন। তিনি যে সমগ্র মানব জাতির জন্যে রসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন তার প্রমাণ আল্লাহ্ পাকের কালামের এ আয়াত রয়েছে ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ

"(হে রসূল!) আমি তো আপনাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি প্রেরণ করেছি"।

অতঃপর একথা স্বীকার করতে হবে যে তাঁর পরিশ্রমও সর্বাধিক। কারণ তিনি এমন একজন মানুষ ছিলেন যাঁর সম্পদ ছিলনা, কোন উচ্চপদ ছিলনা এবং কোন সাহায্যকারীও ছিল না। পক্ষান্তরে যখন সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে ডেকে বলা হয়

يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ

"হে কাফের সকল"! তখন সমগ্র পৃথিবীর মানুষ তাঁর দুশমন হিসেবে প্রমাণিত হয় এবং তখন সারা পৃথিবীর মানুষের ভয়ে ভীত হতে হয়। সুতরাং তখন ভয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে যে পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় তার পরিমাণ এক বিরাট আকার ধারণ করে থাকে।

আর যখন হযরত মূসা (আঃ)-কে বণী ইসরাঈলের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল তখন তাঁকে ফেরআউন এবং তার সম্প্রদায় ব্যতীত আর কারো মোকাবেলা করতে হয়নি। অথচ হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দুশমন ছিল সমগ্র মানব জাতি। যেন এক ব্যক্তিকে বলা হয়– ঐ দেশটিতে প্রবেশ কর, সেখানে কোন মিত্র নেই এবং কোন সাহায্যকারীও নেই, আছে শুধু এমন একজন শত্রু যার প্রচুর শক্তি আছে এবং অস্ত্র আছে, আজ তোমাকে সেখানে একাকী প্রবেশ করতে হবে এবং এ খবরটি পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। তখন এ নির্দেশে লোকটি ভীত হয়ে পড়বে এবং সীমাহীন কষ্টে পতিত হবে। অথবা যদি কাউকে বলা হয় সুদূরের কোন অরণ্যে প্রবেশ কর, সেখানে কোন বন্ধু নেই এবং কোন ব্যক্তিও নেই সেখানে এ খবরটি পৌঁছে দাও। লোকটির নিকট তখন এ কাজটি অত্যন্ত কঠিন এবং অতীব দুরুহ রূপ ধারণ করবে।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এমন হুকুম করা হয়েছিল যে তাঁকে সারা জীবন কি দিনে কি রাত্রে এমন সব মানুষ এবং জ্বীনের সঙ্গে অতিবাহিত করতে হয়েছে যাদের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না; বরং তারা তাঁর অবাধ্য ছিল। তারা তাঁর চরম শত্রু ছিল, নানাভাবে তাঁকে কষ্ট দিত এবং নিপীড়ন করতো। কিন্তু তথাপি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজের এ দুঃখ কষ্টের জন্যে কোন অভিযোগ করেননি, বরং এসব কিছুর মোকাবেলা করেছেন আল্লাহ পাকের ফরমাবরদার হয়ে। সুতরাং একথা স্বীকার করতে হবে যে তিনি আল্লাহ্ পাকের দ্বীন প্রচারের জন্যে সর্বাধিক কষ্ট স্বীকার করেছেন। এজন্যে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ

"তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে তারা এবং পরবর্তীরা সম মর্যাদার অধিকারী নয়"।

সুতরাং এমনি দুঃখ-কষ্ট ও পরিশ্রমের দরুণ যখন সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা এত অধিক বলে বর্ণনা করা হয়েছে তখন রসূলের মর্যাদা কত বেশী তা আমাদের পক্ষে কল্পনাতীত।

আর যেহেতু একথা প্রমাণিত হয়েছে যে তাঁর পরিশ্রম অন্য নবীগণের চেয়ে অধিক, সুতরাং একথাও মানতে হবে যে তাঁর মর্যাদাও অন্য নবীগণের চেয়ে অধিক।

নবম প্রমাণ ঃ

প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লামের প্রচারিত দ্বীন সর্বোত্তম। অতএব, তিনিও দ্বীন প্রচারক আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। এর কারণ এই যে আল্লাহ্ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের মাধ্যমে সকল ধর্মকে যেমন বাতিল করেছেন এবং ইসলামকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে একমাত্র জীবন বিধান রূপে পছন্দ করেছেন ঠিক তেমনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য নবীগণের নবুওয়্যতের মেয়াদও শেষ হয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত সর্বশেষ ও সর্ব শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত কায়েম থাকবে। অতএব তিনি সর্বোত্তম নবী ও রসূল।

দশম প্রমাণ ঃ

একথা সর্বজন-বিদিত যে উম্মতে মোহাম্মদীয়া সর্বোত্তম উম্মত। অতএব হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল। এই উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে আল্লাহ পাক স্বয়ং সর্বোত্তম বলে ঘোষণা করেছেন। কোরআনে করীমে এরশাদ হয়েছে ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

"তোমরা সর্বোত্তম উম্মত, মানব জাতির উপকারার্থে তোমাদের আবির্ভাব"।

উম্মতে মোহাম্মদীয়া এ উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছে শুধু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণে যেমন কোরআন করীমে এরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস তবে শুধু আমার অনুসরণ কর তাহলে আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে ভালবাসবেন।

অতএব, এ কারণেও হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

একাদশ প্রমাণ ঃ

যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খাতেমুন্নবীয়্যীন বা সর্বশেষ নবী তথা নবুওয়্যতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে তাঁর মাধ্যমে, নবুওয়্যতের যাবতীয় গুণাবলী সম্পূর্ণ এবং পরিপূর্ণ ভাবে শুধু তাঁকে প্রদান করা হয়েছে, তাই তাঁর পরে আর কোন নবীর আগমন হবে না এবং তার প্রয়োজনও হবেনা। অতএব, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী নবী ও রসূল।

দ্বাদশ প্রমাণ ঃ

নবীগণের মধ্যে একে অন্যকে যে ফজিলত প্রদান করা হয়েছে তার কয়েকটি কারণও রয়েছে। যেমন কোন কোন নবীকে অন্যদের থেকে অধিক সংখ্যক মোযেজা প্রদান করা হয়েছে। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ পর্যায়ে শীর্ষ স্থানে রয়েছেন।

ত্রয়োদশ প্রমাণ ঃ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

ادم ومن بعده تحت لوائى

অর্থাৎ কেয়ামতের দিন আমার পতাকাতলে সমবেত হবে আদম (আঃ) ও তাঁর পরের সমস্ত মানুষ।

এতে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আদম (আঃ) ও তাঁর সমস্ত সন্তানদের চেয়ে অধিকতর মর্যাদার অধিকারী। এ পর্যায়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আরেকখানি হাদীসও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এরশাদ করেছেন ঃ

انا سيد ولد ادم ولا فخر

“আমি আদম সন্তানদের সরদার, আর তাতে কোন গর্ব নেই”।

তিনি আরও এরশাদ করেছেন ঃ

لا يدخل الجنة احدمن النبيين حتى ادخلها انا ولا يدخلها احد من الامم حتى تدخلها امتى

অর্থাৎ বেহেশতে কোন নবীই প্রবেশ করবে না যে পর্যন্ত না তাতে আমি প্রবেশ করি। আর বেহেশতে কোন উম্মত প্রবেশ করবে না যে পর্যন্ত না তাতে আমার উম্মত প্রবেশ করে।

অন্য একখানি হাদীস এমন ঃ

انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا خطيبهم اذا وفدوا ونا مبشرهم اذا أيسوا لواء الحمد بيدى وانا اكرم ولدا دم على ربى ولافخر

হাশরের দিনে যখন মানুষকে জীবিত করা হবে তখন প্রথম আবির্ভাব হবে আমার, লোকেরা যখন আমাকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করবে তখন আমিই তাদেরকে সম্বোধন করে ভাষণ দান করবো, যখন তারা নিরাশ হয়ে পড়বে তখন আমিই তাদেরকে সুসংবাদ দান করবো। (আল্লাহ্‌র) প্রশংসার পতাকা আমার হাতেই থাকবে। আমার রবের কাছে আদম সন্তানের মধ্যে আমিই সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন, এজন্যে কোন গর্ব নাই।

চতুর্দশ প্রমাণ ঃ

ইমাম বায়হাকী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, একবার হযরত আলী (রাঃ)-এর প্রতি লক্ষ্য করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ

هذا سيد العرب

অর্থাৎ "সে আরবের সরদার"। তখন হযরত আয়েশা বললেন ঃ

الست انت سيد العرب

"আপনি কি আরবের সরদার নন"? তখন তিনি এরশাদ করলেন ঃ

انا سيد العالمين وهو سيد العرب

অর্থাৎ "আমি সমগ্র সৃষ্টি জগতের সরদার আর সে আরবের সরদার"।

এতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নবীগণের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

পঞ্চদশ প্রমাণ ঃ

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস প্রদান করা হয়েছে যা আমার পূর্বে কোন নবীকে দান করা হয়নি। আর এতে কোন গর্বও নেই (১) আমি প্রেরিত হয়েছি লাল কালো সকলের নিকট তথা সমগ্র মানব জাতির নিকট। আর আমার পূর্বে সমস্ত নবীগণ শুধু তাঁদের জাতি সমূহের নিকটই প্রেরিত হয়েছেন। (২) সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে আমার জন্যে মসজিদ এবং পবিত্রতা অর্জনের

উপকরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ জমিনের যে কোন অংশে উম্মতে মোহাম্মদীয়া নামায আদায় করতে পারে এবং মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে পবিত্রতা অর্জন করতে পারে। এ সুযোগ পূর্বে কোন উম্মতের ছিল না। (৩) আমাকে সাহায্য করা হয়েছে দুশমনের অন্তরে ভয়-ভীতি সৃষ্টির মাধ্যমে। (৪) গণীমত (যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ) আমার জন্যে হালাল করা হয়েছে যা আমার পূর্বে কারো জন্যে হালাল ছিলনা। (৫) প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ্ পাক একটি করে বিশেষ সুপারিশের অধিকার দিয়েছেন। তাঁরা দুনিয়াতেই সে অধিকার ব্যবহার করেছেন কিন্তু আমি বিশেষ সুপারিশের এ অধিকার আমার উম্মতের জন্যে সংরক্ষণ করেছি। ইনশাআল্লাহু তা'আলা যে আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকে শরীক করেনি সে কেয়ামতের দিন এই সুপারিশের ফল লাভ করবে।

অতএব, এতেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিশেষ ফজিলত ও উচ্চতর মর্যাদা প্রমাণিত হয়।

ষষ্ঠদশ প্রমাণ ঃ

প্রত্যেক রসূলকে তাঁদের জাতির নিকট একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর মধ্যেই তাঁদের দাওয়াত ছিল সীমিত। পক্ষান্তরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন সমগ্র মানব জাতির নিকট। তাঁর দাওয়াত সর্বকালের সকল মানুষের নিকট। অতএব তাঁকে যে এলম ও হেকমত দান করা হয়েছে তা সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক। তাঁকে যে মর্যাদা দান করা হয়েছে তা সর্বোচ্চ। হাদীস শরীফে তার বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

সপ্তদশ প্রমাণ ঃ

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস রয়েছে ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক ইব্রাহীম (আঃ)-কে খলিলুল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন এবং মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে নির্জনে কথা বলে তাঁকে সম্মানিত করেছেন আর আমাকে তাঁর হাবীব বলে নির্বাচিত করেছেন। অতঃপর আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ আমার ইজ্জত ও জালালের শপথ! আমি অবশ্যই প্রাধান্য দেব আমার হাবীব (হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ্ এবং মূসা (আঃ)-এর উপর।

অষ্টাদশ প্রমাণ ঃ

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত এবং হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ আমার ও আমার পূর্বেকার নবীদের দৃষ্টান্ত এই প্রকার যে কোন ব্যক্তি একটি ঘর তৈরী করলো এবং অতি সুন্দরভাবে তৈরী করলো। কিন্তু একটি ইটের জায়গা ছেড়ে দিল। তখন লোকেরা আশ্চর্যন্বিত হয়ে বললো– এই স্থলে ইট কেন দিচ্ছনা, তাহলে তোমার ইমারতটি সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ হতো। তখন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ

كنت انا تلك اللبنة

মূলতঃ নবুওয়্যতের ইমারতের সর্বশেষ এই ইটটি আমিই।

ঊনবিংশতম প্রমাণ ঃ

আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন যখনই কোরআনে করীমে কোন নবীকে ডাক দিয়েছেন তখন তাঁর নাম ধরেই ডেকেছেন। যেমন ঃ

يٰآدَمُ اسْكُنْ

"হে আদম! তুমি বসবাস কর"।

وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يّآ اِبْرٰهِيْمُ

"এবং আমি ডাক দিলাম, "হে ইব্রাহীম"!

يٰمُوْسٰى اِنِّىْٓ اَنَا رَبُّكَ

"হে মূসা! নিশ্চয় আমি তোমার পরওয়ারদেগার"।

কিন্তু আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পবিত্র কোরআনে কোথাও তাঁর নাম ধরে ডাক দেয়া হয়নি, বরং তাঁকে হে নবী! বা হে রসূল! বলে ডাকা হয়েছে।

যেমন "হে নবী"! "হে রসূল"! (يايها النبى يايها الرسول) এতেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিশেষ ফজিলত ও মর্যাদা প্রমাণিত হয়। তিনি যে সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী রসূল, এর অগণিত বাস্তব প্রমাণ রয়েছে।

وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ

অর্থাৎ " আর আমি মরয়ম পুত্র ঈসাকে সুস্পষ্ট মোযেজা দান করেছি এবং তাঁকে সাহায্য করেছি জিব্রাঈল দ্বারা"।

এ আয়াতে বিশেষভাবে ঈসা (আঃ)-এর উল্লেখ এজন্যে করা হয়েছে যেন তাঁর বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় এবং ইহুদী সম্প্রদায় তাঁর সম্পর্কে যে আপত্তিকর মন্তব্য করে তার বাতুলতা প্রমাণিত হয়। হযরত ঈসা (আঃ)-কে মরয়ম পুত্র বলে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই, ঈসায়ী সম্প্রদায় তাঁর সম্পর্কে যে বাড়াবাড়ি করে এবং পথভ্রষ্টতার পরিচয় দেয় তার পথ রুদ্ধ করা।[১] এতদ্ব্যতীত প্রিয়নবী

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৯৫-১৯৯

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে (১) যেহেতু ঈসা (আঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমনের খোশখবরী দিয়েছেন কোরআনে পাকে রয়েছে সেই খোশখবরীর উল্লেখ। এরশাদ হয়েছে ঃ

يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

অর্থাৎ "আমার পরে আসবেন একজন নবী যার নাম হবে আহমদ"।

(২) হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্ পাকের দরবারে আকাঙ্ক্ষা পেশ করেছেন আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মত হওয়ার জন্যে। আল্লাহ্ পাক তাঁর এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবেন। তিনি আখেরী যমানায় আগমন করবেন এবং উম্মতে মোহাম্মীদয়ার অন্তর্ভুক্ত হবেন, দ্বীন ইসলামের সাহায্যকারী হবেন, দজ্জালকে হত্যা করবেন।

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

অর্থাৎ এই সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের আগমন ও তাঁদের সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনের পরও যারা আল্লাহ্র অবাধ্য-অকৃতজ্ঞ হয়েছে এবং সত্য ধর্মের ব্যাপারে মতবিরোধ করেছে যদি আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা হতো তবে তাদের দ্বারা এমনটি হতোনা। কিন্তু সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ উপস্থাপিত হবার পরও তাদের একদল আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছে এবং আরেক দল অবাধ্য ও কাফের হয়েছে। মূলতঃ যারা আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে তৌফিক লাভ করেছে তারা ঈমানের সম্পদ লাভে ধন্য হয়েছে।

وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

একথা সত্য যে আল্লাহ্ পাক যা ইচ্ছা করেন তাই হয়ে থাকে। আর তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করে থাকেন। এ বিষয়টি তকদীর সম্পর্কীয়। এ সম্পর্কে কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল। আল্লামা বগবী (রঃ) লিখেছেন ঃ

এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)-কে অনুরোধ করলো, "আমার জন্যে তকদীরের হাকীকত বর্ণনা করুন"। তিনি জবাব দিলেন, "এই পথ অন্ধকার, এ পথে চলো না"। লোকটি পুনরায় আরজ করলো। তখন তিনি বললেন, "গভীর সমুদ্র, এতে প্রবেশ করোনা"। লোকটি আবার সেই একই বিষয় জানতে চাইলো। তিনি বললেন, "এটা একটা গোপন রহস্য, এ ব্যাপারে কোন কিছু জানতে চেষ্টা করোনা"।অর্থাৎ তকদীরের হাকীকত বোঝা অসম্ভব ব্যাপার। কারণ মানুষের জ্ঞান সেখানে পৌঁছতে পারেনা। গভীর সমুদ্রে প্রবেশ করা এবং অন্ধকার পথে চলা যেমন ধ্বংসাত্মক ব্যাপার ঠিক তেমনি তকদীরের হাকীকত জানার চেষ্টা করা একটি ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন– আমি নিজে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি এরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি তকদীর সম্পর্কে কোন কিছু আলোচনা করবে কেয়ামতের দিন তাকে জবাবদেহী করতে হবে। (এবনে মাজা)

হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, যদি আল্লাহ্ পাক আসমান ও যমীনে যত কিছু আছে সবাইকে আযাব প্রদান করেন তবে তাঁর সেই আযাব জুলুম হবে না। আর যদি তিনি সকলকে দয়া করেন তবে তাঁর সেই রহমত তাদের আমল অনুপাতে উত্তম দান হবে। তোমরা যদি ওহোদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহ্র রাহে ব্যয় কর তবে যে পর্যন্ত তকদীরের উপর তোমাদের ঈমান কায়েম না হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের এই বিশ্বাস থাকে যে যা কিছু তোমাদের জন্যে ঘটবার তা ঘটবেই, আর যা ঘটবার নয় তা ঘটতে পারবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হবে না। মূলতঃ এ বিশ্বাস ব্যতীত অন্য কোন বিশ্বাসের উপর যদি তোমাদের মৃত্যু হয় তবে তোমরা দোযখে প্রবেশ করবে।

হযরত এবনে মাসউদ এবং হযরত হোজায়ফা বিন ইয়ামন (রাঃ)-ও এ ধরনের কথা বলেছেন। আর হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রাঃ) একথাকে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা হিসেবে ব্যক্ত করেছেন। (আবু দাউদ, এবনে মাজাহ্, আহ্মদ)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا
رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا
شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٥٤﴾

তরজমা

(২৫৪) হে মোমেনগণ! আমি যে রিয্ক তোমাদেরকে প্রদান করেছি তা থেকে ব্যয় কর সেদিন আসার পূর্বে, যেদিন ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ হয়ে যাবে এবং বন্ধুত্ব ও সুপারিশ কোন কাজে আসবেনা এবং কাফেররাই অত্যাচারী।

তফসীরুল কোরআন

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র রাহে ব্যয় কর"।

ইসলাম মানুষকে আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের আহ্বান জানায়। এ আহ্বানে সাড়া দিতে হলে তথা নিজেকে আল্লাহ্ পাকের প্রকৃত বন্দা হিসেবে গড়ে

তুলতে হলে জান ও মাল দ্বারা ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দিতে হয়। এ কারণেই ইতোপূর্বে নির্দেশ হয়েছে–

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রাহে তোমরা জেহাদ কর আর জেহাদে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করা প্রয়োজনীয় হয় যা মানুষের জন্যে অত্যন্ত কঠিন হয়ে থাকে। এমনিভাবে আল্লাহ্‌র রাহে অর্থ সম্পদ ব্যয় করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে এরশাদ হয়েছে ঃ

مَنْ ذَاالَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا

"যে আল্লাহ পাককে করজে হাসানা দান করবে তথা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ইসলামের প্রচার প্রসারে এবং প্রতিষ্ঠায় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করবে অতঃপর আল্লাহ্ পাক তাকে বহু গুণ দান করবেন"।

আল্লাহর রাহে দান করার তাগিদ

আল্লাহ্‌র রাহে প্রাণ উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করে পবিত্র কোরআন ইতোপূর্বে তালুতের ঘটনা উপস্থাপন করেছে। এরপর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌র রাহে অর্থ-সম্পদ ব্যয়ের তাগিদ করে এরশাদ হয়েছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে রিয্ক দান করেছি তা থেকে তোমরা ব্যয় কর এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সুখ-সামগ্রী ক্রয় কর, মনে রেখো পরকালীন জিন্দেগীর জন্যে সাধনা করার সময় এ জীবন। এ জীবনের অবসান ঘটলে আর কাজ করার কোন সুযোগ থাকবেনা, এখানে কর্ম আর সেখানে ফল অতএব, এ জগতেই হতে হবে কর্মময় জীবন এবং এমন কর্ম যা হয় আল্লাহ্ পাকের পছন্দনীয় এজন্যে এরশাদ হয়েছে ঃ

مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের রাহে দান কর, পরকালীন জিন্দেগীর জন্যে পাথেয় সংগ্রহ কর সেদিন আসার পূর্বে যেদিন কোন প্রকার ক্রয়-বিক্রয় হবেনা, কোন আমল বিক্রয় করার ব্যবস্থা থাকবেনা, কারো বন্ধুত্ব কোন কাজে আসবেনা এমনকি, কারো সুপারিশও উপকারী হবেনা। সেদিন যেদিন ভাই ভাইকে দেখলে পলায়নপর হবে যেমন এরশাদ হয়েছে ঃ

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ

অতএব, সেদিনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রত্যেকের একান্ত কর্তব্য।

আল্লাহ্‌র রাহে দান করার ব্যাপারে আলোচ্য আয়াতে যে তাগিদ রয়েছে এ সম্পর্কে তফসীরকারদের দ্বিমত রয়েছে। তাদের একদল বলেছেন এ আয়াতে শুধু যাকাত সম্পর্কে তাগিদ করা হয়েছে যা আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। আর কোন কোন তফসীরকারের মতে ফরজ এবং মোস্তাহাব তথা যাকাত এবং অন্যান্য সাধারণ সদকা সহ সর্ব প্রকার দান খয়রাতের তাগিদ রয়েছে এ আয়াতে।[১]

يوم শব্দ দ্বারা এখানে কেয়ামতের দিনকে বোঝানো হয়েছে। জাহেলিয়াতের যুগে মানুষ তাদের মূর্খতার কারণে অনেক অলীক এবং ভিত্তিহীন বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস করতো। যারা মুশরেক বা পৌত্তলিক তারা তো কেয়ামতের দিন তথা শেষ বিচারের দিনের কথা আদৌ বিশ্বাসই করতো না। আর যারা আহলে কিতাব ছিল যেমন ইহুদী এবং ঈসায়ী তারা তৌরাত ও ইঞ্জিলকে বিকৃত করে এবং অনেক ভিত্তিহীন বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস করে নিজেদের পথভ্রষ্টতার শোচনীয় পরিণাম সম্পর্কে গাফেল থাকতো। তারা মনে করতো দুনিয়ার ন্যায় পরকালেও লেন দেন হবে, নেক আমল ক্রয় করা যাবে এবং মন্দ আমল কারো নিকট বিক্রয় করা যাবে।

পবিত্র কোরআন এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে এসব তোমাদের অলীক ও অবাস্তব চিন্তা, নিতান্ত ভিত্তিহীন কথাবার্তা, পরকালে এমন কিছুই হবে না যা দ্বারা মানুষ তার কর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।

وَلَا خُلَّةٌ

অর্থাৎ কারো সঙ্গে যত আন্তরিক এবং গভীর বন্ধুত্বই থাকুক না কেন, কেয়ামতের কঠিন দিনে সে বন্ধুত্ব আদৌ কোন উপকারে আসবেনা।

ঈসায়ীদের ভ্রান্ত ধারণা হলো হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র (নাউজুবিল্লাহ্) অতএব, তিনি সুপারিশ করে তাদের নাজাতের ব্যবস্থা করবেন। তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসন-কল্পে আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা রয়েছে ঃ

وَلَا شَفَاعَةٌ

অর্থাৎ কারো সুপারিশও সেদিন আল্লাহর আযাব থেকে কাউকে রক্ষা করতে পারবে না। হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে ঈসায়ীরা যে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে তার বাতুলতা ঘোষিত হয়েছে এ আয়াত দ্বারা।[২]

১। খোলাসাতুত তাফাসীর খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৯৯
তফসীরে কবীর খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা -২০৫-০৬
২। তফসীরে মাজেদী খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১০৬

এর মর্মবাণী হচ্ছে– হে মোমেনগণ! তোমরা যারা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর প্রিয় রসূলের প্রতি ঈমান এনেছ, কেয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস করেছ, তোমরা পরকালের জন্যে সম্বল সঞ্চয় কর। নেক আমল সংগ্রহ কর, আল্লাহ্র রাহে দান কর। সদকা খয়রাত যাকাত যা কিছু তোমরা আদায় করবে তার বিনিময় তোমরা অবশ্যই লাভ করবে।

এ পর্যায়ে হে মোমেনগণ! তোমরা কারো দ্বারা প্রতারিত হয়োনা, কেউ যদি বলে দুনিয়ার ন্যায় আখেরাতেও নেক আমল ক্রয় করা যাবে, মন্দ আমল বিক্রয় করা যাবে, বন্ধু-বান্ধবের সুপারিশ দ্বারাও সংকট উত্তরণ সম্ভব হবে (হে মোমেনগণ!) তোমরা এসব কথায় আদৌ আস্থা স্থাপন করোনা, বরং সময়ের সঠিক সদ্ব্যবহার কর, এ জীবনকে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর প্রস্তুতিতে ব্যয় কর। দু'দিনের জিন্দেগীকে গাফলতের আবর্তে নিপতিত করোনা, বরং এ ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগীর সাধনা দ্বারা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর আরাম-আয়েশকে ক্রয় কর।

যাকাত সম্পর্কীয় সতর্কবাণী

আলোচ্য আয়াতে সে সব লোকের জন্যে রয়েছে সতর্কবাণী যারা যথা নিয়মে যাকাত আদায় করেনা। এজন্যেই প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ) যাকাত আদায়ে যারা অস্বীকার করেছিল তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করেছিলেন।

আলোচ্য আয়াতে যাকাত প্রদানে যারা গাফলত করে এবং যারা আল্লাহ্র রাহে দান করতে কার্পণ্য করে তাদের সম্পর্কে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে এবং কেয়ামতের দিন যদি কারো কাছে নেক আমলের সম্পদ না থাকে তবে তারা কত অসহায় এবং নিরুপায় হবে তার ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, কেননা কেয়ামতের দিন প্রত্যেকটি মানুষ একা হাযির হবে। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়জন কেউই তার পাশে থাকবেনা এমনকি, যে অর্থ-সম্পদ পৃথিবীতে সঞ্চয় করে রেখে যায় তাও তার কাজে আসবেনা। হ্যাঁ শুধুমাত্র একটি পথ উন্মুক্ত রয়েছে তা হলো যদি কেউ তার অর্থ-সম্পদ আল্লাহ্র রাহে দান করে যাকাত হিসেবে বা সাধারণ সদকা হিসেবে তবে সে তার বিনিময় অবশ্যই লাভ করবে।

অতএব, কল্যাণকামী মানুষ মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য হলো অর্থ-সম্পদ আল্লাহ্র রাহে দান করে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সাফল্যকে সুনিশ্চিত করা।

وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

অর্থাৎ যারা এ কর্তব্য পালনে অবহেলা করবে নিজেদের ভবিষ্যত চিন্তা করবে না তারা সত্যিকার অর্থে জালেম, কেননা তারা নিজেদের প্রতিই জুলুম করেছে। আল্লাহ্র অনন্ত অসীম নেয়ামতকে ভোগ করেও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি,

আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধ পালন করে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করেনি তাই কাফেররাই প্রকৃত অর্থে জালেম আর তাদের জুলুমের স্বীকার তারা নিজেরাই। এজন্যে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا

অর্থাৎ তারা যা আমল করেছে তা কেয়ামতের দিন দেখতে পাবে আর তোমার পরওয়ারদেগার কারো প্রতি জুলুম করেন না।

অতএব, প্রকৃত এবং খাঁটি জালেম তারা, যারা কাফের অবস্থায় আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির হয়। বিখ্যাত তত্ত্বজ্ঞানী আতা (রহঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহর শোকর তিনি কাফেরদেরকে জালেম বলেছেন কিন্তু জালেমদেরকে কাফের বলেননি। আর আল্লাহ্ পাক কারো প্রতি জুলুম করেন না, কেননা তিনি দয়াময়, তাঁর দয়া মায়ার কোন সীমা নেই। পাপী-তাপী মানুষ যখন তাঁর মহান দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হয় তখন তিনি তাকে ক্ষমা করেন। তার তওবা কবুল করেন। অতএব, আল্লাহ্ পাকের ব্যাপারে জুলুমের কথা চিন্তাও করা যায় না।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْحَيُّ
الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى
الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ
اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا
شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ
هُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ﴿۲۵۵﴾

তরজমা

(২৫৫) আল্লাহ্ পাক, তিনি ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই। তিনি চিরঞ্জীব ও সদা বর্তমান। তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করেনা। আসমান যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর। এমন কে আছে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? মানুষের অতীত এবং ভবিষ্যত সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছা করেন তার অতিরিক্ত তাঁর জ্ঞানের কিছুই কেউ আয়ত্ব করতে পারেনা। তাঁর

আসন নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলব্যাপী এবং তাদের হেফাজতের জন্যে তাঁকে আদৌ ক্লান্তি বোধ করতে হয় না। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি মহা-মহীম।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে কেয়ামতের দিনের কথা উল্লেখিত হয়েছে। সেদিন কারো বন্ধুত্ব অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক কোন উপকারে আসবে না। সেদিন এক আল্লাহ্ পাকের দয়া-মায়া ব্যতীত গত্যন্তর থাকবে না। আর এ আয়াতে আল্লাহ্ পাকের গুণাবলী সম্পর্কে এবং তাঁর অনন্ত অসীম ক্ষমতা ও হুকুমত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় অতি আকর্ষণীয় ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। তফসীরকারগণ বলেছেন একটি বাগানে ভ্রমণ করার সময় হঠাৎ অন্য বাগানে পৌঁছে তার নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখলে যেমন দর্শক মাত্রেরই আনন্দের সীমা থাকে না, ঠিক তেমনি পবিত্র কোরআন একটি বিষয়ের বর্ণনা করতে করতে হঠাৎ অন্য একটি প্রসঙ্গ উপস্থাপন করে। এতে পাঠক মাত্রই আরও অধিক জানার আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধি করে। এটি পবিত্র কোরআনের বর্ণনা-শৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পূর্ববর্তী কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ্ পাকের রসূলগণের সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। রসূলগণের প্রধানতম কর্তব্য হলো আল্লাহ্র তৌহীদ বা একত্ববাদের বিবরণ বিশ্ববাসীর সম্মুখে তুলে ধরা। তাই এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাঁর তৌহীদের বিবরণ এভাবে পেশ করেছেন ঃ

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

এক আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। তিনি চিরঞ্জীব, চির বিরাজমান। সর্ব প্রকার সৃষ্টির তিনিই একমাত্র স্রষ্টা। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি সর্ব প্রকার দোষ-ত্রুটি বিবর্জিত। তন্দ্রা বা নিদ্রার ন্যায় কোন প্রকার দুর্বলতা তাঁকে স্পর্শও করতে পারেনা। আসমান যমীনে যা কিছু আছে সব কিছুর একমাত্র মালিক তিনিই। তাঁর ক্ষমতা সর্বত্র বিদ্যমান। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব কালে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর সমীপে সুপারিশ করার সাধ্য কারো নেই। তিনি সব কিছু জানেন। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সব বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। তাঁর জ্ঞানের পরিধি কত বিস্তৃত তা কারো জানা নাই। তিনি এক, অদ্বিতীয়, অতুলনীয়। তাঁর নিকট অসাধ্য বা অসম্ভব কিছুই নেই। তাঁর সমীপে সবই নগণ্য, সবই তুচ্ছ। তাঁর 'কুরসী' এত বিরাট যার মধ্যে সপ্ত আসমান ও যমীন সন্নিবেশিত আছে। আসমান-যমীনের সংরক্ষণ তাঁর পক্ষে আদৌ কঠিন নয়। তিনি সবার উপরে, তিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি মহান, মহিমাময়।

তৌহীদের ঘোষণা

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাকের তৌহীদ বা একত্ববাদের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এতদ্ব্যতীত আল্লাহ্ পাকের গুণাবলীকে বিশেষভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এক আল্লাহ্ ব্যতীত্ কোন মা'বুদ বা উপাস্য নেই, কোন প্রেমাস্পদ নেই। তিনি প্রেমময়, করুণাময়, অনাদী-অনন্ত, চির সুন্দর, সর্ব গুণাকর, সর্ব শক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান। তাঁর দান অনন্ত অসীম। তিনি বিশ্ব-স্রষ্টা এবং বিশ্ব-নিয়ন্তা। আর তিনিই বিশ্ব-প্রতিপালক। বিশ্ব-সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণু মহান আল্লাহ্ পাকের অপূর্ব কুদরত-হেকমতের জীবন্ত নিদর্শন।

আল্লাহ পাকের বিশেষ গুণাবলী

اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ

حَیٌّ অর্থাৎ জীবিত, যাকে মৃত্যু কখনো স্পর্শ করতে পারেনা।

قَیُّوْمٌ অর্থ যিনি নিজে চিরঞ্জীব ও চির বিদ্যমান থেকে অন্যকে কায়েম রাখেন। এ শব্দ দ্বারা আল্লাহ পাকের এমনি বিশেষ গুণ প্রকাশ করা হয়েছে যাতে কোন সৃষ্টিই শরীক হতে পারেনা, মূলতঃ আল্লাহ্ পাক তাঁর অস্তিত্ব এবং স্থায়ীত্বের জন্যে কারোই মুখাপেক্ষী নন। আর সৃষ্টি মাত্রই তার অস্তিত্বের জন্যে আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষী। কোরআনে করীমে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَمِنْ اٰیٰتِهٖٓ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের কুদরতের নিদর্শন সমূহের মধ্যে এটিও একটি যে, আল্লাহ পাকের আদেশ ক্রমেই কায়েম রয়েছে আসমান এবং যমীন। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকই আসমান যমীন ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার সব কিছুর নিয়ন্ত্রণকারী। সমগ্র সৃষ্টি জগত তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন এবং কর্তৃত্বাধীন। আল্লাহ্ পাকের পবিত্র সত্তায় কোন দোষ-ত্রুটি বা অপূর্ণতা নেই, তিনি তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে গাফেল নন, প্রতিটি মানুষের সকল আমল তাঁর নিকট সম্পূর্ণ প্রকাশ্য, কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই। এমনকি মানুষের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে যে সব ভাবনার অবতারণা হয় সে সম্পর্কেও তিনি সম্পূর্ণ অবগত, এককথায় সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রতিটি অণু পরমাণু সম্পূর্ণ এবং পরিপূর্ণ ভাবে আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন। এসব কিছু 'কাইয়ুম' শব্দের মর্মকথা।[১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড-৩; পৃষ্ঠা-৮

'আল কাইয়ুম' শব্দটির ব্যাখ্যায় আল্লামা বগভী (রঃ) বলেছেন এর অর্থ হলো সংরক্ষণকারী। আবু ওবায়েদ (রঃ) বলেছেন এর অর্থ হলো চির বিরাজমান। ইমাম বয়যাভী (রঃ) লিখেছেন যে এর অর্থ হলো যিনি সর্বদা সৃষ্টি জগতের হেফাজতকারী এবং ব্যবস্থাপক। আল্লামা সুয়তি (রঃ) 'আল কাইয়ুম' শব্দটির তরজমা করেছেন চির বিরাজমান। আল্লামা পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন সমস্ত তফসীরকারগণ 'আল-কাইয়ুম' শব্দের যা ব্যাখ্যা করেছেন তা সবই সত্য এবং ব্যাখ্যা সমূহ একত্রিত করলে যে মর্ম প্রকাশিত হয় তা-ই 'আল-কাইয়ুম' শব্দের সঠিক ব্যাখ্যা। বস্তুতঃ আল্লাহ্ পাকের পবিত্র সত্তা চির বিরাজমান, তিনি চির বর্তমান। সমগ্র সৃষ্টি জগতের অস্তিত্ব তাঁরই ইচ্ছাধীন। তাঁর মর্জি ব্যতীত কোন কিছুই অস্তিত্ব লাভ করেনি। এমনিভাবে তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছুর অস্তিত্ব বিদ্যমানও থাকেনা। সমগ্র সৃষ্টি জগৎ সম্পূর্ণভাবে তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা ও পালনকর্তা, তাঁর সর্বময় ক্ষমতা এবং শ্রেষ্ঠত্ব সর্বত্র বর্তমান।[১]

'আল-কাইয়ুম' শব্দটির ব্যাখ্যায় আল্লামা আলুসী (রঃ) বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অতপর তিনি ইমাম রাগেবের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন ঃ

القيوم القائم الحافظ لكل شئ والمعطى له مابه قوامه

অর্থাৎ 'কাইয়ুম' তিনি, যিনি স্বীয় শক্তিতেই বিদ্যমান। তিনি সব কিছুর রক্ষাকারী, সব কিছুর অস্তিত্ব প্রদানকারী।[২]

অতএব, সমগ্র সৃষ্টি জগৎ তার অস্তিত্ব এবং স্থায়ীত্বের জন্যে সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্ পাকের মুখাপেক্ষী।

পবিত্র কোরআনের এ শব্দটি দ্বারা বিভিন্ন বাতিল ধর্ম অবলম্বনকারীদের গোমরাহী প্রমাণিত হয় যারা স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে। এ পর্যায়ে আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি এ শব্দটির তফসীরে ঈসায়ী ধর্মাবলম্বীরা স্রষ্টা ও পালনকর্তা সম্পর্কে যে সব ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে তার বাতুলতা প্রমাণ করেছেন।[৩]

মুলতঃ আল্লাহ্ পাক চিরঞ্জীব, চির বিরাজমান, সৃষ্টি মাত্রের তিনিই একমাত্র স্রষ্টা। সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে তিনি মুক্ত, সর্ব প্রকার পরিবর্তন থেকে তিনি মুক্ত, সব কিছুর জ্ঞান তাঁর আছে। তিনি সর্ব শ্রোতা, সর্বজ্ঞাত। সব কিছুর উপর তাঁর

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৪
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৮
৩। তপসীরে মাজেদী খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১০৬

একচ্ছত্র ক্ষমতা বিদ্যমান, তাঁর জ্ঞান বা ক্ষমতার আওতার বাইরে কিছুই নেই। তাঁর ইচ্ছা ও মর্জি ব্যতীত কোন সৃষ্টির অস্তিত্ব অচিন্তনীয়।

لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ

অর্থাৎ তন্দ্রা এবং নিদ্রা তাঁকে স্পর্শও করেনা।

পূর্ববর্তী বাক্যে 'আল-কাইয়ুম' শব্দ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, সমগ্র সৃষ্টি জগতের একমাত্র নিয়ন্ত্রণ কর্তা হলেন স্বয়ং আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন। এতদ্বারা কারো এ ভুল ধারণা হতে পারে যে, এই বিশাল বিস্তৃত পৃথিবীর ব্যবস্থাপনার এত বড় কাজ সমাধা করার কারণে হয়তো তাঁর ক্লান্তি আসতে পারে। তন্দ্রা এবং নিদ্রার প্রয়োজন হতে পারে- এ ভুল ধারণার নিরসন-কল্পেই আলোচ্য বাক্যে ঘোষণা করা হয়েছে তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শও করতে পারেনা। তিনি এমনি সকল দুর্বলতার অনেক উর্ধ্বে। কোন কাজেই তাঁর ক্লান্তি আসেনা, বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। কোন কিছুর ইচ্ছা করলে তিনি "হও" বলেন তখন তা হয়ে যায়।

মূলতঃ তন্দ্রা এবং নিদ্রার ন্যায় দুর্বলতা আল্লাহ্ পাককে স্পর্শও করতে পারেনা। তাঁর কুদরতে এবং হেকমতেই যে সমগ্র সৃষ্টি জগত সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে এটিও তার একটি উজ্জ্বল প্রমাণ। হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের মজলিসে দণ্ডায়মান অবস্থায় পাঁচটি কথা বলেছেনঃ এতে কোন সন্দেহ নেই যে আল্লাহ পাকের নিদ্রা নেই আর নিদ্রা তাঁর পবিত্র সত্তার যোগ্যও নয়। তিনি আমল পরিমাপের পাল্লার রক্ষক, যার জন্যে ইচ্ছা তা তিনি নীচু করেন আর যার জন্যে ইচ্ছা তাকে উপরে স্থাপন করেন। তাঁর দরবারে মানুষের রাতের আমলের বিবরণ দিনের আগমনের পূর্বেই পেশ করা হয়। এবং দিনের কার্য বিবরণী রাতের আগমনের পূর্বেই পেশ করা হয়। তাঁর আবরণ হলো নূর, যদি এই নূরের আবরণ সরিয়ে দেয়া হয় তবে তাঁর জামালের নূর সেই সমস্ত সৃষ্টিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দেবে যার প্রতি তাঁর দৃষ্টিপাত হবে।[১] (মুসলিম শরীফ)

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ

অর্থাৎ "আসমান যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্ পাকের মালিকানাধীন"।

এতে কোন সৃষ্টি শরীক নেই এবং আসমান যমীনের কোন কিছুই আল্লাহ্ পাকের মালিকানার আওতার বাইরে নয়। পৌত্তলিকরা তাদের দেবতাদেরকে অনেক কিছুর অধিকারী বলে যে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে তার বাতুলতা ঘোষিত হয়েছে এ বাক্যে।

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৮

ইসলাম মানব জাতিকে সর্ব প্রকার গোমরাহীর অন্ধকার থেকে নাজাত দিয়েছে এবং এক আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে মাথা নত করার শিক্ষা দিয়েছে, কেননা তিনিই আসমান-যমীনের একমাত্র মালিক। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা এবং অধিকর্তা।

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ

"এমন কে আছে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর দরবারে সুপারিশ করতে পারে"?

অর্থাৎ এমন সাহস কারোই নেই। যেহেতু মুশরেক বা পৌত্তলিকরা এই ভুল ধারণা পোষণ করতো যে তাদের মূর্তি গুলো তাদের জন্যে সুপারিশকারী হবে যেমন কোরআনে করীমেও একথার ঘোষণা রয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى

"পৌত্তলিকরা বলতো আমরা তো এ মূর্তিগুলোর উপাসনা করি শুধু আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্যে", আর তারা একথাও বলতো পবিত্র কোরআনের ভাষায় ঃ

هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ

"এ মূর্তিগুলো তো আল্লাহ্ পাকের নিকট আমাদের জন্যে সুপারিশকারী হবে"। অথচ আল্লাহ্ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন ঃ

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ

"এ পৌত্তলিকরা আল্লাহ ব্যতীত যা কিছুর উপাসনা করে তারা এদের কোন ক্ষতিও করতে পারেনা উপকারও করতে পারেনা"।

এজন্যেই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে সুপারিশ করার সাহস কার আছে? এতে প্রথমতঃ মুশরেকদের ভুল ধারণা নিরসন করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে সুপারিশ করার সাহস বা সাধ্য কারোই নেই। অবশ্য একথা সত্য যে, আল্লাহ্ পাকের এমনও বিশেষ বন্দা রয়েছেন যারা তাঁর অনুমতিক্রমে সুপারিশ করতে পারবেন যেমন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

انا اول شافع وانا اول مشفع

"হাশরের ময়দানে আমিই সর্ব প্রথম আল্লাহ্ পাকের দরবারে সুপারিশ করবো আর আমার সুপারিশই সর্ব প্রথম কবুল করা হবে"।

বস্তুতঃ এ সুপারিশ শুধু তাঁরই বৈশিষ্ট্য।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

সমগ্র সৃষ্টি জগতের অগ্র-পশ্চাতে যা কিছু আছে তিনি সবই জানেন। তফসীরকারগণ এ আয়াতের একাধিক ব্যাখ্যা পেশ করেছেন (১) মুজাহেদ (রঃ) ও আতা (রঃ) বলেছেন ঃ এর অর্থ হলো ইতোপূর্বে দুনিয়াতে যা ঘটেছে এবং পরবর্তীতে আখেরাতে যা ঘটবে সে সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত। (২) আর যাহ্যাক এবং কালবী বলেছেন তারা আখেরাতের জন্যে যা কিছু করে পাঠাবে এবং যা কিছু পৃথিবীতে ছেড়ে যাবে সে সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। (৩) আর হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন এর অর্থ হলো আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত যা কিছু আছে এবং যা কিছু আসমানে রয়েছে সব কিছুই আল্লাহ পাকের নখদর্পণে রয়েছে। (৪) আর একটি কথা হলো যা কিছু ঘটবে তাদের মৃত্যুর পর এবং যা কিছু ঘটেছে তাদের সৃষ্টির পূর্বে সবই আল্লাহ পাক জানেন। (৫) এর অন্য একটি অর্থ হলো মানুষ ইতোপূর্বে ভাল-মন্দ যা কিছু করেছে এবং ভবিষ্যতে যা কিছু করবে সে সব বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত।[১]

এ আয়াতের মর্ম হলো একথা প্রকাশ করা যে, মানুষের জন্মের পূর্বে ও পরে দুনিয়া ও আখেরাতে যা কিছু ঘটেছে এবং যা কিছু ঘটবে এবং মানুষের নিকট যা প্রকাশিত বা গোপন– এই সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন সম্পূর্ণ অবগত। ভূত বা ভবিষ্যত কোন কিছুই আল্লাহ্ পাকের নিকট গোপন নেই।

কারো মনে এ প্রশ্ন উথিত হতে পারে যে, পৃথিবীর অগণিত মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে সঠিক বিবরণ সংরক্ষণ করা, প্রত্যেকটি মানুষের জীবনের যাবতীয় কার্যাবলীর হিসাব রক্ষা করা, প্রত্যেকের কার্যক্রমের ভাল-মন্দ নির্ণয় করা, তাদের পুরস্কার ও তিরস্কার নির্দিষ্ট করা আদৌ সহজ নয়; বরং কঠিনতর এমনকি অসম্ভব। আলোচ্য আয়াত দ্বারা মানব মনের এমনি সন্দেহের নিরসন করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাকের জ্ঞানের কোন সীমা নেই। তাঁর জ্ঞান, তাঁর ক্ষমতা এবং আধিপত্য সমগ্র সৃষ্টি জগতকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে, মানুষের কাছে যা অসম্ভব মনে হয় আল্লাহ্ পাকের দরবারে তা কোন সমস্যাই নয় কেননা তাঁর জ্ঞান, তাঁর কুদরত হেকমত অনন্ত অসীম, সবই তাঁর কর্তৃত্বাধীন।

وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ

"এবং তারা (জ্ঞানীগণ) আল্লাহ্র জ্ঞানের কিছুই আয়ত্ব করতে পারে না"।

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১০-১১

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের জ্ঞানের কোন অংশও কেউ পূর্ণভাবে আয়ত্ব কতে পারে না। সব কিছুর জ্ঞানই আল্লাহ্ পাকের আছে, আর এটি শুধু আল্লাহ্ পাকেরই বৈশিষ্ট্য।

اِلَّا بِمَا شَآءَ

তবে হ্যাঁ, আল্লাহ্ পাক যে জ্ঞান দান করতে চান তা সে আয়ত্ব করতে পারে আর সে জ্ঞান হয় অত্যন্ত সামান্য। কোরআনে করীমেই আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন ঃ

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا

"তোমাদেরকে অত্যন্ত সামান্য জ্ঞানই প্রদান করা হয়েছে"।

আর্শ কুরসীর বিবরণ

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

সাঈদ এবনে জুবায়ের (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ 'কুরসী' অর্থ এলম। মুজাহেদ (রঃ)-ও এমনি অর্থ ব্যক্ত করেছেন। এজন্যে এলম শিক্ষা করার খাতাকে 'কুররাসা' বলা হয়। কোন কোন আলেম বলেন, কুরসী অর্থ সার্বভৌম ক্ষমতা। এ কারণেই ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত রাজত্বকে আরবী ভাষায় 'কুরস' বলা হয়ে থাকে।

যাহোক, এ সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানীগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ 'কুরসী' আরশের সম্মুখে সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আর এ আয়াতের অর্থ আসমান-যমীনকে কুরসী পরিবেষ্টন করে রেখেছে।

এবনে মরদবিয়া (রঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামের এরশাদ থেকে তিনি বলেছেনঃ সাত আসমান সাত যমীন কুরসীর তুলনায় সেরূপ যেন ময়দানে একটি খোসা পড়ে আছে। আবার কুরসী আরশের তুলনায় সেরূপ যেমন একটি খোসার তুলনায় ময়দানের শ্রেষ্ঠত্ব।

আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বক্তব্য হলো কুরসীর মধ্যে সাত আসমান এমনভাবে রয়েছে যেমন ঢালের মধ্যে সাতটি দেরহাম।

হযরত আলী (রাঃ) এবং মোকাতেল (রাঃ)-এর মন্তব্য হলো কুরসীর প্রত্যেকটি পায়ার দৈর্ঘ্য হলো সাত আসমান এবং সাত যমীনের সমান। কুরসী আরশের সম্মুখে রয়েছে। কুরসীকে চারজন ফেরেশতা বহন করছেন। প্রত্যেক ফেরেশতার চারটি মুখ রয়েছে। এ ফেরেশতাদের পা সপ্তম যমীনের নিম্ন দেশে প্রস্তরের ওপর রয়েছে। এ

দূরত্ব পাঁচশত বছরের পথের সমান। একজন ফেরেশতার আকৃতি আদম (আঃ)-এর ন্যায় যিনি সারা বছর মানব জাতির রিয্কের জন্যে আল্লাহ্ দরবারে দোয়া করতে থাকেন। আরেকজন ফেরেশতার আকৃতি চতুঃষ্পদ জন্তুর সর্দার গরুর মত যিনি সারা বছর চতুঃষ্পদ জন্তুর রিয্কের জন্যে দোয়া করতে থাকেন। কিন্তু যখন বণী ইসরাঈলরা গরুর বাছুর পূজা করে তখন থেকে তার চেহারায় এক প্রকার ক্ষত চিহ্ন দেখা দিয়েছে। আরেকজন ফেশেতার আকৃতি রয়েছে বাঘের মত যিনি হিংস্র জন্তুদের রিয্কের জন্যে দোয়া করতে থাকেন। চতুর্থ ফেরেশতার আকৃতি হলো শকুনের ন্যায় যিনি পক্ষীকূলের রিয্কের জন্যে দোয়া করতে থাকে।

কোন কোন হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে আরশ বহনকারী এবং কুরসী বহনকারীদের মধ্যে সত্তরটি পর্দা রয়েছে অন্ধকারের, আর সত্তরটি পর্দা রয়েছে নূরের। আর প্রত্যেকটি পর্দা এত মোটা যেন পাঁচশ' বছরের পথ। যদি এমনি পর্দা না থাকতো তবে আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের নূরের কারণে কুরসী বহনকারী ফেরেশতাগণ জ্বলে শেষ হয়ে যেতো।[১]

'কুরসী' সম্পর্কিত ব্যাখ্যা

কুরসী সম্পর্কে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন– অনেক তফসীরকার কুরসী সম্পর্কে বলেন যে এটি দু' পা রাখার স্থান। আবার একথাও বলা রয়েছে যে এই কুরসী সম্পর্কে কেউ কোন ধারণা করতে সক্ষম হয় না। কেবলমাত্র আল্লাহ্ পাকই এর হাকীকত সম্পর্কে অবগত আছেন। হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ)-ও এরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

আবু মালেক (রঃ) বলেন যে, কুরসীর অবস্থান হলো আরশের নীচে। সাদী বলেন ঃ কুরসী সব কয়টি আসমান ও যমীনকে পেটের মধ্যে নিয়ে আরশের সামনে অবস্থান করছে।

হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে সাত যমীন এবং সাত আসমানকে যদি প্রসারিত করা হয় তবে তা কুরসীর কাছে এমন হবে যেন একট বিস্তৃত ময়দানে একটি বৃত্ত মাত্র। হযরত আবু জর গিফারী (রাঃ) একবার কুরসী সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শপথ করে উপরোক্ত কথাটিই জবাবে এরশাদ করেছিলেন। আবার আরশের তুলনায় কুরসীর উদাহরণও অনুরূপ বলে তিনি এরশাদ করেছিলেন।

একবার একজন স্ত্রীলোক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে দোয়া করার আবেদন করলো যেন আল্লাহ্ পাক তাঁকে জান্নাত প্রদান করেন। তিনি তখন আল্লাহ্ পাকের মাহাত্ম বর্ণনা করে এরশাদ করলেন যে তাঁর

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৬-২৭

কুরসী আসমান এবং যমীনকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। অনেকে আবার কুরসীকে অষ্টম আসমান হিসেবে মত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এ মতের বিরুদ্ধে অনেক তত্ত্বজ্ঞানী রয়েছেন। হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে 'কুরসী'ই হলো আরশ। তবে সঠিক তথ্য হলো এই, কুরসী হলো এক জিনিস এবং আরশ হলো অন্য জিনিস। আর এই আরশ 'কুরসী'র চেয়ে অনেক অনেক গুণ বড়।[১]

وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا

অর্থাৎ বিশাল বিস্তৃত আসমান যমীন তথা সমগ্র সৃষ্ট জগতের ব্যবস্থাপনায় এবং রক্ষণাবেক্ষণে আল্লাহ্ পাকের কোন ক্লান্তি আসে না। এ বাক্য দ্বারা পৌত্তলিক ও বাতিল ধর্মাবলম্বীদের এ ভ্রান্ত ধারণা দূর করা হয়েছে যে এই বিরাট আসমান যমীনের ব্যবস্থাপনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ একা আল্লাহ্ পাকের পক্ষে কি করে সম্ভব হয়? এ বাক্যটিতে সুস্পষ্ট ভাষায় এমন ভুল ধারণার নিরসন করা হয়েছে, কেননা আল্লাহ্ পাকের পবিত্র সত্ত্বার শান এবং মরতবা এত উচ্চে যা মানুষের পক্ষে কল্পনাতীত। তবে সহজে এতটুকু বুঝতে হবে যে কোন কাজই আল্লাহ্ পাকের নিকট কঠিন নয় তা যত বড়ই হোক না কেন। আর এজন্যেই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

অর্থাৎ তিনি সর্বোচ্চ, তিনি মহা মহীমাময়।

তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ন বর্ণনাতীত। তাঁর উচ্চ মরতবা উপলব্ধি করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি বর্ণনা করাও মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এক কথায় সকল শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র অধিকারী আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন। সমগ্র সৃষ্ট জগৎ তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। মানুষ তাঁর প্রশংসার হক্ব আদায় করতে পারেনা বলেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ পাকের শানে এভাবে আরজী পেশ করেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَيْكَ

"হে আল্লাহ! তুমি এমনই যেমন তুমি নিজে তোমার প্রশংসা করেছ"।

বস্তুতঃ আয়াতুল কুরসীতে আল্লাহ্ পাকের পবিত্র সত্ত্বার পরিচয় ও গুণাবলীর বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

এ কারণেই হাদীস শরীফে আয়াতুল কুরসীর বিশেষ ফজিলত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৮
তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৬-২৭

আয়াতুল কুরসীর ফজিলত

হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ)-কে একবার হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করলেন, "সমগ্র কোরআনে পাকে কোন্ আয়াতটি মহান"? হযরত এবনে কা'ব (রাঃ) আরজ করলেন, "আল্লাহ্ পাক এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অধিক জানেন"। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবার ঐ প্রশ্ন করলেন। এভাবে বারবার প্রশ্ন করার ফলে হযরত এবনে কা'ব (রাঃ) আরজ করলেন যে "তা হলো আয়াতুল কুরসী"। এবার হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "হে আবুল মুনজের! আল্লাহ্ পাক তোমার এলমকে বরকতময় করে দিন। সেই আল্লাহ্র শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে! এ আয়াতের একটি জিহ্বা এবং দুটি ওষ্ঠ আছে। আরশের খুঁটিতে জড়িয়ে থেকে আল্লাহ্ পাকের পবিত্রতা বর্ণনায় রত আছে। (মসনদে আহ্মদ)

হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) বলেন ঃ আমার নিকট খেজুরে পরিপূর্ণ একটি থলে ছিল, আমি লক্ষ্য করলাম প্রতিদিনই কিছু খেজুর থলে থেকে কমে যায়। আমি এক রাত্রে জাগ্রত থেকে প্রহরারত রইলাম। আমি লক্ষ্য করলাম যে, একটি জন্তু মনে হলো একজন যুবকের ন্যায় ঘরে প্রবেশ করল। আমি তাকে সালাম দিলাম। সে আমার সালামের জবাব দিল, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম তুমি কি মানুষ না জ্বীন? সে বলল আমি জ্বীন, আমি বললাম তোমার হাত দেখাও, সে হাত বাড়িয়ে দিলো, আমি তার হাতকে আমার হাতে নিয়ে দেখলাম যেন কুকুরের হাত এবং তাতে পশমও রয়েছে কুকুরের পশমের ন্যায়, আমি জিজ্ঞাসা করলাম জ্বীনদের অবস্থা কি জন্মগত ভাবেই এমন? সে বলল জ্বীনদের মধ্যে আমি সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী। আমি বললাম, আমার খেজুর চুরি করার দুঃসাহস তুমি কি করে পেলে? সে বলল, আমি জানি তুমি সদকা করা পছন্দ কর এমন অবস্থায় আমি কেন মাহরুম থাকব? আমি বললাম, তোমাদের দ্বারা যে ক্ষতি সাধিত হয় তা থেকে আত্মরক্ষার পন্থা কি? সে বলল, আয়াতুল কুরসী।

সকালে আমি যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান দরবারে হাযির হই তখন আমি রাত্রের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ সে সম্পূর্ণ সঠিক বলেছে।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মোহাজেরীনদের মজলিসে আগমন করলে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! পবিত্র কোরআনের কোন্ আয়াতটি সর্বাধিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আয়াতুল কুরসী পাঠ করে শোনালেন।

হযরত আবু জর (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলাম, তখন তিনি মসজিদে অবস্থান করছিলেন। আমি উপবিষ্ট হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি নামায আদায় করেছ? আমি বললাম জ্বী-না। তিনি এরশাদ করলেন ওঠো, নামায আদায় কর। আমি নামায আদায় করে পুনরায় তাঁর খেদমতে হাযির হলাম। তিনি এরশাদ করলেন ঃ আবু জর! জ্বীন এবং মানুষ শয়তান থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা কর। আমি আরজ করলাম, হুজুর! মানুষ শয়তানও কি আছে? তিনি এরশাদ করলেন, হ্যাঁ, আমি আরজ করলাম নামায সম্পর্কে আপনার কি অভিমত? তিনি এরশাদ করলেন নামায হলো পরিপূর্ণ কল্যাণ যার ইচ্ছা তা থেকে কম অংশ নিতে পারে, যার ইচ্ছা বেশী নিতে পারে। আমি আরজ করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ! রোজা! তিনি এরশাদ করলেন ফরজ, আল্লাহর নিকট তার বিনিময় অনেক, আমি আরজ কলাম সদকা? তিনি এরশাদ করলেন ঃ অত্যধিক বিনিময় প্রদানকারী সৎ কাজ। আমি আরজ করলাম সর্বোত্তম সদকা কোন্‌টি? তিনি এরশাদ করলেন ঃ যার সম্পদ কম তার সদকা দানে সাহস করা অথবা অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে অভাবগ্রস্ত মানুষের অভাব দূর করা। আমি প্রশ্ন করলাম সর্ব প্রথম নবী কে? তিনি এরশাদ করলেন হযরত আদম (আঃ)। আমি জিজ্ঞাসা করলাম তিনি কি নবী ছিলেন? তিনি এরশাদ করলেন, নবীতো ছিলেনই আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে কথাও বলেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম রসূলগণের সংখ্যা কত? তিনি এরশাদ করলেন ঃ ৩০০ এবং তার উপর কিছু। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আয়াত কোন্‌টি অবতীর্ণ হয়েছে? তিনি এরশাদ করলেন, আয়াতুল কুরসী। (মসনদে আহমদ)

আর একখানি হাদীসে রয়েছে হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, জ্বীনেরা আমার কিছু টাকা পয়সা চুরি করে নিতো, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে অভিযোগ করলাম, তিনি এরশাদ করলেন তুমি যখন এরপর তাকে দেখবে তখন বলবে بِسْمِ اللّٰهِ اَجِيْبِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ যখন সে আসল, আমি বাক্যটি উচ্চারণ করলাম, পরে তাকে ছেড়ে দিলাম। আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার কয়েদী কি করেছে? আমি আরজ করলাম, তাকে আমি পাকড়াও করেছিলাম কিন্তু “আর আসবেনা” বলে অঙ্গীকার করায় ছেড়ে দিয়েছি। তিনি এরশাদ করলেন, সে পুনরায় আসবে। আমি এভাবে তাকে দু’ তিন বার ধরেছি এবং অঙ্গীকার নিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ ঘটনার উল্লেখ করলে তিনি প্রত্যেকবারই বললেন সে আবারও আসবে। অবশেষে তাকে আমি

পুনরায় পাকড়াও করলাম এবং বললাম তোকে আর আমি ছাড়বনা। সে বলল আমাকে ছেড়ে দাও আমি তোমাকে এমন একটি জিনিস বলে দেবো যার কারণে তোমার নিকট কোন জ্বীন বা শয়তান আসতেই পারবেনা, আমি বললাম, হ্যাঁ বলঃ সে বললো তা হলো আয়াতুল কুরসী। আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি এরশাদ করলেন ঃ যদিও সে মিথ্যাবাদী তবে একথাটি সত্য বলেছে।[১] (মসনদে আহমদ)

আয়াতুল কুরসীর ফজিলত সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে পরবর্তী নামাজের সময় পর্যন্ত তাকে হেফাজত করা হবে। আর এ আমলটি যে বিরতিহীন ভাবে করবে সে আম্বিয়া, আউলিয়া এবং শহীদানের দলভুক্ত হবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরসী প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর পাঠ করবে তাকে প্রদান করা হবে কৃতজ্ঞ অন্তর এবং তাকে আল্লাহ্র ওলীদের আমলও প্রদান করা হবে আর মৃত্যু ব্যতীত কোন কিছু তাকে বেহেশতে প্রবেশে বাধা দেবে না। অর্থাৎ সে একদিকে মৃত্যু বরণ করবে, অন্যদিকে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এই আরযী পেশ করলো যে আমার গৃহে বরকত হয় না। তখন তিনি এরশাদ করলেন, “তুমি আয়াতুল কুরসী পাঠ কর, মনে রেখো যে খাবারের উপর আয়াতুল কুরসী পাঠ করা হবে তাতে বরকত হবে”।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ এক ব্যক্তি আরয করলো, “ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কোন জিনিস বাতলে দিন যা আমার জন্যে উপকারী হয়”। তিনি এরশাদ করলেন, “তুমি আয়াতুল কুরসী পাঠ কর, এতদ্বারা তোমার এবং তোমার আশে-পাশের ঘরগুলোর হেফাজত হবে”।

হাদীস শরীফে পবিত্র কোরআনের উত্তম আয়াত বলা হয়েছে আয়াতুল কুরসীকে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেছেন ঃ আয়াতুল কুরসী পবিত্র কোরআনের এক চতুর্থাংশ, যা আরশের ভাণ্ডার থেকে বের হয়েছে।[২]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৬
২। খোলাসাতুত তাফাসীর খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২০০
তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩১-৩২

এসমে আজম

অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ দু'টি আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্ পাকের এসমে আজম রয়েছে। একটি হলো আয়াতুল কুরসী আর অপরটি হলো আলিফ-লাম মীম। আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইউল কাইউম (মসনদে আহমদ)।

অন্য হাদীসে রয়েছে ঃ এসমে আজম এমন জিনিস যার বরকতে আল্লাহ্ পাকের দরবারে যে দোয়াই করা হয় তা কবুল হয়। এসমে আজম তিনটি সূরায় রয়েছে– (১) সূরা বাকারাহ্ (২) সূরা আলে এমরান এবং (৩) সূরা তোয়াহা (এবনে মরদবিয়া)।

হিশাম এবনে আম্মার খতীবে দামেশক বর্ণনা করেন ঃ সূরা বাকারায় হলো আয়াতুল কুরসী, সূরা আলে-এমরানের প্রথম আয়াত এবং সূরা তোয়াহায় হলো[১]ঃ

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, বদরের যুদ্ধের দিন আমি রণাঙ্গনে যুদ্ধ করি এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হই যেন দেখতে পারি তিনি কি করছেন। আমি লক্ষ্য করি তিনি সেজদা রত রয়েছেন এবং يا حى يا قيوم বলে আল্লাহ্ পাককে স্মরণ করছেন। অতঃপর আমি রণাঙ্গনে প্রত্যাবর্তন করি। কিছুক্ষণ পর পুনরায় আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দেখতে হাযির হই। এবারও দেখি তিনি يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ বলে আল্লাহকে স্মরণ করছেন এবং তার উপর বাড়তি কিছু বলছেন না। এমনি অবস্থায় আল্লাহ্ পাক মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেছেন।[২]

এতদ্বারাও আয়াতুল কুরসীর ফজিলত প্রমাণিত হয়, কেননা মুসলিম জাতির চরম সংকটময় মুহূর্তে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আয়াতুল কুরসীতে ব্যবহৃত দুটি শব্দ দ্বারা আল্লাহ্ পাকের সাহায্য কামনা করেছেন এবং এর বরকতে আল্লাহ্ পাক অনতিবিলম্বে মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেছেন।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৩, পৃষ্ঠা-৭
২। তফসীরে কবীর খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩

لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ
الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥٦﴾
اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۬ؕ
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ
اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥٧﴾

তরজমা

(২৫৬) দ্বীনের ব্যাপারে কোন প্রকার জবরদস্তি নাই। নিশ্চয় হেদায়েত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অতএব, যে শয়তানকে অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনে নিশ্চয় সে মজবুত রশিকে ধরে রেখেছে যা কখনও ছিন্ন হবে না। এবং আল্লাহ পাক সব কিছু শ্রবণ করেন, সব বিষয়ে ওয়াকেফহাল।

(২৫৭) আল্লাহ্ পাক মোমেনদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে গোমরাহীর অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে যান এবং শয়তান কাফেরদের অভিভাবক, সে তাদেরকে হেদায়েত থেকে গোমরাহীর দিকে নিয়ে যায়, তারাই দোযখবাসী তারা দোযখে চিরদিন থাকবে।

لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ

ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই

শানে নজুল

হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে মদীনার মুশরেক স্ত্রীলোকেরা যাদের সন্তান জীবিত থাকতো না তারা এই বলে মানত করতো, যদি আমার কোন সন্তান জীবিত থাকে তবে আমি তাকে ইহুদী ধর্মের জন্যে

প্রদান করবো। পরবর্তীতে যখন মদীনার মুশরেক সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ করলো তখন দেখা গেল এই আনসারদের অনেক সন্তান মদীনার ইহুদীদের হাতে রয়ে গেছে। অতঃপর বণী নযীর গোত্রকে যখন তাদের অপরাধের শাস্তি স্বরূপ মুসলমানগণ বহিঃস্কার করলেন তখন আনসারগণ দাবী করলেন যে ইহুদীদের কাছে আমাদের যে সকল সন্তান রয়েছে তাদেরকে আমরা রেখে দেব। এ দাবীর ফলে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ ইহুদীদের নিকট তোমাদের যে সকল সন্তান রয়েছে তোমরা তাদেরকে তাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দাও। যদি তারা তোমাদের সাথে থাকতে চায় তবে তারা তোমাদেরই থাকবে, মদীনা থেকে বহিস্কার করা হবে না। আর যদি তারা ইহুদীদের সাথে থাকতে চায় তবে তাদেরকেও দেশান্তর করে দাও।

বিখ্যাত তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেন যে মুশরেকদের 'আউস' গোত্রের কিছু লোক তাদের সন্তানদেরকে ইহুদীদের কাছে রেখে দুগ্ধ পান করাতো। অতঃপর মুশরেকরা মুসলমান হওয়ার পর যখন ইহুদীদেরকে দেশান্তর করা হয় তখন যে সকল সন্তান ইহুদী স্ত্রীলোকদের দুগ্ধ পান করছিল, তারা বলতে লাগলো– "আমরাও ইহুদীদের সাথে যাব অথবা যদি না যাই তবে অন্ততঃ তাদের ধর্মের অনুসারী হয়ে থাকবো"। তখন তাদের অভিভাবকেরা তাদের উভয় রূপ মনোভাবের বিরোধিতা করলো। ফলে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হলো।

আলোচ্য আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর আরেকটি বর্ণনা এই, 'সালেম বিন আউফ' নামক আনছার গোত্রের এক ব্যক্তি ছিল। তার নাম ছিল হাছীন। এই হাছীনের দুটি ছেলে ছিল খৃষ্টান। হাছীন মুসলমান হওয়ার পর হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করলেন, "আমার ছেলে দুটি খৃষ্টান ধর্ম ছাড়া কিছুই মানতে চায় না। এখন আমি বল প্রয়োগ করে তাদেরকে মুসলমান বানাতে চাই"। এ অবস্থায় উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়।[১] আয়াতের মর্মার্থ হলো কাউকে ঈমানদার বানাবার জন্যে বল প্রয়োগের কথা চিন্তাও করা চলে না। কারণ اکراہ শব্দটির অর্থ শুধুমাত্র এই যে কাউকে বল প্রয়োগ করে এমন কোন কাজ করানো যা সে খুশী হয়ে করতে চায় না। বল প্রয়োগ করে কোন কথা বলানো যায় এবং কাজ করানো যায়; কিন্তু ঈমানের ব্যাপারে জোর জবরদস্তি চলেনা। ঈমান হলো মনের ব্যাপার আর মনের উপর কোন জোর চলে না।[২]

১। তফসীরে রুহুল মা'আনী খণ্ড-, পৃষ্ঠা-১৩
২। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩২-৩৩

পূর্বের একখানি আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ

"আল্লাহ পাক যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেতো"।

এর দ্বারা যুদ্ধের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছিল। বর্তমান আয়াতে আরও পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয়েছে যে কাউকে বল প্রয়োগ করে মুসলমান বানানো যুদ্ধের উদ্দেশ্য নয়। ইসলাম গ্রহণের জন্যে তরবারি চালানোর দরকার হয় না। কারণ আল্লাহ্ পাক তাঁর নবীর পরিচয়ের জন্যে তাঁকে মোযেজা দিয়েছেন এবং প্রকাশ্য আয়াত সমূহ দান করেছেন, ফলে হক্ব এবং বাতিলকে দিন এবং রাতের ন্যায় সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়।[১]

যুদ্ধ শুধু দূর্নীতি অশান্তি তথা ফেতনা ফাসাদ দূর করার জন্যে সংঘটিত হয়। এ জন্যে অমুসলিমরা যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পরও জিযিয়া প্রদান করে অমুসলিম হিসেবে ইসলামী রাষ্ট্রে জীবন যাপন করতে পারে।

জিযিয়া সম্পর্কে ভুল ধারণা

উল্লেখ্য, জিযিয়া সম্পর্কে জ্ঞানের দৈন্যের কারণে কেউ কেউ এই ভুল ধারণা পোষণ করে যে 'জিযিয়া'ও এক প্রকার বাধ্যবাধকতা, বরং প্রকৃত অবস্থা এই যে জিযিয়ার উদ্দেশ্য হলো ইসলামী কানুন এবং ইসলামী রাষ্ট্রের প্রভাবকে সমুন্নত রাখা; ব্যক্তিগতভাবে কোন অমুসলমানকে মুসলমান হওয়ার জন্যে বাধ্য করা নয়।[২]

قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

"নিশ্চয় হেদায়েত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে"।

একথার তাৎপর্য হচ্ছে এই যারা ইসলামকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছে তারা ধ্বংস এবং প্রবঞ্চনা থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে। এজন্যেই যারা আল্লাহ্ পাকের পথে সঠিক ভাবে সুদৃঢ় রয়েছে তাদের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে এমন ব্যক্তির সাথে যে কোন মজবুত রজ্জুর বেষ্টনকে আঁকড়ে ধরে আর এর ফলে পতনের বিপদ থেকে রক্ষা পায়। আর এমন মজবুত রজ্জু ছিন্ন হওয়ার যেমন আশংকা থাকেনা তেমনি কেউ যদি ইসলামকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে তবে তারও কোন ক্ষতি হয় না।

১। খোলাসাতুত তাফাসীর, পৃষ্ঠা-২০১
২। তফসীরে মাজেদী (উর্দু) খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১০৭

হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালামের (রাঃ) বিস্ময়কর স্বপ্ন

মসনদে আহমদে সংকলিত একখানি হাদীস রয়েছে হযরত কায়েস এবনে ওবাদা বর্ণনা করেন ঃ আমি মসজিদে নববীতে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলো যাকে মনে হলো অত্যন্ত পরহেযগার ব্যক্তি। তিনি দু' রাকাআত নামায আদায় করলেন। উপস্থিত লোকেরা তাঁকে দেখে বললো, "এই ব্যক্তি জান্নাতী"। তিনি যখন মসজিদ থেকে বের হয়ে আসলেন তখন আমিও তাঁর সঙ্গে বের হলাম এবং তাঁর সাথে কথা শুরু করলাম এবং বললাম, "আপনি যখন মসজিদে প্রবেশ করেছিলেন তখন লোকেরা আপনার সম্পর্কে এমন মন্তব্য করলো"।

তিনি বললেন, "সুবহানাল্লাহ্! এমন কথা কারোই বলা উচিত নয় যার এলম সে ব্যক্তির নেই। তবে হ্যাঁ একটা কথা অবশ্যই আছে। আর তা হলো এই, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমি যেন একটি সুন্দর মনোরম বাগানে আছি। সেই বাগানের মধ্যস্থলে একটি লোহার খুঁটি আছে। সেই খুঁটিটি যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত চলে গেছে। সেই খুঁটিটির মাথায় একটি কড়া আছে। আমাকে বলা হয়, তুমি এই খুঁটির উপর আরোহন কর। আমি বললাম, আমি এর উপর আরোহন করতে পারবো না। তখন এক ব্যক্তি আমাকে সাহায্য করলো এবং আমি সহজেই তাতে আরোহন করলাম এবং সেই কড়াটিকে সে ব্যক্তি বললো খুব মজবুতভাবে ধরে রাখ। এমন সময় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি দেখলাম ঐ কড়াটি আমার হাতেই রয়েছে। আমি স্বপ্নটি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট বর্ণনা করি। তখন তিনি এরশাদ করলেন, "ঐ বাগানটি হলো ইসলাম আর ঐ খুঁটিটি হলো দ্বীন। আর ঐ কড়া হলো সুদৃঢ় রজ্জু। এর তাৎপর্য হলো, তুমি মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের উপর কায়েম থাকবে"। এ ব্যক্তি ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ)। এই হাদীস বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে।

اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا

এ আয়াতে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ আল্লাহ পাক মোমেনদের অভিভাবক, তিনিই তাঁর প্রতি বিশ্বাসী বন্দাদের সহায়ক, তিনিই তাদেরকে গোমরাহীর অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসেন।

পক্ষান্তরে, যারা কাফের, যারা আল্লাহর অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ তাদের বন্ধু হলো শয়তান। আর শয়তান মানুষও হতে পারে জ্বীনও হতে পারে। আর শয়তানের কাজ হলো মানুষকে হেদায়েতের পথ থেকে মাহরুম করা এবং গোমরাহীর অন্ধকারে নিক্ষেপ করা। বস্তুতঃ যারা শয়তানের অনুগমন করে গোমরাহীর পথ অবলম্বন করে তারা হয় দোযখবাসী। আর তাদেরকে চিরদিন দোযখে থাকতে হবে।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'জুলুমাত' গোমরাহী বা কুফর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে আর নূর শব্দটি ঈমান এবং হেদায়েতের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। জুলুমাত শব্দটি বহুবচন, কেননা কুফরী বা নাফরমানীর পথ অনেক। আর নূর শব্দটি একবচন, কেননা ঈমান বা হেদায়েতের পথ একটিই। কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا

"নিশ্চয় এটিই আমার সঠিক পথ"।

হক্ব এবং সত্য একই পক্ষান্তরে বাতিল বহু।[১]

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَاَنِ اعْبُدُوْنِىْ ط هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ

অর্থাৎ শুধু আমার বন্দেগী কর, এটিই সরল সঠিক পথ। এমনিভাবে আরও এরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

নিশ্চয় আপনি রসূলগণের অর্ন্তভুক্ত, আপনি রয়েছেন সকল সঠিক পথে। সঠিক পথ হলো তওহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা।

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে তাঁর পরিপূর্ণ অনুকরণ করা।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِىْ رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ
الْمُلْكَ ۘ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۙ قَالَ اَنَا
اُحْىٖ وَاُمِيْتُ ؕ قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ
الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ ؕ وَاللّٰهُ
لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۲۵۸﴾

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১১

তরজমা

(২৫৮) (হে রসূল!) আপনি কি তার কথা জ্ঞাত হননি যে স্বীয় প্রতিপালক সম্পর্কে ইব্রাহীমের (আঃ) সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল। এজন্যে যে আল্লাহ্ পাক তাকে রাজত্ব দান করেছিলেন। যখন ইব্রাহীম (আঃ) বলেছিলেন, আমার পালনকর্তা তিনিই যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু মুখে পতিত করেন, তখন সে বলেছিল, আমিও জীবন দান করি এবং জীবন নাশ করি। ইব্রাহীম (আঃ) বলেছিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন, তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর, অবশেষে সেই কাফের হতবুদ্ধি হয়ে রইলো এবং আল্লাহ্ পাক জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে সম্পর্ক

ইতোপূর্বে আয়াতুল কুরসীতে মহান আল্লাহ্ পাকের পবিত্র সত্তা এবং অনেক গুণাবলী সম্পর্কে ঘোষণা রয়েছে এবং তওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের বিবরণ শুরু হয়েছে।[১]

এ আয়াত থেকে তওহীদের প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি ঘটনা বা দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে নমরুদের বিতর্ক

প্রথম ঘটনা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে নমরুদের বিতর্ক সম্পর্কীয়। এ ব্যক্তির নাম ছিল নমরুদ এবনে কেনআন এবনে কুশ এবনে সাম এবনে নূহ। নমরুদ অনেক দিন থেকে রাজত্ব করছিল। তার রাজধানী ছিল বাবুল শহর। বাবুল শহর বর্তমান ইরাকের বাগদাদ থেকে প্রায় সত্তর মাইল দূরে অবস্থিত। নমরুদ ছিল তার ক্ষমতার গর্বে গর্বিত। অনেক দিনের ক্ষমতা, দাপট তাকে আত্মবিস্মৃত করে রেখেছিল, তাই সে খোদাই দাবী করে বসেছিল। মানুষের প্রতি জুলুম অত্যাচার করেও মানুষের নিকট থেকে তার আনুগত্যের স্বীকৃতি আদায় করে নিত। বিখ্যাত তফসীরকার হযরত মুজাহেদ (রঃ) বলেন, তদানীন্তন পৃথিবীতে চার ব্যক্তি বাদশাহ হয়েছিলেন। তন্মধ্যে দু'জন মোমেন, দু'জন কাফের। মোমেন হলেন হযরত সোলায়মান (আঃ) এবং জুলকারনাইন। আর কাফের ছিল বখত নসর এবং নমরুদ। ক্ষমতার দাপটে নমরুদ জনসাধারণকে বাধ্য করতো তাকে সেজদা করতে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন তার সম্মুখে গমন করেন তাঁকেও তখন নমরুদকে সেজদা

১। তফসীরে হাক্কানী, তৃতীয় পারা, পৃষ্ঠ-৭

করতে বলা হয়। তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানান এবং বলেনঃ আমার প্রতিপালক ব্যতীত আর কেউ সেজদার উপযুক্ত নয়। নমরুদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেঃ তোমার প্রতিপালক কে? প্রভু বা প্রতিপালকতো আমি নিজেই। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলেনঃ

رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ

আমার প্রভু তিনিই যাঁর হাতে রয়েছে জীবন ও মরণের ক্ষমতা। অর্থাৎ যিনি জীবিত ও মৃত্যু মুখে পতিত করেন। নমরুদ তখন দু' ব্যক্তিকে হাযির করলো, একজনকে মৃত্যু মুখে পতিত করলো আর একজনকে ছেড়ে দিল এবং বললো দেখলে তো?

اَنَا اُحْيٖ وَاُمِيْتُ

আমি যাকে ইচ্ছা মারি, যাকে ইচ্ছা জীবিত রাখি, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দেখলেন লোকটি এত নির্বোধ যে, সে জীবন ও মরণের তাৎপর্যও বুঝতে পারে না। সে কারণে তিনি অহংকারী এবং অভিশপ্ত নমরুদকে অন্য একটি দলিল দ্বারা বোঝাতে চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ

"(অর্থাৎ) আমার প্রভু আল্লাহ পাক সূর্যকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে আনেন। তুমি তোমার ক্ষমতা প্রমাণ কর এবং সূর্যকে পশ্চিম থেকে পূর্বে নিয়ে আস। নমরুদ তখন হতবাক হলো। তার নিকট এর কোন জবাব ছিল না সে নিরুত্তর হলো, এই সময় সে হেদায়েত লাভ করতে পারতো কিন্তু তার নসীব মন্দ ছিল, তাই সে হেদায়েতের পথ অবলম্বন করলো না।

সাদী বর্ণনা করেন এ ঘটনা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অগ্নিকুণ্ড থেকে বের হয়ে আসার পর ঘটে। যায়েদ এবনে আসলাম (রহঃ) বর্ণনা করেন তখন দেশে খুব অভাব-অনটন ছিল। সেজন্যে লোকেরা খাদ্য দ্রব্যের জন্য নমরুদের নিকট গমন করতো। যে নমরুদকে সেজদা করতো তাকে খাদ্য দ্রব্য দেয়া হতো। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যেহেতু তাকে সেজদা দিতে অস্বীকার করেছেন তাই তাঁকে খাদ্য দ্রব্য দেয়া হলোনা। তিনি খালি হাতে চলে এলেন। পথ থেকে কিছু বালু দ্বারা তাঁর থলে পূর্ণ করে নিলেন। বাড়ীতে এসে নিদ্রিত হলেন। তাঁর স্ত্রী সারা (আঃ) থলে খুলে দেখলেন তাতে রয়েছে অতি উত্তম খাদ্য-দ্রব্য। তিনি তা দ্বারা খাবার তৈরী করলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) জাগ্রত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, খাদ্য দ্রব্য কোথা থেকে পেলে? তিনি জবাব দিলেন আপনার নিয়ে আসা থলে থেকেই এ খাদ্য দ্রব্য পেয়েছি। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) উপলব্ধি করলেন যে, এ হলো আল্লাহ পাকের রহমত এবং দান।[১]

১। তাফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃ- ৩৭
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১২

নমরুদের হেদায়েতের জন্যে ফেরেশতা প্রেরণ

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ্ পাক নমরুদের নিকট একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তিনি তাকে আল্লাহর একত্ববাদ বা তৌহীদে বিশ্বাসী হওয়ার আহবান জানান কিন্তু সে এ আহবানে সাড়া দিতে অস্বীকৃতি জানায়। দ্বিতীয়বার তার নিকট ফেরেশতা প্রেরিত হয়। তখন সে তৌহীদের দাওয়াত করতে অস্বীকার করে। আল্লাহ্ পাক তৃতীয়বার এই জালেম বাদশাহর নিকট তৌহীদের দাওয়াত নিয়ে ফেরেশতা প্রেরণ করেন কিন্তু নমরুদের ঔধ্যত্ব এতটুকুও কমে না। সে কোন অবস্থাতেই তৌহীদে বিশ্বাস করতে রাজী হয় না। তখন ফেরেশতা বলেন, তুমি তোমার সৈন্য বাহিনী নিয়ে হাযির হও। আমিও আমার বাহিনী নিয়ে আসি। নমরুদ এক বিরাট সৈন্য বাহিনী তৈরী করে এবং ঠিক সূর্য উদিত হওয়ার সময় সে তার সৈন্য বাহিনী নিয়ে রণাঙ্গনে হাযির হয়।

নমরুদ ও তার সৈন্য বাহিনীর শোচনীয় পরিণাম

আল্লাহ্ পাক তার মোকাবেলায় মশক প্রেরণ করেন। এই মশক বাহিনী নমরুদের সৈন্য বাহিনীর রক্ত চুষে খেয়ে ফেলে এমনকি, তাদের গোশ্ত পর্যন্ত ভক্ষণ করে এবং শুধু তাদের হাড়গুলো তাদের নির্দশন স্বরূপ অবশিষ্ট থাকে। সমস্ত সৈন্য বাহিনী নীরবে ধ্বংস হয়ে যায়। একটি মশা নাকের পথ ধরে নমরুদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে দংশন করতে থাকে। মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকেও এ যন্ত্রণা ছিল অধিকতর। সে এই মশকের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে দেয়ালের সঙ্গে তার মাথায় আঘাত দিত। পাথর দিয়ে মাথায় আঘাত দিত, এভাবে একদিন এই অহংকারী অত্যাচারী রাজা পৃথিবী থেকে অপমানিত হয়ে বিদায় নিতে বাধ্য হয়।[১]

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الاية

অর্থাৎ "মোমেনদের বন্ধু হলেন আল্লাহ্ পাক আর কাফেরদের বন্ধু হলো শয়তান"।

উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, আন্তরিক ভাবে যাঁরা আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, পরিপূর্ণ ভাবে যাঁরা আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখে, সত্যিকার অর্থে অবশেষে সাফল্য তারাই লাভ করে। প্রকাশ্যে তারা যত অসহায়ই হোক না কেন। যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ্ পাক তাদের সহায়ক তাই তারাই অবশেষে সফলকাম হয়। পক্ষান্তরে যারা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৩

অকৃতজ্ঞ হয়, প্রকাশ্যে তারা যত শক্তিশালীই হোক না কেন তাদের পরিণাম হয় শোচনীয়, তাদের শাস্তি থাকে অবধারিত।[১] পবিত্র কোরআন এ ঘটনার উল্লেখ করে বিশ্ববাসীকে এ পর্যায়ে সতর্কতা অবলম্বনের তাগিদ করেছেঃ

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

আর আল্লাহ্ পাক জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। আর তা করেন না তাদের জুলুমের কারণেই, কেননা আলোচ্য ঘটনায় যখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কথার জবাবে নমরুদ দাবী করলো যে জীবন ও মৃত্যু তার হাতেই। এতদ্বারা সে দাবী করলো সৃষ্টি জগতের উপর তার আধিপত্যের কথা। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তার এই আস্ফালনের জবাবে বললেন, যদি একথা সত্য হয় যে, তুমি সৃষ্টি জগতের উপর তোমার ক্ষমতা বিস্তার করেছ তাহলে আল্লাহ্ পাক সূর্যকে পূর্বাকাশ থেকে উদিত করেন এবং পশ্চিমাকাশে নিয়ে আসেন। তুমি তোমার শক্তিমত্তা প্রকাশ কর এবং সূর্যকে পশ্চিমাকাশ থেকে উদিত কর। একথা শ্রবণ করে নমরুদ হতবাক হলো এবং এর জবাব দিতে অক্ষম হলো। এই সময় সে হেদায়েতের পথ অবলম্বন করতে পারতো কিন্তু সে অহংকার করলো। এভাবে সে নিজের প্রতি জুলুম করলো এবং হেদায়েতের বদলে গোমরাহীকে গ্রহণ করলো। তাই আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ্ পাক জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।

أَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّ
هِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ۚ قَالَ أَنّٰى يُحْيِ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ
مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ
قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ
عَامٍ فَانْظُرْ إِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ وَانْظُرْ
إِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى
الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ۖ فَلَمَّا تَبَيَّنَ
لَهٗ ۙ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٥٩﴾

১। তফসীরে কাশফুর রহমান খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৯৯

তরজমা

(২৫৯) অথবা সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে এক নগর দিয়ে অতিক্রম করেছিল সে নগরের ঘরগুলো তাদের ছাদের উপর পড়েছিল। তখন সে ব্যক্তি বলেছিল আল্লাহ্ পাক কিভাবে এ নগরটি ধ্বংসের পর আবার পুনঃজীবিত করবেন, অতঃপর আল্লাহ্ পাক তাকে একশত বছর পর্যন্ত মৃত অবস্থায় রাখলেন, তৎপর তাকে জীবন দান করলেন। অতঃপর আল্লাহ্ পাক জিজ্ঞাসা করলেন মৃত অবস্থায় তুমি কতদিন ছিলে? উত্তরে সে বললঃ একদিন কিংবা এক দিনের কিছু অংশ এ অবস্থায় ছিলাম। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেনঃ বরং তুমি একশত বছর ছিলে। অতএব, তোমার পানাহারের বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত কর, তা বিকৃত হয়নি এবং তোমার গর্ধভের দিকে চেয়ে দেখ এজন্যে যে, আমি তোমাকে মানব জাতির জন্যে নিদর্শন করবো এবং গর্ধভের হাড়গুলোর জোড়ার দিকে দেখ কিভাবে আমি সেগুলোকে জোড়া দেই এবং পরে তাতে গোস্তের আচ্ছাদন করাই। অতঃপর ঘটনাগুলো তার নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হলো। সে বলল, আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

তফসীরুল কোরআন

এ জীবন ক্ষণস্থায়ী। এরপর আসবে আরেকটি জীবন যা হবে চিরস্থায়ী। মানুষ মাত্রকে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়। এ জগতের মায়া ছিন্ন করে গমন করতে হয় পর জগতে। মানুষকে আল্লাহ্ পাক পুনঃজীবন দান করবেন। তাকে হাযির হতে হবে হাশরের ময়দানে। জীবনের কৃতকর্মের হিসাব হবে সেখানে। ভাল কাজের জন্য পুরস্কার, মন্দ কাজের জন্যে শাস্তি অবধারিত- এটি স্রষ্টার অমোঘ বিধান।

কিভাবে আল্লাহ্ পাক মানুষকে পুনর্জীবন দান করবেন?

কিন্তু প্রশ্ন হলো কিভাবে আল্লাহ্ পাক মানুষকে পুনরায় জীবন দান করবেন? তা যদি একবার দেখা যেত কত ভাল হতো। বণী ইসরাঈলের নবী হযরত ওজায়ের (আঃ)-এর মনে এ প্রশ্ন উত্থিত হয়েছিল। তিনি বায়তুল মোকাদ্দাস ও তার চতুর্দিক ধ্বংসস্তূপে পরিণত দেখলেন। তার সমস্ত অট্টালিকাগুলো ভূমিস্বাত হয়ে পড়েছে এবং তার অধিবাসীরা সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। বণী ইসরাঈল জাতি যখন পাপাচারে লিপ্ত হয়, আল্লাহ্ পাক তাদের জন্যে তাঁর নবীর নিকট সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। কিন্তু তারা সতর্কতা অবলম্বনের স্থলে আরও বেশী পাপাচারে লিপ্ত হলো। তাদেরকে বলা হলো তোমাদের অন্যায় অনাচারের শোচনীয় পরিণতি স্বরূপ এক অত্যাচারী রাজাকে তোমাদের উপর ক্ষমতা প্রদান করা হবে। এরপর তিন বছর

অতিবাহিত হলো কিন্তু বণী ইসরাঈলের অন্যায়-অনাচার, জুলুম-অত্যাচার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো। অবশেষে আল্লাহ্ পাক বখত নসর নামক এক অত্যাচারী নৃপতিকে বণী ইসরাঈলের উপর ক্ষমতা দান করলেন। বখত নসর বায়তুল মোকাদ্দাস ধ্বংস করলো, বণী ইসরাঈলের লোকদের হত্য করলো, তাদের অনেককে বন্দী করে নিয়ে গেল। বখত নসর ছিল বাবিল নামক স্থানের রাজা। পূর্বেই বলা হয়েছে বাবিল হলো ইরাকের বর্তমান রাজধানী বাগদাদ থেকে প্রায় ৭০ মাইল দূর অবস্থিত একটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক শহর। বখত নসরের ধ্বংসযজ্ঞের পর বায়তুল মোকাদ্দাস হলো জনশূণ্য একটি বিরাণ শহর। এমনি অবস্থায় বায়তুল মোকাদ্দাস সফর করলেন হযরত ওজায়ের (আঃ)। তিনি একথাই ভাবছিলেন যে আল্লাহ্ পাক কিভাবে এই শহরকে আবাদ করবেন, কিভাবে মানুষ পুনঃজীবন লাভ করবে। তাই আল্লাহ্ পাক তখন তাঁকে মৃত্যুমুখে পতিত করলেন। তাঁর গর্ধভটিও মারা গেল। এভাবে সুদীর্ঘ একশত বছর অতিবাহিত হয়। এরই মধ্যে পৃথিবীতে অনেক পরিবর্তন ঘটে। আল্লাহ্ পাক হযরত ওজায়ের (আঃ)-কে পুনরায় জীবন দান করেন। তিনি দেখে বিস্মিত হলেন যে তাঁর নিকট যে খাদ্য-দ্রব্য ছিল তা সম্পূর্ণ অবিকৃত তথা সংরক্ষিত রয়েছে। তাঁর গর্ধভটি মরে পচে নিঃশেষ হয়ে গেছে।।[১]

অতঃপর আল্লাহ্ পাক তাঁকে জীবিত করলেন। সর্ব প্রথম রুহ্ তাঁর নয়ন যুগলে আসল, যেন তাঁর জীবিত হওয়া তিনি সচক্ষে দেখতে পান। যখন সারা শরীর প্রাণবন্ত হয় তখন আল্লাহ্ পাক ফেরেশতার মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করেনঃ

قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ

তুমি কতদিন এখানে রয়েছ? তিনি বললেনঃ আমিতো একদিন অথবা একদিনেরও কম সময় এখানে রয়েছি। তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ তুমি এখানে একশত বছর রয়েছ, তবু আল্লাহ্ পাকের বিস্ময়কর কুদরতের লীলা খেলা দেখ, তোমার আহার্য এবং পানীয় অবিকৃত রয়েছে, আর তোমার গর্ধভটির প্রতি লক্ষ্য কর। আমি যে তোমাকে মানুষের জন্যে একটি দৃষ্টান্ত বা নমুনা হিসেবে উত্থাপন করতে চাই। তুমি লক্ষ্য কর এ গর্ধভটির অস্থিগুলোকে আমি কিভাবে জড়িয়ে দেই এবং কিভাবে গোস্তের আবরণ দ্বারা তাকে আবৃত করি। আল্লাহ্ পাকের বিশেষ কুদরতে গর্ধভটি জীবিত হলো। আল্লাহ্ পাক কিভাবে কেয়ামতের দিন মানব জাতিকে পুনর্জীবন দান করবেন তা সচক্ষে দেখার পর হযরত ওজায়ের (আঃ) বললেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনি যখন ইচ্ছা এবং যা ইচ্ছা তা করতে পারেন।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা ১৩
তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা ৩৯-৪০

বিরাণ নগরে কে গমন করেছিলেন?

আলোচ্য আয়াতে একটি জন মানবহীন নগরের যে ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে সেই নগরে গমনকারী ব্যক্তি কে ছিলেন? এ সম্পর্কে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো তিনি ছিলেন হযরত ওজায়ের (আঃ)। তবে এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। হযরত আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন এই গমনকারী ব্যক্তি হলেন হযরত আরমিয়া (আঃ) আর বিখ্যাত সীরাত বেত্তা এবনে এসহাক লিখেছেন আরমিয়া (আঃ) ছিলেন মূলতঃ খিজির (আঃ)। কিন্তু হাকেম বর্ণনা করেছেন হযরত আলী (রাঃ) এবং এসহাক এবনে বসীর (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালামের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসেরও (রঃ) অভিমত এই যে, গমনকারী ব্যক্তি ছিলেন ওজায়ের (আঃ) আরমিয়া (আঃ) নন।[১]

এ সম্পর্কে ইমাম রাজী (রঃ) বলেছেন, বিরাণ জনপদে গমনকারী ব্যক্তি সম্পর্কে তফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মুজাহেদ (রঃ)-এর মতে এ ব্যক্তি ছিল শেষ বিচারের দিনের ব্যাপারে অবিশ্বাসী কাফের। মুতাজেলা ফেরকার লোকদেরও এ অভিমত আর অন্যদের মত হলো তিনি ছিলেন মুসলমান। কাতাদা, একরামা, যাহ্যাক এবং সাদীর মতে তিনি ছিলেন হযরত ওজায়ের (আঃ)। আর আতা হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের একটি মতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, তিনি ছিলেন আরমিয়া (আঃ)।[২]

আল্লাহর নাফরমানীর পরিণতি

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে একটি বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ করেছেন। বণী ইসরাঈল যখন আল্লাহর নাফরমানীতে মশগুল হলো, অন্যায় অনাচারে লিপ্ত হলো তখন আল্লাহ পাক তাঁর নবী আরমিয়ার (আঃ) নিকট ওহী প্রেরণ করলেন যে, বণী ইসরাঈল যদি অন্যায় অনাচার থেকে বিরত না হয় তবে আমি তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেব এবং তাদের অধিকাংশকে ধ্বংস করবো। তাদের উপর এক জালেম বাদশাহকে বসিয়ে দেব। আরমিয়া (আঃ) এই হুকুম শ্রবণ করে আল্লাহর পাকের দরবারে কান্নাকাটি করতে থাকলেন। অতঃপর আল্লাহ পাকের ওহী আসল যে পর্যন্ত তোমার সম্মতি না হবে সে পর্যন্ত তাদের ধ্বংস করবো না। এই ওহী দ্বারা নবী আরমিয়া (আঃ) অত্যন্ত খুশী হলেন। এরপর তিন বছর অতিবাহিত হলো কিন্তু বণী ইসরাঈলের জুলুম অত্যাচার, ঔদ্ধত্য, অপরাধ প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। এ সময় একজন ফেরেশতা মানব রূপ ধারণ করে হযরত আরমিয়া

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৯
২। তফসীরে কবীর খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৯
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২০

(আঃ)-এর নিকট আসেন এবং বলেনঃ হে আল্লাহর নবী! আমি আমার পরিবারবর্গ সম্পর্কে একটি মাসআলা জানতে চাই। আমি সর্বদা তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছি কিন্তু তারা এমন কাজে লিপ্ত হয় যা আমাকে ব্যথিত করে, এ অবস্থায় আমি কি করবো? তখন হযরত আরমিয়া (আঃ) বললেন, তুমি তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে থাক। তাদের সাথে সম্পর্ক বিনষ্ট করোনা এবং অবশেষে ভাল হবে এই সুসংবাদ গ্রহণ কর। এরপর ফেরেশতা বিদায় নিলেন। কিছুদিন পর সেই ফেরেশতা পুনরায় মানব রূপ ধারণ করে হাযির হলো এবং পূর্বের ন্যায় প্রশ্ন করলো এবং জবাবও তাকে সেভাবেই দেয়া হলো। কিছুদিন পরে বখত নসর বায়তুল মোকাদ্দাস ঘেরাও করলো, সেই সময় আরমিয়া (আঃ) বায়তুল মোকাদ্দাদের দেয়ালে উপবিষ্ট ছিলেন। আর বণী ইসরাঈলের বাদ্শাহ্ তাকে বলেছিলঃ আল্লাহ্ পাক আপনার সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তার কি হলো? কিন্তু হযরত আরমিয়ার (আঃ) অন্তরে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস এবং ভরসা বিদ্যমান ছিল। এজন্যে তিনি অত্যন্ত প্রফুল্ল ছিলেন। হঠাৎ সেই ফেরেশতা মানব রূপ ধারণ করে আবার হাযির হলো এবং নিজের পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো এবং বললঃ হে আল্লাহর নবী! এতদিন তারা যা করছিল আমি সবর করেছিলাম এখনতো তারা আল্লাহ্র নাফরমানীতে অত্যন্ত বেশী মশগুল হয়েছে এবং আমার ক্রোধ তাদের প্রতি বৃদ্ধি পেয়েছে। আপনি দয়া করে তাদের প্রতি বদ দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। একথা শ্রবণ করে হযরত আরমিয়া (আঃ) তাদের জন্যে বদ দোয়া করলেন এবং বললেনঃ হে আসমান যমীনের বাদশাহ! যদি তারা আপনার অসন্তুষ্টির কাজ করে তবে আপনি তাদেরকে ধ্বংস করে দিন। এরপর একটি বিদুৎ চমকে তাতে আগুন ধরে গেল। এভাবে তাদের জীবনে ধ্বংস নেমে আসল। আরমিয়া (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে আরযী পেশ করলেনঃ হে আমার প্রতিপালক! তোমার অঙ্গীকারের কি হলো? তখন আল্লাহ্ পাকের দরবার থেকে ঘোষণা করা হলো বণী ইসরাঈলের প্রতি যে আযাব এসেছে তাতো তোমার বদ দোয়ার কারণেই এসেছে। তখন আরমিয়া (আঃ) উপলব্ধি করলেন যে ব্যক্তি মানব রূপ ধারণ করে তাঁর নিকট আসতেন প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন ফেরেশতা। এরপর হযরত আরমিয়া (আঃ) জঙ্গল অভিমুখে গমন করলেন।[১]

এদিকে বখত নসর বায়তুল মোকাদ্দাস ধ্বংস করলো, বণী ইসরাঈলের লোকদেরকে হত্যা করলো, তাদের অনেককে বন্দী করে নিয়ে গেল। বখত নসর এ ধ্বংসযজ্ঞের পর রাজধানী বাবিল প্রত্যাবর্তন করলো। হযরত আরমিয়া (আঃ) একটি গাধার উপরে আরোহন করে বায়তুল মোকাদ্দাস আসলেন, তখন বায়তুল মোকাদ্দাস ছিল একটি জনমানব শুণ্য শহর। এই সময় তিনি বলেছিলেন-

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪০

أَنّٰى يُحْيِ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا

অর্থাৎঃ "আল্লাহ্ পাক কিভাবে এই জনপদটি ধ্বংসের পর তাকে পুনর্জীবিত করবেন"?

فَأَمَاتَهُ اللّٰهُ

এরপর আল্লাহ্ পাক তাঁকে মৃত্যু মুখে পতিত করলেন।

বায়তুল মোকাদ্দাস পুনরায় আবাদ হলো

مِائَةَ عَامٍ

আর এ অবস্থায় একশত বছর রইলেন। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, বায়তুল মোকাদ্দাস ধ্বংসের পর যখন সত্তর বছর অতিবাহিত হয় তখন পারস্য রাজা নওশেরের নিকট আল্লাহ্ পাক একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। সেই ফেরেশতা তাকে বলেঃ আল্লাহ্ পাক তোমাকে হুকুম দিচ্ছেন তুমি বায়তুল মোকাদ্দাস নতুন করে আবাদ কর। এ নির্দেশ মোতাবেক সে বায়তুল মোকাদ্দাসকে পুনরায় আবাদ করলো। এদিকে বখত নসরকে আল্লাহ্ পাক একটি মশক দ্বারা ধ্বংস করলেন যা তার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে তাকে দংশন করছিল। তখন বাবিল শহরে যত বণী ইসরাঈল বন্দী ছিল সকলেই মুক্তি পেল এবং সকলেই বায়তুল মোকাদ্দাসে প্রত্যাবর্তন করল। এরপর আরও ত্রিশ বছর অতিবাহিত হলো তখন বায়তুল মোকাদ্দাস নবরূপ ধারণ করে এবং নব জীবন লাভ করে।

ثُمَّ بَعَثَهُ

এরপর আল্লাহ্ পাক তাকে পুনঃজীবন দান করলেন এবং ফেরেশতার মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

قَالَ كَمْ لَبِثْتَ

(মৃত অবস্থায় তুমি কতদিন ছিলে?)

যেহেতু যখন তাঁর মৃত্যু হয় তখন ছিল সকাল আর যখন পুনঃজীবন লাভ করলেন তখন সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময় ছিল, তাই তিনি জবাব দিলেন-

قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ

অর্থাৎ একদিন বা তার চেয়ে কিছু কম সময়। তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেনঃ

قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ

অর্থাৎ তুমি একশত বছর এ অবস্থায় ছিলে।

তফসীরকারদের মধ্যে যাদের মতে বায়তুল মোকাদ্দাসে গমনকারী নবী ছিলেন হযরত ওজায়ের (আঃ) তারা এ সম্পর্কে আরও তথ্য উপস্থাপন করেছেন। হযরত ওজায়ের (আঃ) তখন অল্প বয়স্ক যুবক ছিলেন এবং তৌরাতের হাফেজ ছিলেন। পরহেযগারীতে অত্যন্ত উচ্চ মর্তবার অধিকারী ছিলেন। বখত নসর অন্যদের সঙ্গে তাঁকেও বন্দী করে নিয়ে যায় এবং তাঁর প্রতিও জুলুম অত্যাচার হতে থাকে। অতঃপর মুক্তিলাভ করে তিনি দেশে ফিরলেন এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের ধ্বংসস্তূপের অবস্থা দেখে বললেনঃ আল্লাহ পাক কিভাবে এই শহরকে পুনর্জীবন দান করবেন? তখন আল্লাহ পাক তাঁর কুদরতের বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত দেখাতে তাঁকে মৃত্যুমুখে পতিত করলেন।

হযরত ওজায়ের (আঃ)-এর স্ব-গৃহে প্রত্যাবর্তন

যখন হযরত ওজায়ের (আঃ)-কে একশত বছর পর পুনঃজীবন দান করলেন তখন তিনি পবিত্র কোরআন উল্লেখিত কথোপকথনের পর তাঁর মহল্লায় ফিরে এলেনঃ কিন্তু তাঁর পরিচিত কেউ সেখানে ছিল না শুধু একটি বাঁদী যে বখত নসরের ধ্বংসের সময় অল্প বয়স্কা ছিল, এখন বৃদ্ধা এবং অন্ধ ও পঙ্গু হয়ে পড়েছিল তাকে তিনি চিনলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এই ঘরটি কি ওজায়ের (আঃ)-এর? সে হ্যাঁ সূচক জবাব দিল এবং এই বলে ক্রন্দন করতে লাগল এখন ওজায়ের (আঃ) কোথায়? তাঁকে তো লোকেরা ভুলে গেছে। তিনি বললেনঃ আমিই তো ওজায়ের (আঃ)। এরপর সমস্ত ঘটনা তিনি বর্ণনা করলে বাঁদীটি বললঃ ওজায়ের (আঃ)-এর দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হতো এবং রুগ্ন বিপদগ্রস্ত মানুষের জন্যে তিনি উপকারী ছিলেন। আপনিই যদি ওজায়ের (আঃ) হন তবে আমার জন্যে দোয়া করুন, তিনি দোয়া করলেন। ফলে সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল, এরপর তিনি তার হাত ধরে বললেন, আল্লাহর হুকুমে দণ্ডায়মান হও। তখন সে দন্ডায়মান হতে পারল এবং পূর্ণ সুস্থ হলো এবং তাঁকে চিনতে পারলো এবং তৌরাত হেফজ হওয়ার কারণে লোকেরাও তাঁর পরিচয় পেল। কেননা সেই বাঁদীটি হযরত ওজায়ের (আঃ)-কে নিয়ে বণী ইসরাঈলের মজলিসে গেল এবং সাক্ষ্য দিল যে তিনিই ওজায়ের (আঃ)। তখন তৌরাত কারো কাছেই ছিল না, অথচ হযরত ওজায়ের (আঃ) তৌরাত মুখস্ত শুনিয়ে দিলেন, তখন তারা বিশ্বাস করলো তিনিই আল্লাহর নবী হযরত ওজায়ের (আঃ)।

মূলতঃ এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে কেয়ামতের দিন যে মানুষ মাত্রকে হাযির হতে হবে বিচারের জন্যে তা হাতে কলমে বুঝিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ্ পাকের একজন নবী তিনি হযরত ওজায়ের (আঃ) হন বা আরমিয়া (আঃ) হন তাঁকে মৃত্যুমুখে পতিত করে একশত বছর পর পুনঃজীবন দান করেছেন। তাঁর পানাহার সংরক্ষিত রয়েছে অথচ তাঁর গাধাটি পঁচে গলে শেষ হয়ে গেছে।

কেয়ামতের দিন পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে আল্লাহ্ পাক সকলকে কেয়ামতের দিন পুনরুত্থান করবেন। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্ পাক কোন জিনিসকে হেফাজত করতে চাইলে তা বিনষ্ট হয় না। পবিত্র কোরআন এ বিস্ময়কর দৃষ্টান্তটি উপস্থাপন করে বিশ্ব মানবকে হাশরের দিন পুনরুত্থানের ব্যাপারে সতর্ক করেছে। তৃতীয়ত ঃ পৃথিবীতে যখন কোন জাতি আল্লাহর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয় তখন আল্লাহ্ পাক তাদের শাস্তি বিধান করেন যেমন আলোচ্য ঘটনার বণী ইসরাঈলকে তাদের অন্যায় আচরণের জন্যে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। ব্যক্তি, সমাজ বা জাতি যে কেউ আল্লাহর বিধান অমান্য করবে হয়তো কিছু দিন আল্লাহ্ পাক তাদেরকে গাফলতের আবর্তে নিপতিত থাকার সুযোগ দিলেও পরে তাদেরকে পাকড়াও করেন। কিন্তু দুনিয়ার শাস্তিই শেষ নয়, বরং হাশরের দিন হবে বিচার, সৎ কাজের জন্যে পুরস্কার এবং মন্দ কাজের জন্যে শাস্তি হবে অবধারিত।

এতদ্ব্যতীত, আল্লাহ্ পাক সর্বশক্তিমান। তাঁর ক্ষমতা সর্বত্র বিরাজমান। তিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। অতএব, তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা এবং তাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য। এমনিভাবে এতে একথাও প্রমাণিত হচ্ছে যে মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষের এ জীবনের অবসান ঘটে বটে তবে তার পরিসমাপ্তি হয় না, বরং আল্লাহ্ পাক তাঁর ইচ্ছা মোতাবেক মানুষকে তাঁর দরবারে হাযির করবেন। আলোচ্য ঘটনা একথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى ۖ قَالَ أَوَلَمْ
تُؤْمِنْ ۖ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً
مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ
جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾

তরজমা

(২৬০) এবং যখন ইব্রাহীম (আঃ) বলেছিলেন হে আমার পালনকর্তা! তুমি কিভাবে মৃতকে জীবিত কর তা আমাকে দেখাও, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেন, তবে কি তুমি তা বিশ্বাস কর না? ইব্রাহীম (আঃ) বললেন হ্যাঁ অবশ্যই বিশ্বাস করি, তবে এজন্যে দেখতে চাই যেন আমার অন্তর শান্ত হয়। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেন, চারটি পক্ষী লও এবং তাদেরকে নিজের নিকট রাখ। অতঃপর পক্ষীর টুকরা কিছু অংশ প্রত্যেক পাহাড়ের উপর রেখে দাও, তৎপর তাদেরকে ডাক, তারা তোমার নিকট দৌড়ে চলে আসবে। এবং নিশ্চিত ভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত প্রতাপশালী ও মহাজ্ঞানী।

তফসীরুল কোরআন

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলেছিলেনঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখিয়ে দাও কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর।

তফসীরকারগণ এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যে কি কারণে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মনে এ প্রশ্ন উত্থিত হলো? হাসান (রঃ), কাতাদা (রঃ), আতা খোরাসানী (রঃ) এবং এবনে জরীর (রঃ) প্রমুখ তফসীরকার বলেছেন এর কারণ এই (১) একবার হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সমুদ্র তীরে একটি গাধার লাশ দেখলেন। যখন জোয়ার আসত তখন সামুদ্রিক জন্তুরা এসে ঐ লাশটি ভক্ষণ করত আর যখন ভাটা আসত তখন বন-জঙ্গলে অবস্থানকারী পশু পক্ষীরা সেই গাধার লাশটি ভক্ষণ করত। এ দৃশ্য দেখে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বিস্মিত হলেন এবং আল্লাহ্ পাকের দরবারে আরযী পেশ করলেন হে আমার প্রতিপালক! আমার এই আন্তরিক বিশ্বাস বা এলমুল একীন রয়েছে যে, তুমি এ মৃত জন্তুটির বিভিন্ন অংশকে একত্রিত করবে তবে তা কিভাবে করবে তা আমি সচক্ষে দেখতে চাই তথা চাক্ষুষ বিশ্বাস বা আইনুল একীন অর্জন করতে চাই।

(২) অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে নমরুদের সঙ্গে যখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিতর্ক হয় তখন সে দু' ব্যক্তিকে ডেকে এনে একজনকে হত্যা করে আর একজনকে মুক্তি দেয় এবং বলে আমি জীবিত রাখি এবং আমি মৃত্যু মুখে পতিত করি। তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলেছিলেনঃ আল্লাহ্ পাক মৃত্যুর পর জীবিত করবেন, তোমার পক্ষে সম্ভব হলে তুমিও তা কর। এর জবাবে নমরুদ বলেছিলঃ আল্লাহকে এভাবে জীবিত করতে তুমি কি দেখেছিলে? হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর জবাবে হ্যাঁ সূচক জবাব দিতে পারেননি, এজন্যেই আল্লাহ্ পাকের দরবারে উপরোক্ত প্রশ্ন করেছেন।

(৩) সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বর্ণনা করেছেন যখন আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে তাঁর বন্ধু বলে ঘোষণা করলেন তখন আল্লাহ পাকের হুকুমে আজরাঈল (আঃ) এসে তাঁকে এ সুসংবাদ দিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেন এ সুসংবাদের কোন আলামত বা নির্দশন আছে কি? ফেরেশতা বললেনঃ আছে, তা হলো আল্লাহ পাক আপনার দোয়া কবুল করবেন এবং আপনার প্রার্থনা মোতাবেত মৃতদেরকে জীবিত করবেন। তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এ প্রশ্ন করেছিলেনঃ হে প্রতিপালক! তুমি কিভাবে মৃতকে জীবিত কর আমাকে দেখাও। এ প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করলেন পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ এতে কি তোমার বিশ্বাস নেই?

قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ

ইব্রাহীম (আঃ) বললেনঃ নিশ্চয় আছে। তবে আমি চাই যেন মনের সান্ত্বনা লাভ করি এবং চাক্ষুষ বিশ্বাস অর্জন করি অথবা এর অর্থ হচ্ছে আমার মনে এই সান্ত্বনা আসুক যে তুমি আমাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছ এবং আমার দোয়া তুমি কবুল কর এজন্যে আমাকে দেখিয়ে দাও কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর এ প্রশ্নের আরও কয়েকটি কারণ বর্ণনা করেছেন ঃ

(৪) হয়তো হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর নিকট অবতীর্ণ সহীফার মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, তাঁর বংশধরদের মধ্যে ঈসা (আঃ) জন্ম গ্রহণ করবেন এবং আল্লাহ পাক তাঁকে মোযেজা দান করবেন যে তাঁর দোয়ার কারণে মৃত মানুষ জীবিত হবে। তাই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর দরবারে দোয়া করেছেনঃ হে আল্লাহ! কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর আমাকে দেখাও। আল্লাহ পাক তখন জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে ইব্রাহীম! তুমি কি এ কথায় বিশ্বাস কর না? তখন তিনি বলেছেন অবশ্যই বিশ্বাস করি। তবে মৃতকে জীবিত দেখলে আমার মনে সান্ত্বনা আসবে যে আমার বংশধর ঈসা (আঃ) থেকে আমার মর্তবা আদৌ কম নয়।

(৫) অথবা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রশ্নের ব্যাখ্যা হলো এই যে হে আল্লাহ! তুমি মৃত অন্তরকে কিভাবে জীবিত কর আমাকে দেখাও, কেননা হযরত ইব্রাহীম

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৮
তফসীরে রুহুল মাআনী, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৬
তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা- ৪৪-৪৫
খোলাসাতুত তাফাসীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২০৪

(আঃ) তাঁর অন্তরের প্রতি দৃষ্টিপাত করে লক্ষ্য করলেন যে তাঁর পুত্রের মায়ার কারণে তা যেন মৃত অবস্থায় আছে। তখন তিনি লজ্জিত হলেন এবং আল্লাহর পাকের দরবারে এ আরযী পেশ করলেন ঃ হে আল্লাহ! গাফলতের আবতে নিপতিত হয়ে মানব অন্তর যখন মৃত হয় তখন আল্লাহর জিকর দ্বারা কিভাবে তা জীবিত হয় তা আমাদের দেখিয়ে দাও।

(৬) অথবা এ প্রশ্নের ব্যাখ্যা হলো আল্লাহ্ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে তাঁর প্রাণাধিক পুত্রকে জবেহ্ করার আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি অনতিবিলম্বে সে আদেশ পালনে উদ্দত হয়েছিলেন। অতঃপর এ প্রশ্ন করেছিলেন হে আল্লাহ্! যে ছিল প্রাণবন্ত তাকে প্রাণহীন করার আদেশ দিয়েছ আমাকে, আমি সে আদেশ পালন করেছি এখন আমি আরযী পেশ করছি যে প্রাণহীন, তাকে তুমি কিভাবে প্রাণবন্ত করবে তা আমাকে দেখিয়ে দাও। তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেনঃ তুমি কি তাতে বিশ্বাস কর না? হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আরজ করলেনঃ অবশ্যই বিশ্বাস করি, তবে তুমি যে আমাকে বন্ধু হিসেবে ঘোষণা করেছ তার এ নিদর্শন দেখে আমি সান্ত্বনা পেতে চাই।

(৭) অথবা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর এ প্রশ্নের ব্যাখ্যা হলো আলোচ্য আয়াতে মৃতকে জীবিত করার কথাটা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মৃত অর্থ সে সব অন্তর সমূহ যা আল্লাহ্ পাকের নূরের তাজাল্লী থেকে বঞ্চিত আর জীবিত হওয়ার অর্থ অন্তরে আল্লাহর নূরের তাজাল্লী লাভ করা। অতএব, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এ প্রশ্ন করেছেন যে অন্তর তোমার নূরের তাজাল্লী থেকে বঞ্চিত তাকে কিভাবে তুমি তোমার নূর দ্বারা আলোকিত কর তা আমাকে দেখিয়ে দাও।

(৮) অথবা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর এ প্রশ্নের অর্থ এই হবে সমগ্র সৃষ্টি জগত কেয়ামতের দিন দেখতে পাবে কিভাবে মৃত মানুষ জীবিত হয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির হবে। হে আল্লাহ্! আমাকে মৃত মানুষের জীবিত হওয়ার দৃশ্য দুনিয়াতেই দেখিয়ে দাও। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেনঃ তুমি কি কেয়ামতের দিন একত্রিত হওয়ার কথা বিশ্বাস কর না? হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আরজ করলেনঃ হে আল্লাহ্! অবশ্যই বিশ্বাস করি তবে এ দুনিয়াতে ঐ দৃশ্য দেখলে তা হবে আমার বৈশিষ্ট্য এবং এ বৈশিষ্ট্যের কারণে আমার মর্যাদা উন্নীত হবে এবং আমার মন শান্তি লাভ করবে।[১]

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর একথার ব্যাখ্যায় আল্লামা আলুসী (রঃ) বলেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রশ্নে একথা প্রমাণিত হয় না (নাউজুবিল্লাহ্) মৃতকে জীবিত করায় আল্লাহ্ পাকের শক্তির ব্যাপারে তাঁর মনে কোন সন্দেহ ছিল; বরং তাঁর মনের কথা যেন এমন ছিল হে আল্লাহ্! তুমি সর্বশক্তিমান, তুমি মৃতকে জীবিত করতে পার, তবে কিভাবে কর তা একবার আমাকে দেখিয়ে দাও। অতএব, মৃতকে

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৯

জীবিত করার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন নয়; বরং প্রশ্ন হলো জীবিত করার পদ্ধতির ব্যাপারে।[১]

قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেন (যখন তুমি মনে সান্ত্বনার জন্যে সচক্ষে মৃতকে জীবিত করার দৃশ্য দেখতে চাও তাহলে) চারটি পাখি ধরে আন এবং সেগুলোকে নিজের কাছে এমনভাবে লালন পালন কর যেন তারা তোমার পোষ্য এবং তুমি যখনই ডাক তখনই তোমার ডাকে তারা হাযির হয় এবং তুমিও তাদেরকে চিনতে পার। এরপর পাখিগুলোকে জবেহ্ কর এবং প্রত্যেকটি পাখির হাড় মাংস প্রভৃতি একত্রিত কর, এরপর সেগুলোকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত কর এবং নিজের ইচ্ছামত বিভিন্ন পাহাড়ে এক একটি ভাগ রেখে দাও, তৎপর তুমি এদেরকে ডাক তখন ঐ পাখিগুলো আল্লাহ্ পাকের বিশেষ কুদরতে জীবিত হবে এবং তোমার নিকট দৌড়ে আসবে।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্ পাকের এই নির্দেশ লাভ করে একটি ময়ূর, একটি মোরগ, একটি কাক, একটি কবুতর এক কথায় এই চারটি প্রাণী ধরে আনেন এবং নির্দেশ মোতাবেক চারটিকে জবেহ্ করে একটি পাহাড়ে চারটি মাথা, অন্য একটি পাহাড়ে তাদের পা, অপর এক পাহাড়ে তাদের ধর রেখে আসলেন এবং ঐ সমস্ত পাহাড়ের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হয়ে পাখিগুলোকে ডাকলেন এবং একটি একটি করে অঙ্গ ছুটে আসে এবং একটির সাথে আরেকটি একত্রিত হয়। এভাবে প্রত্যেকটি জীবিত হয়ে তাঁর নিকট চলে আসে। প্রত্যেকটি পাখির প্রতিটি রক্তবিন্দু একটি আরেকটির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে এবং প্রতিটি হাড় পরস্পর একত্রিত হয়ে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সম্মুখে মস্তক ব্যতীত একটি দেহে পরিণত হয় এবং এরপর দেহটি নিজ নিজ মস্তকের সঙ্গে মিলিত হয় আর এভাবে প্রত্যেকটি প্রাণী পুনঃজীবন লাভ করে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে এ প্রক্রিয়াটি ছিল অত্যন্ত অভিনব, বিস্ময়কর, অস্বাভাবিক কিন্তু আল্লাহ্ পাকের নিকট কোন কিছুই যে অসম্ভব নয়। তাঁর জন্যে সবই সহজ সম্ভব, কেননা তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি মহাজ্ঞানী। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

এবং নিশ্চিত ভাবে জেনে রাখ যে আল্লাহ্ পাক মহা পরাক্রমশালী, তাঁর ইচ্ছাকে কোন কিছু বাধা দিতে পারে না। তাঁর প্রতিটি কাজ হেকমতপূর্ণ, তাঁর হেকমত বা কৌশল বোঝার ক্ষমতাও কারো নাই। তিনি মৃতকে জীবিত করতে পারেন।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৬

জীবিতকে মৃত্যুমুখে পতিত করতে পারেন। তাঁর কুদরত হেকমত অনন্ত অসীম। অতএব, তাঁর পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন হযরত ওজায়ের (আঃ) বা আরমিয়া (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনার পর আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

"জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান"। আর হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনার পর আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

নিশ্চয় আল্লাহ পাক পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে হযরত ওজায়ের (আঃ) বা আরমিয়া (আঃ)-এর বক্তব্য ছিল বিস্ময় প্রকাশের জন্যে আর বিস্ময় ছিল একথার উপর যে মৃত্যুর পর মানুষকে জীবিত করা অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার। আর হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বক্তব্যের ভিত্তি ছিল এ আকাঙ্খার উপর যে, আল্লাহ্ পাক কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন তা সচক্ষে দেখা।

ইমাম বয়জাবী (রঃ) লিখেছেন, একশত বছর মৃত অবস্থায় রাখার পর আল্লাহ্ পাক হযরত ওজায়ের (আঃ)-এর আকাঙ্খা পূর্ণ করেছেন আর হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর আকাঙ্খা পূর্ণ করেছেন সঙ্গে সঙ্গে। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) উচ্চতর মর্তবার অধিকারী ছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ এতে একথাও প্রমাণিত হয় যে, আদব এবং বিনয়ের সঙ্গে যে দোয়া করা হয় তাতে বরকত থাকে অর্থাৎ হযরত ওজায়ের (আঃ)-এর কথায় শুধু বিস্ময় প্রকাশ হয়েছিল আর হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কথায় বিনীত আকাঙ্খা এবং ব্যাকুল হিয়ার চাওয়া ছিল সেই চাওয়া বা দোয়ার বরকতেই অনতিবিলম্বে আল্লাহ্ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর আকাঙ্খা পূণ করেছেন। আর হযরত ওজায়ের (আঃ)-এর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে একশত বছর মৃত অবস্থায় থাকার পর।[১]

এ ঘটনায় আল্লাহ্ পাক মানব জাতির পুর্নজীবন লাভের এমনি একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন যার ব্যাপারে পৌত্তলিকরা সন্দিহান ছিল। কেননা মৃত্যুর পর মানুষতো মাটির সাথে মিশে যায় শুধু তাই নয়; বরং এ মাটি বাতাসের সঙ্গে কত নাম না জানা অগণিত স্থানে উড়ে যায়। এতদ্ব্যতীত কখনও পানির সাথে মিশে যায় তার খবর রাখা কারো পক্ষেই সম্ভব হয় না। এমনি অবস্থায় এসব কিছুকে একত্রিত করে

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৫১

মানব জাতিকে কিভাবে হাশরের ময়দানে হাযির করা হবে- এ প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব রয়েছে আলোচ্য ঘটনায়।

বস্তুতঃ যিনি কোন প্রকার নমুনা ব্যতীত সৃষ্টি করেছেন মানব জাতিকে যিনি লালন-পালন করছেন তাদেরকে, যাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করছে সমগ্র মানব জাতি, যিনি সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান তাঁর পক্ষে সমগ্র মানব জাতিকে শেষ বিচারের দিনে হাযির করা আদৌ কঠিন কাজ নয়। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রযাত্রার এ যুগে একথা আরও সুস্পষ্ট প্রতিভাত এবং দেদীপ্যমান।

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ
وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦١﴾ اَلَّذِيْنَ
يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا
مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٦٢﴾ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ
يَّتْبَعُهَآ اَذًى ؕ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ﴿٢٦٣﴾

তরজমা

(২৬১) যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর রাহে ব্যয় করে তাদের দৃষ্টান্ত একটি শস্যবীজ, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেকটি শীষে একশত দানা থাকে এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে বহু গুণ দিয়ে থাকেন। আল্লাহ্ পাক উদার দাতা, তিনি মহাজ্ঞানী।

(২৬২) যারা আল্লাহর পথে নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর অনুগ্রহ প্রকাশ করেনা ও দানের বদলে কষ্ট দেয় না তাদের পালনকর্তার নিকট রয়েছে পুরস্কার, তাদের কোন ভয় নাই, আর তারা চিন্তিতও হবে না।

(২৬৩) যে দানের পেছনে থাকে ক্লেশ তা থেকে মিষ্টি কথা ও ক্ষমা অতি উত্তম, আর আল্লাহ পাক সর্ব প্রকার অভাব থেকে মুক্ত, তিনি পরম সহনশীল।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম ক্ষমতার বিবরণ ছিল এবং এ বিবরণ দ্বারা আখেরাত বা চিরস্থায়ী জিন্দেগীর কথা এবং হাশরের ময়দানে মানব জাতির পুনরুত্থানের কথা বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে পাথেয় সংগ্রহ করার তাগিদ রয়েছে।[১] আখেরাতের পথ সুদীর্ঘ, কন্টকাকীর্ণ, বিপজ্জনক। এ কন্টকাকীর্ণ পথের জন্যে একটি পাথেয় হলো আল্লাহর রাহে দান তা জেহাদের জন্যেও হতে পারে, হজ্জের জন্যেও হতে পারে অথবা সাধারণ দানও হতে পারে। এর গুরুত্ব ও মাহাত্ম বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

ইতোপূর্বে হযরত ওজায়ের (আঃ) এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তা দ্বারা হাশরের দিন মানব জাতির পুনরুত্থানের কথা প্রমাণিত হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে এমনি বিষয়ের নির্দেশ রয়েছে যা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে মানুষের জন্যে অত্যন্ত উপকারী হবে আর তাহলো আল্লাহর রাহে দান খয়রাত করা।[২]

বস্তুত পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে পরকালীন জিন্দেগী সম্পর্কে এলম বা জ্ঞান অর্জনের ও পরকাল সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের লক্ষ্যে দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে যা করণীয় তার বিবরণ রয়েছে। তন্মধ্যে বিশেষভাবে আল্লাহর রাহে দানের প্রতি তাগিদ করা হয়েছে।[৩]

আল্লাহর পথে দানের সওয়াব অপরিসীম

এরশাদ হয়েছে- "আল্লাহর পথে যারা (আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার মহান উদ্দেশ্যে) দান করে তাদের প্রতিদান অনেক"। তার একটি দৃষ্টান্ত আলোচ্য আয়াতে উপস্থাপিত হয়েছে। যেভাবে জমিনে একটি শস্য দানা বপন করা হয়, তাতে সাতটি শীষ উৎপন্ন হয়, আর প্রত্যেকটি শীষে একশত করে দানা থাকে। এভাবে একটি শস্য দানা থেকে সাতশত দানার জন্ম হয় এমনিভাবে আল্লাহর রাহে সামান্য দানের প্রতিদান বা বিনিময়ও অনেক বেশী তা শত শত গুণ হতে পারে, তার চেয়ে বেশীও হতে পারে, কেননা আল্লাহ পাক মহান দাতা, তাঁর দান অনন্ত অসীম, তাঁর বদান্যতার কোন সীমা নেই।

১। তফসীরে হক্কানী খন্ড-১, পারা-২, পৃষ্ঠা-১১
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২২
৩। তফসীরে কবীর খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৩

কোন কোন তফসীরকার আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর পথের তাৎপর্য সম্পর্কে বলেছেন, তা হলো আল্লাহর রাহে জেহাদ। আর হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন এর তাৎপর্য হলো হজ্জ এবং জেহাদ।

হযরত এমরান এবনে হোসায়েন (রাঃ) থেকে বর্ণিত একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন– "যে ব্যক্তি জেহাদের জন্যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে আর নিজে বাড়িতে অবস্থান করে তার প্রত্যেকটি দেরহামের বিনিময়ে সাতশত দেরহামের সওয়াব পাবে আর যে অর্থ সম্পদ ব্যয় করে এবং নিজেও জেহাদে শরীক হয় তার প্রত্যেকটি দেরহামের বিনিময়ে সাত হাজার দেরহামের সওয়াব প্রদান করা হয়"। অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তেলাওয়াত করেন।

আর নাফে হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যখন আয়াতটি নাযিল হলো

مَنْ ذَاالَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ

তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরজ করলেন ঃ হে আল্লাহ! আমার উম্মতের জন্যে বিনিময় আরও বৃদ্ধি কর, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

মসনদে আহমদে সংকলিত একখানি হাদীসে রয়েছে এক ব্যক্তি আল্লাহর রাহে একটি উষ্ট্রী দান করলেন, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ এ ব্যক্তি কেয়ামতের দিন সাতশত উষ্ট্রী পাবে। মসনদে আহমদে সংকলিত অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আদম সন্তানকে আল্লাহ্ পাক একটি নেকীর বদলে দশটি নেকী দান করেন। আর সে নেকী বৃদ্ধি হতে হতে সাতশত পর্যন্ত পৌঁছে কিন্তু "রোজা" তা শুধু আমারই জন্যে আমি নিজেই তার বিনিময় দান করবো।

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الاية

(যারা আল্লাহর রাহে দান করে)

শানে নুযুল

এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত ওসমান (রাঃ) এবং হযরত আবদুর রহমান এবনে আওফ (রাঃ)-এর ব্যাপারে। হযরত ওসমান (রাঃ) তাবুকের যুদ্ধের সময় এক সহস্র উষ্ট্র প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র সহ আল্লাহ্ রাহে দান করেছিলেন। অন্য একটি

১। খোলাসাতুত তাফাসীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২০৬

বর্ণনায় রয়েছে হযরত ওসমান (রাঃ) তখন নগদ এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রাও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করেছিলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বর্ণনা করেন আমি সচক্ষে দেখেছি যে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দু' হাত তুলে হযরত ওসমান (রাঃ)-কে দোয়া করছেন এই বলে "হে পরওয়ারদেগার! আমি ওসমান এবনে আফ্ফানের প্রতি সন্তুষ্টি হয়েছি, তুমিও তার প্রতি সন্তুষ্ট হও"। আর হযরত আবদুর রহমান এবনে আওফ (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে চার হাজার দেরহাম পেশ করে আরজ করলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমার নিকট আট হাজার দেরহাম ছিল তন্মধ্যে চার হাজার দেরহাম আমি আমার সন্তান-সন্ততির জন্যে রেখে এসেছি আর চার হাজার আমার পরওয়ারদেগারকে কর্জ দেয়ার উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম তখন এরশাদ করলেন, "যে দেরহাম গুলো তুমি তোমার কাছে রেখেছ আর যা কিছু আল্লাহর রাহে দান করতে নিয়ে এসেছ সব গুলোতে আল্লাহ্ পাক রবকত দান করুন"। তখন এ আয়াতে নাযিল হয়।[১]

এ আয়াতের মর্মবাণী হচ্ছে এই, যারা আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ দান করে আর যাকে দান করে তার প্রতি মৌখিক অনুগ্রহ প্রকাশ করেনা এবং তাকে অবজ্ঞা করে বা তাকে বেগার খাটিয়ে বা কোন প্রকার কষ্টদায়ক কথা বলে তাকে যন্ত্রণা দেয় না তাদের জন্যে রয়েছে পরিপূর্ণ সওয়াব। তাদের সওয়াব কম হওয়ার কোন ভয় নেই আর তারা চিন্তিতও হবে না।

মূলতঃ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই দান করতে হবে। যাকে দান করা হলো তার প্রতি কোন প্রকার অনুগ্রহ প্রকাশ করা যাবে না। দানের কারণে তাকে কোন প্রকার খাটানো বৈধ হবে না, তাকে কোন প্রকার কষ্ট দেয়া যাবে না, কেননা এমন অবস্থায় দানের মাহাত্ম বিনষ্ট হবে, ব্যর্থ হবে তার উদ্দেশ্য বরং যে দান গ্রহণ করল তার প্রতি এজন্যে কৃতজ্ঞ থাকতে হবে যে সে দান গ্রহণ করে আমার বোঝা হালকা করেছে এবং আমাকে আমার কর্তব্য পালনে সাহায্য করেছে। যারা মনের এ ভাব নিয়ে আল্লাহর রাহে দান করে আল্লাহ পাক তাদের দানের হেফাজত করেন এবং তাদেরকে অশেষ সওয়াব দান করেন।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৫
তফসীরে কবীর খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৫
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৩
তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৫২
খোলাসাতুত তাফাসীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২০৬
তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস (রাঃ) পৃষ্ঠা-৩৮

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ

অর্থাৎ সাহায্য প্রার্থীকে বিনম্র ভাষায় উত্তর দেয়া মধুর ব্যবহার করে তাকে বিদায় করা অতি উত্তম। সেই দানের চেয়ে যে দানের পর দাতা গ্রহীতার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে অথবা তাকে খোটা দিয়ে লজ্জিত করে। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহারই মূল লক্ষ্য আর এই ভাল ব্যবহার দান খয়রাতের মাধ্যমেও হতে পারে তবে তার জন্যে পূর্ব শর্ত হলো দাতা গ্রহীতার প্রতি কোন প্রকার অনুগ্রহ প্রকাশ করবে না এবং তাকে কোন ভাবেই কষ্ট দেবে না।

وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ

আল্লাহ্ পাক কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ তোমাদেরই উপকারার্থে ব্যয় করান, তোমাদের দানের মাধ্যমে তোমরা নিজেরাই উপকৃত হবে। যারা দানের পর গ্রহীতাকে কষ্ট দেয় বা অনুগ্রহ প্রকাশ করে এমন লোকদের দানের কোন প্রয়োজন নেই। আর আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত সহনশীল এজন্যেই তো অন্যায়কারীকে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি দেন না। তওবার সুযোগ দান করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে তিনি ক্ষমা করেন।

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দানের শুভ পরিণতি

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক সেসব লোকদের পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সাফল্যের সুসংবাদ দিয়েছেন যারা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দান করে এবং গ্রহীতার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেনা এবং তাকে কোন প্রকার কষ্ট দেয় না কেয়ামতের দিন তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হবে না, কোন দুঃখ তাদেরকে স্পর্শও করবে না। এটিই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দান করার শুভ পরিণতি।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا
تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ
رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ
صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ۭ لَا يَقْدِرُوْنَ
عَلٰي شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٦٤﴾

তরজমা

(২৬৪) হে মোমেনগণ! অনুগ্রহ প্রকাশ করে, কষ্ট দিয়ে তোমাদের দান খয়রাতকে বিনষ্ট করোনা, সে ব্যক্তির ন্যায় যে লোক দেখানোর জন্যে দান খয়রাত করে এবং আল্লাহ্ পাক ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করেনা। তার দৃষ্টান্ত সেই পরিচ্ছন্ন পাথরের ন্যায় যার উপর থাকে কিছু মাটি, এরপর হয় তাতে মুষলধারে বৃষ্টি তখন তাকে একেবারে পরিষ্কার করে রাখে। তারা যা কিছু উপার্জন করেছে তা দ্বারা কোন কিছুই তারা করতে সক্ষম হয় না (তথা তাদের কোন উর্পাজনের সওয়াবই তারা লাভ করতে পারেনা এবং আল্লাহ্ পাক এমন কাফের সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না)।

তফসীরুল কোরআন

দানের পর দাতা যদি গ্রহীতাকে কোন প্রকার কষ্ট দেয় বা তার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে তবে দানের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়, দানের সওয়াব বিনষ্ট হয়। তাই এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক মোমেনদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন, তোমরা তোমাদের দান খয়রাতের সওয়াবকে বিনষ্ট করোনা গ্রহীতার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে ও তাকে নির্যাতনের মাধ্যমে। মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে তিন প্রকার লোকের সঙ্গে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক কথাবার্তা বলবেন না। তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে দেখবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এরা হলো-

(১) যে দাতা গ্রহীতার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে,

(২) যে অহংকার করে এমনভাবে পোষাক পরিধান করে যে তা টাখনুর নিম্নদেশে চলে যায় এবং

(৩) যে মিথ্যা শপথ করে পণ্য বিক্রি করে।

এবনে মাজা শরীফে সংকলিত রয়েছেঃ

(১) যে সন্তান পিতা-মাতার অবাধ্য,

(২) যে দাতা গ্রহীতার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে,

(৩) মদ্যপায়ী এবং তকদীরকে মিথ্যা জ্ঞানকারী, এরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। নাসায়ী শরীফে রয়েছে তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্ পাক রহমতের দৃষ্টিতে দেখবেন না-

(১) পিতা মাতার অবাধ্য সন্তান,

(২) মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি।

(৩) যে দাতা গ্রহীতার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে।

মূলতঃ এজন্যেই আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে তাগিদ করা হয়েছে যেন গ্রহীতার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ বা তাকে নির্যাতন করে দানের সওয়াব বিনষ্ট না করা হয়।[১]

যারা এমন অন্যায় কাজ করে তাদের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে পরবর্তী বাক্যে—

كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَا لَهٗ رِئَاۤءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

অর্থাৎ তাদের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির ন্যায় যে দান খয়রাত করে লোক দেখানোর জন্যে, লোকে তাকে দানবীর বলবে শুধু এজন্যে সে দান করে। আল্লাহর প্রতি তার ঈমান নেই, আখেরাতের প্রতিও সে বিশ্বাসী নয়। অতএব, লোক দেখানোর জন্যে যে দান খয়রাত করা হয় তা যেমন বাতিল হয়ে যায় তেমনি গ্রহীতার প্রতি দাতা যদি অনুগ্রহ প্রকাশ করে অথবা তাকে নির্যাতন করে তবে সেই দান খয়রাতের সওয়াবও বিনষ্ট হয়ে যায়।

فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ

যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান করে তাদের একটি দৃষ্টান্ত এ বাক্যে উপস্থাপিত হয়েছে যেমন একটি পাথর তার উপর সামান্য মাটি দেখা যাচ্ছিল। কোন ব্যক্তি সেই পাথরের উপর বীজ বপন করেছে এরপর মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়েছে। ফলে পাথরটি ধুয়ে মুছে পরিস্কার হয়ে গেছে। এমন অবস্থায় বপনকারীর বীজের যেমন কোন ভবিষ্যত থাকেনা ঠিক তেমনি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে যে দান সদকা করা হয় তারও কোন সওয়াব পাওয়া যায় না। উক্ত পাথরে বীজ বপন করা সত্ত্বেও যেমন ফসলের আশা করা যায় না ঠিক তেমনি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান খয়রাত করেও কোন প্রকার সওয়াব বা শুভ পরিণতির আশা করা যায় না।

হযরত জুন্দব (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্যে তথা আত্ম প্রচারের জন্যে কোন আমল করে আল্লাহ পাক তার আমলকে তার আত্ম প্রচারের জন্যেই নির্দিষ্ট করেন। আর যে লোক দেখানোর জন্যে কাজ করে আল্লাহ পাক তার কাজকে লোক দেখানোর জন্যেই নির্দিষ্ট রাখেন। (বোখারী মুসলিম)

হযরত আবু সাঈদ এবনে আবু ফোজালা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ যখন আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন অর্থাৎ সেদিন যেদিনের আগমন অবধারিত, সমগ্র মানব জাতিকে একত্রিত করবেন সেদিন একথা ঘোষণা করা হবে যে ব্যক্তি কোন কাজ আল্লাহর জন্যে করেছে আর তাতে অন্য কিছুকে আল্লাহ পাকের সাথে শরীক করেছে সে যেন

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৬

উক্ত শরীক থেকে নিজের সওয়াব চেয়ে নেয়। আল্লাহ্ পাক শেরকের উপর সর্বাধিক অসন্তুষ্ট। (আহমদ)

হযরত মাহমুদ এবনে লবিদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের ব্যাপারে আমার সবচেয়ে ভয় ছোট শেরকের। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! ছোট শেরক কি? তিনি এরশাদ করলেনঃ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কাজ করা। (আহমদ)

বায়হাকী আলোচ্য হাদীসে এ বাক্যটি সংযোজন করেছেনঃ

কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করবেনঃ তাদের নিকট যাও, যাদেরকে দুনিয়াতে তোমাদের আমল দেখাতে তারা তোমাদেরকে কর্মফল দেয় কি-না তা দেখ।

শাদ্দাদ এবনে আওস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি শ্রবণ করেছি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে শেরক এবং কুপ্রবৃত্তির তাড়নার ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। আমি আরজ করলামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার উম্মত কি আপনার পর শেরক করবে?

তিনি এরশাদ করলেনঃ এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তারা চন্দ্র সূর্য বা পাথর ও মূর্তির পূজা করবে না, তবে তারা লোক দেখানোর জন্যে কাজ করবে।

আর কুপ্রবৃত্তির তাড়না যেমন সকালে লোকেরা রোজা রাখবে, পরে কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় রোজা বিনষ্ট করবে। (আহমদ)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম একজন শহীদ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হবে। তাকে আল্লাহ্ পাকের দরবারে উপস্থিত করা হলে আল্লাহ্ পাক তাকে বলবেনঃ তোমাকে আমি অমুক অমুক নেয়ামত দান করেছিলাম। সে ঐ সমস্ত নেয়ামত প্রাপ্তির কথা স্বীকার করবে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক জিজ্ঞাসা করবেনঃ তুমি আমার সে সমস্ত নেয়ামত সম্পর্কে কি করেছ?

সে আরজ করবেঃ আমি তোমার পথে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেছি।

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেনঃ তুমি মিথ্যা কথা বলেছ, কেননা তুমি তো শুধু এজন্যে লড়াই করেছ যেন পৃথিবীতে তোমাকে বীর পুরুষ বলা হয় আর তা বলা হয়েছে। অতঃপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

এরপর এমন এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ পাকের দরবারে উপস্থিত করা হবে যে জ্ঞান অর্জন করেছে এবং অন্যকেও শিক্ষা দিয়েছে এবং পবিত্র কোরআনও পাঠ করেছে। তাকে আল্লাহ্ পাক সে সব নেয়ামতের কথা জিজ্ঞাসা করবেন যা দুনিয়াতে সে লাভ

করেছে। সে আল্লাহ্ পাকের সমস্ত নেয়ামতের কথা স্বীকার করবে। তখন আল্লাহ্ পাক জিজ্ঞাসা করবেন তুমি ঐ সমস্ত নেয়ামতের কি করেছ? সে আরজ করবে আমি জ্ঞান অর্জন করেছি এবং মানুষকে শিক্ষাও দিয়েছি তথা নিজে এলম হাসিল করে অন্যের মধ্যে এলম বিতরণ করেছি। আর তোমার সন্তুষ্টির জন্যে পবিত্র কোরআন পাঠ করেছি। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেনঃ তুমি মিথ্যা বলেছ, কেননা তুমি এজন্যে এলম হাসিল করেছিলে যেন দুনিয়ার মানুষ তোমাকে আলেম বলে। তুমি এজন্যে পবিত্র কোরআন পাঠ করেছিলে যেন তোমাকে ক্বারী বলা হয়। আর তা বলা হয়েছে। অতঃপর তাকে আল্লাহর হুকুমে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

অতঃপর এমন এক ব্যক্তিকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হবে, তাকে আল্লাহ্ পাক দুনিয়াতে অনেক ধন-সম্পদ দান করেছিলেন। আল্লাহ্ পাক তাকে সেই নেয়ামত সমূহের কথা স্মরণ করাবেন। সে সে সব নেয়ামতের কথা স্বীকার করবে। তখন আল্লাহ্ পাক তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, এ নেয়ামত সমূহের তুমি কি করেছ? সে বলবে আমি তোমার পছন্দনীয় পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেছি। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেনঃ তুমি মিথ্যা কথা বলেছ, কেননা তুমি অর্থ-সম্পদ এজন্যে দান করেছ যেন মানুষ তোমাকে দানবীর বলে আর তা বলা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহর হুকুমে তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসনাদে শরীফ)

আল্লামা বগভী (রহঃ) এই হাদীস বর্ণনা করার পর হযরত আবু হোরায়রা (রঃ)-এর একথাটি সংযোজন করেছেন, অতঃপর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার হাঁটুর উপর স্বীয় দস্তে মোবারক দ্বারা আঘাত করে এরশাদ করেছেনঃ "হে আবু হোরায়রা! আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম এ তিন ব্যক্তিই দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে তথা এরাই হবে সর্বপ্রথম দোযখের ইন্ধন"।[১]

নাজাতের জন্য এখলাসই পূর্ব শর্ত

এতে একথা প্রমাণিত হয়, যে কোন সৎ কাজ আল্লাহ্ পাকের দরবারে কবুল হওয়ার জন্যে এখলাস পূর্বশর্ত। অর্থাৎ কাজটি অবশ্যই শুধু এবং শুধু এক আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হতে হবে। এর মধ্যে কণা মাত্রও অন্য কোন উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না, এ অবস্থাটিকেই ইসলামী পরিভাষায় এখলাস হয়। রণাঙ্গণে প্রাণ উৎসর্গ করা হলেও তা আল্লাহ্ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য হয় না যদি প্রাণ উৎসর্গকারীর অন্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ব্যতীত কোন উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে। আর আল্লাহ্ পাক মানব অন্তরের সকল গোপন কথা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। কথাটিকে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা আরও সুস্পষ্টভাবে আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। হযরত আলী (রাঃ) একবার একজন কাফেরের সঙ্গে যুদ্ধরত হলেন। অনেকক্ষণ পর তিনি সেই

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা ৫৬

কাফেরকে কাবু করে ফেললেন এবং তার বুকের উপর বসে পড়লেন এবং তার শিরোচ্ছেদের ইচ্ছা করলেন। এমন সময় সে হযরত আলীর (রাঃ) মুখমণ্ডলে থুথু দিল। সঙ্গে সঙ্গে হযরত আলী (রাঃ) তাকে মুক্তি দিলেন। লোকটি হতবাক হলো এবং জিজ্ঞাসা করলো, এ পর্যন্ত আপনি আমার সঙ্গে যুদ্ধরত রইলেন, অবশেষে আমাকে পরাজিত করার পর এভাবে কেন ছেড়ে দিচ্ছেন? হযরত আলী (রাঃ) বললেনঃ এ পর্যন্ত তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করেছি এক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কিন্তু যখন তুমি আমার মুখে থুথু দিয়েছ তখন তোমার প্রতি আমার ব্যক্তিগত আক্রোশ এসে গেছে। এমন অবস্থায় যদি আমি তোমার প্রাণ নাশ করি তা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে হতো না। আমার ব্যক্তিগত ক্রোধ চরিতার্থ করার জন্যে হতো যা আমি চাই না।

বস্তুতঃ এটিই হলো এখলাস। অর্থাৎ শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করা। তাই আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, লোক দেখানোর জন্যে যদি দান করা হয় তবে তা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে গ্রহণযোগ্য হয় না। এমনিভাবে দান করার পর গ্রহীতার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করলে অথবা কোনভাবে তাকে কষ্ট দিলেও দানের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়, উদ্দেশ্যে হয় ব্যর্থ, আর সে দান বাতিল বলে বিবেচিত হয়। অতএব, আল্লাহ পাকের রাহে দান খয়রাত করতে হবে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আর দানের সওয়াবের হেফাজত করতে হবে গ্রহীতার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ না করে এবং কথায় কাজে তাকে কোন প্রকার কষ্ট না দিয়ে। অন্যথায় দান বাতিল বলে গণ্য হবে। মূলতঃ আলোচ্য আয়াতে যে দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে তার মর্মকথা হলো এই, যদি যমীন ঠিক থাকে অর্থাৎ অন্তরে যদি এখলাস থাকে তকে যতটুকু আমলই করা হোক তা বরকতময় এবং ফলপ্রসূ হবে, পক্ষান্তরে যদি যমীনই ঠিক না থাকে অর্থাৎ অন্তরে যদি এখলাস না থাকে তবে লোক দেখানোর জন্যে যত দান খয়রাতই করা হোক তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, কেননা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এবাদত কবুল হওয়ার জন্যে এখলাস পূর্ব শর্ত। যে কোন এবাদতই হোক না কেন যদি তাতে লোক দেখানোর প্রবণতা থাকে তবে আল্লাহ পাকের দরবারে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের কথা বলা যেতে পারে। যদি পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াতকারী এ উদ্দেশ্যে তেলাওয়াত করে যে মানুষ তেলাওয়াত শ্রবণ করে তার প্রশংসা করবে, তবে এটি রিয়াকারী হবে কিন্তু এর মধ্যেও কথা রয়েছে। একবার হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) হরম শরীফে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করছিলেন। এমন সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেখানে আগমন করলেন। কিন্তু আবু মূসা

আশআরী (রাঃ) তা জানতে পারেননি। তেলাওয়াত শেষ হওয়ার পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আবু মূসা! তুমি অত্যন্ত সুন্দরভাবে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করেছ, তখন হযরত মূসা আশআরী (রাঃ) বললেন- যদি আমি জানতাম যে আপনি শ্রবণ করছেন তবে আরও সুন্দরভাবে তেলাওয়াত করতাম। এখানে হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করার মাধ্যমে, তবে এতে রিয়াকারী নেই। কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সন্তুষ্ট করা মূলতঃ আল্লাহ পাককেই সন্তুষ্ট করা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সন্তুষ্ট করা এবাদতের অন্তর্ভুক্ত। তাই হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) এ আকাঙ্খা পেশ করেছেন।

হাকীমুল উম্মত হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ) বলেছেনঃ যদি কোন ক্বারী শুধু এতটুকু চিন্তা করে যে শ্রোতারা তেলাওয়াত করে সন্তুষ্ট হবে তবে তা এবাদতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, কেননা কোন মোমেনকে সন্তুষ্ট করাও এবাদতের শামিল। কিন্তু ক্বারী যদি এর চেয়ে বাড়তি কিছু আকাঙ্খা করে তথা শ্রোতাগণ সন্তুষ্ট হলে তাদের নিকট থেকে সম্মান ও সম্পদ লাভ করা যাবে, এমন অবস্থায় তা দুনিয়ার মহব্বতে পরিণত হবে, এবাদত থাকবে না।

এ পর্যায়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। শাহ এসহাক (রঃ) বিখ্যাত বুজুর্গ ও মোহাদ্দেস ছিলেন। তিনি একবার রুগ্ন হলেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বললঃ হুজুর! আপনি যদি বেতরের নামাজে সূরা اذا جاء থেকে قل هو الله পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে পাঠ করেন তবে আপনি আরোগ্য লাভ করবেন। হযরত শাহ সাহেব তখন একটু মুচকি হাসলেন। কিছুদিন পর লোকটি হাযির হয়ে দেখলো তিনি তখনও রুগ্ন রয়েছেন। সে জিজ্ঞাসা করলো হুজুর! মনে হয় আপনি সেই তদবিরটি করেননি, তিনি বললেনঃ দেখ, আমরা এ কয়েক রাকাআত নামায আদায় করা ব্যতীত অন্য কোন এবাদত করি না। আর সেই নামাজও যদি আমাদের দুনিয়ার আরাম, রোগমুক্তি প্রভৃতির জন্যে হয়ে যায় তবে আল্লাহ পাকের জন্যে কি রইল? এ হলো আল্লাহ ওয়ালাদের কথা। যারা সারা জীবন অতিবাহিত করেছেন আল্লাহর বন্দেগীতে, যারা জীবনকে বিলীন করে দিয়েছেন এক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাদের কথা এমনি হয়। তাদের এখলাস অদ্বিতীয়। তাঁদের নিয়ত সম্পূর্ণ সঠিক এবং দুরস্ত। এক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য। তাই সারা জীবন রুগ্ন থাকা পছন্দ করেছেন কিন্তু আরোগ্য লাভের কোন কর্মসূচীতে নামাজকে অন্তর্ভুক্ত করা পছন্দ করেননি।

প্রশ্ন হতে পারে কোরআনে করীমের বিভিন্ন আয়াতে অনেক উপকারের কথা হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্যে, রোগ মুক্তির জন্যে, বিপদ মুক্তির জন্যে অনেক আয়াতের আমলের কথা উল্লেখিত হয়েছে। অনেক বুজুর্গানে দ্বীন আমালে কোরআনের উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন। তবে কি এসব আয়াতে কোরআনের ওপর আমল করলে তা এবাদতের শামিল হবে না? এ প্রশ্নের জবাবে এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মুফতী হযরত মুফতী শফী সাহেব (রহঃ) লিখেছেন এসব আমল দ্বারা আল্লাহ্ পাক স্বাস্থ্য সুখ দান করবেন বা অন্যান্য উপকারও লাভ হবে কিন্তু এ আয়াত সমূহের পাঠক তার সওয়াব পাবে না, কেননা সওয়াবের উদ্দেশ্যে সে পাঠ করেনি, বরং রোগমুক্তি বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে পাঠ করেছে অতএব, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে যদি কোন আয়াত তেলাওয়াত করা হয় তবে তা দ্বারা সে উদ্দেশ্য সফল হতে পারে কিন্তু এ তেলাওয়াত এবাদতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। মোট কথা এবাদতকে অন্য একটি এবাদতের মাধ্যম করা যেতে পারে কিন্তু দুনিয়ার কোন লাভ বা উপকারের জন্যে এবাদত করা হলে তা আর খাঁটি এবাদত থাকেনা।

এজন্যে বুজুর্গানে দ্বীন, যাঁরা বিশেষ কোন আমলের তা'লীম দেন তারা একথাও বলেন যে আমল যেন এবাদত হিসেবে তথা আল্লাহ্ পাকের সন্তষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হয় তাহলেই আল্লাহ পাক অশেষ সওয়াব দান করবেন, কেননা আমল যদি শুধু দুনিয়ার ফায়দার জন্যে করা হয় তবে তা খাঁটি এবাদত হলোনা।

এ পর্যায়ে অন্য একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে হাদীস শরীফে হজ্জ ও ওমরার সওয়াবের কথার সাথে একথাও এরশাদ হয়েছে যে এর বরকতে আল্লাহ্ পাক দারিদ্র দূর করে দেন কিন্তু যদি কেউ সম্পদশালী হওয়ার লোভে তথা দারিদ্র দূর করার নিয়তে হজ্জ বা ওমরাহ করে তবে তার সওয়াব হবে না। কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষাণা করেছেনঃ

انما الاعمال بالنيات

অর্থাৎ আমলের মান নির্ধারিত হয় তার নিয়ত অনুসারে। বোখারী শরীফে সর্ব প্রথম এই হাদীস সংকলিত হয়েছে।

এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে এবাদত শুধু আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যেই হতে হবে অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। এজন্যে আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে মোমেনদেরকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ হে মোমেনগণ! তোমরা তোমাদের সদকা খয়রাতকে বাতিল করোনা। সদকা খয়রাত বাতিল হয় যদি যাকে দান করা হয় তার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয় অথবা কোন প্রকারে তাকে কষ্ট দেয়া হলে। এমনিভাবে লোক দেখানোর জন্যে যদি কোন সৎ কাজ করা হয় তবে তাও সওয়াবের যোগ্য বিবেচিত হয় না।

অতএব, নেক আমল করা যেমন জরুরী তেমনি নেক আমলের জন্যে নেক নিয়ত আরও বেশী জরুরী তথা শুধু এক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নেক আমল করাও জরুরী।

এ পৃথিবী যাতে আমরা বাস করছি, এখানে যা কিছু প্রকাশ্য তার উপরই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যা কিছু গোপন, যা কিছু মানুষের অন্তরের গোপনতম প্রকোষ্ঠে সংরক্ষিত তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হয় না। যেমন- হযরত ওমর (রাঃ) বলেছিলেনঃ

نحن نحكم بالظاهر والله يولى السرائر

অর্থাৎ যা কিছু প্রকাশ্যে দেখি তার ভিত্তিতেই আমরা আদেশ দিয়ে থাকি, আর গোপন রহস্য আল্লাহর উপর সোপর্দ করি। এজন্যে কোরআনে কারীমে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ

সেদিনকে স্মরণ কর, যেদিন রহস্য সমূহ উদঘাটিত হবে, তাই আখেরাতে সিদ্ধান্ত হবে নিয়তের ভিত্তিতে মানুষের আন্তরিক ইচ্ছার বুনিয়াদে, কেননা আল্লাহ্ পাক "আল্লামুল গুয়ুব'। তিনি সমস্ত গায়বী খবর সম্পর্কে অবগত। তাই মানুষ যখন কোন সৎ কাজ আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করে তখন তার অশেষ সওয়াব দান করা হয়। পক্ষান্তরে, এই একই সৎ কাজ যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে না করা হয় তবে সেই সৎ কাজ বাতিল বলে বিবেচিত হয়। পবিত্র কোরআনের দু'টি আয়াতে এ পর্যায়ে দু'টি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। একদল লোক শুধু লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে গরীব দুঃখীকে সাহায্য করে। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে না যেমন আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَا لَهٗ رِئَاءَ النَّاسِ

অর্থাৎ সে ব্যক্তির ন্যায় যে তার ধন-সম্পদ লোক দেখানোর জন্যে ব্যয় করে, আর অন্য একদল যারা শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে। এতে কোন সন্দেহ নেই উভয়ের কাজেই গরীব দুঃখীর উপকার হয় এবং প্রকাশ্যে দৃষ্টিতে উভয়ের কাজ একই প্রকার মনে হয়, কেননা উভয়েই সদকা খয়রাত করে কিন্তু পবিত্র কোরআন সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে যে প্রকাশ্য দৃষ্টিতে একই প্রকার কাজ হলেও তাদের নিয়তে পার্থক্য হওয়ার কারণে পরিণামেও হবে বিরাট পার্থক্য। যে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দান খয়রাত করেছে তার শুভ পরিণতি বা সওয়াব হবে অসামান্য। পক্ষান্তরে যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে নয়; বরং লোক দেখানোর জন্যে দান খয়রাত করে তার পরিণতি হবে শোচনীয় এবং ঘৃণ্য।

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ
وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ
فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَاللّٰهُ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٦٥﴾ اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ
نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ
الثَّمَرٰتِ ۙ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ ۖۚ فَاَصَابَهَآ
اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ
الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٦٦﴾

তরজমা

(২৬৫) আর যারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং নিজেদের মনকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে স্বীয় ধন-সম্পদ (আল্লাহর রাহে) ব্যয় করে তাদের দৃষ্টান্ত সেই বাগানের ন্যায় যা উঁচু ভূমিতে অবস্থিত, তাতে মুষলধারে বৃষ্টি হয়। ফলে তাতে দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন হয়, আর যদি তাতে বৃষ্টি নাও হয় তবে শিশির বিন্দুই যথেষ্ট এবং আল্লাহ পাক তোমাকের কার্যাবলী সর্বক্ষণ নিরীক্ষণ করে থাকেন (কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নয়)।

(২৬৬) তোমাদের কেউ কি পছন্দ করে? যে, তার একটি খেজুর এবং আঙ্গুরের বাগান হয় যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হয় এবং তাতে সর্বপ্রকার ফলমূল থাকে, যখন সে ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত হয় তার সন্তান-সন্ততি থাকে দুর্বল, এমন অবস্থায় সে বাগানে আসে একটি ঘূর্ণি বায়ু যাতে থাকে অগ্নি এবং যা বাগানকে দগ্ধ করে দেয়। এমনিভাবে আল্লাহ পাক তোমাদের জন্যে তাঁর নির্দশন সমূহ বর্ণনা করে থাকেন, হয়তো তোমরা চিন্তা করবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এমন দাতা ব্যক্তিদের আলোচনা হয়েছিল যারা দানের পর গ্রহীতার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে বা তাদেরকে নির্যাতন করে অথবা যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান করে। আর এ আয়াতে এমন দাতাদের উল্লেখ রয়েছে যারা

আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির লাভের উদ্দেশ্যে এবং নিজেদের অন্তরকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে দান করে তথা আল্লাহ্ পাক তাঁর রাহে দান করার বিনিময়ে যে সওয়াবের কথা ঘোষণা করেছেন তার প্রতি পূর্ণ একীন প্রকাশার্থে যারা আল্লাহর রাহে দান করে।

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আল্লাহর রাহে যারা দান করে তাদের শুভ পরিণতির কথা বর্ণনা করেছেন। যারা শুধু আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের দৃষ্টান্ত একটি বাগানের ন্যায় যে বাগানটি উঁচু ও উৎকৃষ্ট ভূমিতে অবস্থিত। তার উপর মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ার কারণে বাগানের মালিক দ্বিগুণ ফল লাভ করে। আর যদি মুষলধারে বৃষ্টিপাত নাও হয়, হালকা বৃষ্টিপাত হয় বা শিশির বিন্দুর কারণেও বাগানের মালিক ফল লাভ করে অর্থাৎ যখন কোন মানুষ এখলাস বা আন্তরিকতা নিয়ে তথা এক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দান করে তবে কেয়ামতের দিন অবশ্যই সে তার ফল ভোগ করবে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ

"নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক নেককারদের বিনিময় বিনষ্ট করেন না"।

আল্লাহ্ পাক আরও এরশাদ করেছেনঃ

وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্যে যা কিছু নেক কাজ করবে তার বিনিময় আল্লাহর নিকট তোমরা যা পাবে তা হবে উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসেবে মহত্তর।

অতএব, আল্লাহ্ রাহে দান করা এবং শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দান করা কল্যাণকামী মানুষের একান্ত কর্তব্য। এ পর্যায়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান বাণী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে আছ যার নিকট তার নিজস্ব ধন-সম্পদ অপেক্ষা তার উত্তরাধিকারীদের ধন-সম্পদ অধিকতর প্রিয়? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার নিজস্ব ধন-সম্পদ উত্তরাধিকারীদের ধন-সম্পদ থেকে অধিকতর প্রিয় নয়। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ প্রত্যেকের ধন-সম্পদ তো তাই যা সে অগ্রিম প্রেরণ করে (তথা

আল্লাহর রাহে দান করে) আর উত্তরাধিকারীদের সম্পদ তা যা সে দুনিয়াতে রেখে যায়। (বোখারী শরীফ)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার একটি বকরী জবেহ্ করা হলো এবং তার গোশ্‌ত মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ হলো তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ এ বকরীটির কিছু অংশ কি অবশিষ্ট রয়েছে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেনঃ শুধু একটি হাত বাকী রয়েছে। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, বরং যা কিছু বিতরণ হয়েছে সবই বাকী রয়েছে (অর্থাৎ যা কিছু আল্লাহর রাহে দান করা হয়েছে তার সওয়াব নির্ধারিত হয়েছে অতএব, প্রকৃত অর্থে সে অংশটিই বাকী রয়ে গেছে)। (তিরমিজি শরীফ)

ইমাম বয়যাবী (রঃ) লিখেছেন যে এ আয়াতে একথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহর রাহের দান করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপকারীতা হলো ব্যক্তি জীবনের সংশোধন অর্থাৎ অর্থ-সম্পদের প্রতি মানুষের ঘৃণ্য আসক্তি দূর করা, কৃপণতা, হিংসা-বিদ্বেষ প্রভৃতি নৈতিক ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করা। এই সমস্ত দূরারোগ্য ব্যাধি দূর করার পন্থা হলো আল্লাহর রাহে দান করা, দুস্থ মানুষের জন্যে অর্থ সম্পদ ব্যয় করা। বস্তুতঃ আল্লাহর রাহে দান করার মাধ্যমে শুধু যে দুঃখী মানুষের দুঃখ নিবারণ করা হয় তাই নয়; বরং এর দ্বারা দাতা ব্যক্তি বিশেষভাবে উপকৃত হয় যেমন তার কৃপণতা দূরীভূত হয়, স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা এবং অনুদার মনোভাবের অবসান ঘটে।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে আল্লাহর রাহে দান করার মাধ্যমে মানব মন রোগ মুক্ত হয় এবং মনের পবিত্রতা অর্জিত হয়। একথাটি কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ নির্দেশ দিয়েছেনঃ (হে রসূল!) আপনি মুসলমানদের ধন-সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন যা তাদেরকে পবিত্র করবে। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ

"(হে রসূল!) আপনি মুসলমানদের থেকে সদকা আদায় করুন। এ সদকা তাদেরকে পবিত্র করবে, তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান করবে এবং আপনি তাদের তাদের জন্যে রহমতের দোয়া করুন। নিশ্চয় আপনার দোয়া তাদের জন্যে শান্তি ও সান্ত্বনার কারণ হবে"।

এ পর্যায়ে আরও একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পবিত্র কোরআন আল্লাহর রাহে দান করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে, এতদ্ব্যতীত পবিত্র কোরআন যে কথাটি

মর্দে মোমেনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে বদ্ধমূল করার তাগিদ করেছে তাহলো, তোমার ধন-সম্পদের মূল মালিক হলেন স্বয়ং আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন। তুমি শুধু তাঁর বন্দা হিসেবেই লাভ করেছ এর মালিকানা। আর এ মালিকানা আদৌ চিরস্থায়ী নয়, বরং ক্ষণস্থায়ী, কেননা স্বয়ং তোমার জীবন বা অস্তিত্বই যে ক্ষণস্থায়ী। এতদ্ব্যতীত, এ ধন-সম্পদে তোমার একচ্ছত্র অধিকার নেই। তাতে রয়েছে সমাজের নিঃস্ব মানুষের অধিকার। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَفِىٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

"এবং তাদের অর্থ-সম্পদে অধিকার রয়েছে সাহায্যপ্রার্থী ও বঞ্চিত মানুষের"। এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাহে দান করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে এরশাদ করেছেনঃ প্রতিদিন দুজন ফেরেশতা আল্লাহ্ পাকের দরবারে এই দোয়া করে একজন বলে, হে আল্লাহ্! যে দাতা তাকে আরও দাও। আর একজন এই দোয়া করে, হে আল্লাহ্! যে কৃপণ তার অর্থ সম্পদ ধ্বংস কর। এমনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেছেনঃ তোমরা কৃপণতা থেকে আত্মরক্ষা কর, কেননা এ কৃপণতাই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ধ্বংস করেছে। তিনি আরও এরশাদ করেছেন দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর বন্ধু, বেহেশ্‌তের নিকটবর্তী, জনপ্রিয় আর দোযখ থেকে দূরবর্তী। পক্ষান্তরে কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের অপ্রিয়, অপছন্দনীয় এবং মানুষের নিকটও অপ্রিয়, সে বেহেশ্‌ত থেকে দূরে তবে দোযখের নিকটবর্তী।

আলোচ্য আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) বলেছেন আল্লাহর রাহে দানের দুটি উদ্দেশ্য এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে (১) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে (২) নিজেদের মনকে সুদৃঢ় করার জন্যে তথা মনের শান্তি ও সান্ত্বনা লাভের জন্যে। ইমাম রাজী (রঃ) বলেছেনঃ মানব মন শান্তি লাভ করে আল্লাহর জিকরের মাধ্যমে কোরআনে করীমে ঘোষিত হয়েছেঃ

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

"মনে রেখ শুধু আল্লাহর জিকরের মাধ্যমেই মানব মন শান্তি লাভ করে"।

অতএব, যে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অর্থ সম্পদ ব্যয় করে তার মন শান্তিতে পরিপূর্ণ হয় এবং আল্লাহর রাহে দান করার এটি একটি নগদ ফল যা সে দুনিয়াতেই লাভ করে আর পরকালে রয়েছে তার জন্যে অশেষ সওয়াব।

اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ

এ আয়াতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন একটি বিস্ময়কর এবং মর্মস্পর্শী দৃষ্টান্ত

বর্ণনা করেছেন এমন এক ব্যক্তির যে একটি বাগান তৈরী করে এবং আশা করে যেন বার্ধক্যাবস্থায় যখন যে অসহায় এবং অক্ষম হবে তখন এই বাগান তার প্রয়োজন পূরণে সহায়ক হবে। যথা সময়ে যথা নিয়মে বার্ধক্য আসল এবং সেই বাগানের ফলমূলের প্রয়োজনও দেখা দিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বাগানটিতে অগ্নিকান্ড ঘটল এবং ভস্মীভূত হলো। অথচ বার্ধক্যের কারণে লোকটি আয় রোজগারে অক্ষম, তার সন্তান-সন্ততি দুর্বল তার জন্যে মোটেও সহায়ক নয়। এমনি অবস্থায় তার অবস্থা কত শোচনীয় তা সহজেই অনুমেয়। ঠিক সে অবস্থাই তাদের হয় যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যেই দান খয়রাত করে। দান খয়রাত যেন ফলের বাগান আর এই ফলের দ্বারা উপকৃত হওয়ার সঠিক সময় পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগী। লোক দেখানোর অসৎ উদ্দেশ্যের অগ্নি তার বাগানকে পুড়িয়ে দেয় ফলে বাগানের ফল তথা সওয়াব থেকে সে ব্যক্তি চির বঞ্চিত হয়। এভাবেই আল্লাহ পাক তাঁর আয়াত সমূহকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে থাকেন, যাকে করে মানুষ তাদের পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা সঠিকভাবে গ্রহণ করতে প্রয়াসী হয়।

হেদায়েতের পর গোমরাহী

বোখারী শরীফে রয়েছে আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমরা কি জান? এ আয়াত কার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে? তারা জবাব দিলেন আল্লাহ পাকই জানেন। হযরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ তোমরা জান কি-না তা আমাকে জানাও। তখন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন আমীরুল মোমেনীন! আমার মনে একটি কথা আছে। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, হে ভ্রাতস্পুত্র! তোমার মনের কথা প্রকাশ কর তোমার বয়সের স্বল্পতার কারণে নিজেকে ছোট মনে করোনা। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) তখন বললেনঃ এতে একটি আমলের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হলো কোন্ আমল? তিনি বললেন একজন সম্পদশালী ব্যক্তি যে আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ মোতাবেক কাজ করে কিন্তু কিছুদিন পর শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করে ফেলে, সে পাপাচারে লিপ্ত হয়। তার নেক আমলের পথ সে হারিয়ে ফেলে- এটিই হলো এ আয়াতের ব্যাখ্যা। অর্থাৎ এক ব্যক্তি প্রথমে নেক আমল করে, এরপর তার অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং সে মন্দ কাজে লিপ্ত হয়, পূর্বকৃত নেকী সমূহ বরবাদ করে দেয়। জীবনের শেষ মুহূর্তে যখন নেকীর প্রয়োজন সর্বাধিক হয় তখন সে রিক্ত হস্ত হয়ে যায়। তারই দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির ন্যায় যে একটি বাগান আবাদ করে যা ফলে ফুলে পরিপূর্ণ হয় এবং তা দ্বারা উপকৃত হতে থাকে। কিন্তু যখন সে বার্ধক্যে উপনীত হয় তার ছোট সন্তান সন্ততিরাও তাকে সাহায্য করতে পারে না, এমন সময় বাগানে অগ্নিকাণ্ড ঘটে এবং বাগানটি জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায়। ঠিক এমনিভাবে কোন

কাফের যখন আল্লাহর নিকট হাযির হয়, কুফরের অগ্নি তার জীবনকে ব্যর্থ করে দেয়। জীবনের কোন কর্মফল সে লাভ করতে পারে না।[১]

বস্তুতঃ যারা এ জীবনে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে নেক আমলের সম্বল সংগ্রহ করেনা, তাদের অবস্থা এমনই শোচনীয় হয়। আজকের সমাজ জীবনে আমরা কি লক্ষ্য করি? জীবনের সকল সংগ্রাম সাধনা শুধু এ ক্ষণস্থায়ী জগতের এবং এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনের উন্নতি অগ্রগতি সমৃদ্ধি এবং শ্রীবৃদ্ধির জন্যেই হয়ে থাকে। পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর চিন্তা ভাবনা থেকে অনেক দূরে থেকেই দুনিয়ার জিন্দেগীর উন্নতির জন্যে সাধনা অব্যাহত থাকে। কিন্তু একদিন হঠাৎ মৃত্যুর অলংঘনীয় বিধান জীবনের অবসান ঘটায়। সারা জীবনের সঞ্চিত সম্পদ জমিনের উপরেই পড়ে থাকে, কর্মক্লান্ত সংগ্রামী ব্যাক্তিটিকে রিক্ত হস্ত অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়। তখন সে আল্লাহর কাছে কি পেতে পারে? আল্লাহ পাক কোরআনে করীমে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

"সেদিনকে ভয় কর যেদিন তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে আল্লাহ পাকের নিকট এবং প্রত্যেকের যা উপার্জন করেছে তা পুরোপুরিই তাকে দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোন প্রকার অবিচার করা হবে না।"

অর্থাৎ কেয়ামতের দিনকে তথা মহা বিচারের দিনকে ভয় কর। কেননা সেদিন প্রত্যেককে তার কর্মফল প্রদান করা হবে। সৎ কর্মের শুভ পরিণতি হবে চির শান্তি, চির নাজাত, পক্ষান্তরে অসৎ কর্মের পরিণতি হবে চির শাস্তি। এজন্যে আলোচ্য আয়াতে শেষ বিচারের দিনকে ভয় করার তথা সেদিনের প্রস্তুতি গ্রহণের তাগিদ করা হয়েছে।

বিখ্যাত বুজুর্গ আহমদ এবনে হারব (রহঃ) বলেন, আশ্চর্য সে ব্যক্তির প্রতি যে ভালভাবেই জানে যে, আসমানে তার জন্যে জান্নাতকে সুসজ্জিত করা হচ্ছে এবং তার নিম্নদেশে দোযখের অগ্নি প্রজ্বলিত হচ্ছে। এমনি অবস্থায় জান্নাত এবং দোযখের মাঝে থেকে কিভাবে সে নিদ্রিত হয়?

বর্ণিত আছে আবু বকর এবনে আইয়াশ (রহঃ) চল্লিশ বছর যাবত বিছানায় বিশ্রাম গ্রহণ করেননি। তিনি একবার পুত্রকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, এই জানালার নিকট কোন পাপ কার্যে লিপ্ত হয়োনা, কেননা এখানে আমি ১২ হাজার বার

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা -১৭

কোরআন শরীফ খতম করেছি। তাঁর এন্তেকালের সময় তিনি তাঁর বাসগৃহের এক কোণের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেনঃ আমি এখানে ২৪ হাজার বার কোরআন শরীফ খতম করেছি।

হযরত সামনুন (রহঃ) প্রতি দিন ৫০০ রাকাআত নফল নামায আদায় করতেন, তাঁর একটি ঘটনা আল্লামা যোবায়দী (রহঃ) লিখেছেন ঃ বাগদাদে এক ব্যক্তি চল্লিশ হাজার দেরহাম আল্লাহ্‌র রাহে দান করেছে একথা শ্রবণ করে হযরত সামনুন (রহঃ) বললেন, আমাদের কাছে এত অর্থ নেই যে, আমরা আল্লাহর রাহে দান করব। তবে একটি কাজ করা যেতে পারে, এর সম পরিমাণ নফল নামায আদায় করা যেতে পারে। অতঃপর তিনি মাদায়েনে গমন করলেন এবং চল্লিশ হাজার রাকাআত নামায আদায় করলেন।

আমাদের ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) চল্লিশ বছর যাবত একাধারে এশার নামাযের অজু দ্বারা ফজরের নামায আদায় করেছেন। তাঁর সত্তর বছর বয়সে তিনি ৫৫ বার হজ্ব করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে একটি নির্দিষ্ট স্থানে তিনি সাড়ে সাত হাজার বার কোরআন শরীফ খতম করেছিলেন।

বস্তুতঃ এরাই সত্যিকার অর্থে কেয়ামতের দিনকে ভয় করতেন এবং শেষ বিচার দিনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন, তারাই ছিলেন কল্যাণকামী, বাস্তববাদী এবং পরিণামদর্শী তারাই ছিলেন আল্লাহর প্রেমিক। আল্লাহর প্রেমিকদের এমনি ঘটনা দ্বারা ইসলামের ইতিহাস পরিপূর্ণ।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن
طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا
تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ
أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾
ٱلشَّيْطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ ۖ وَٱللَّهُ
يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾
يُؤْتِى ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ
أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٢٦٩﴾

তরজমা

(২৬৭) হে মোমেনগণ! তোমাদের উপার্জন থেকে আর তোমাদের উপকারার্থে আমি যা কিছু যমীন থেকে উৎপন্ন করেছি তা থেকে উত্তম বস্তু ব্যয় কর এবং অপবিত্র বস্তু দান করতে ইচ্ছা করোনা অথচ তা তোমরা নিজেরাই চক্ষু বন্ধ করা ব্যতীত গ্রহণ কর না এবং জেনে রাখ যে নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক কারো মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি স্বয়ং প্রশংসিত।

(২৬৮) শয়তান তোমাদেরকে অভাবের ভয় দেখায় এবং অন্যায় কাজের আদেশ দেয় এবং আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা এবং দানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করছেন এবং আল্লাহ্ পাক উদার ও মহাজ্ঞানী।

(২৬৯) যাকে ইচ্ছা আল্লাহ্ পাক হেকমত প্রদান করেন আর যাকে হেকমত প্রদান করা হয় সে নিশ্চয় প্রচুর কল্যাণ লাভ করে এবং শুধু বুদ্ধিমান লোকেরাই নসীহত কবুল করে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ্র রাহে দান করার নিয়ত সম্পর্কে তাগিদ করা হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিয়ত বা উদ্দেশ্যে দান করতে হবে তার নির্দেশ রয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে কেমন সম্পদ দান করতে হবে তার নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ হে মোমেনগণ! তোমরা তোমাদের উত্তম সম্পদ আল্লাহর রাহে দান কর। যে বস্তু তোমরা নিজেরাও সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করবে না তা আল্লাহর রাহে দান করোনা অর্থাৎ যা তোমাদের পছন্দনীয়, প্রিয়, উৎকৃষ্ট তাই আল্লাহর রাহে দান করবে, কেননা আল্লাহ্ পাকের দরবারে নিকৃষ্ট বস্তু গ্রহণযোগ্য হয় না।

শানে নুজুল

হযরত বরা এবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করেন, খেজুরের মৌসুমে আনসারী সাহাবীগণ তাঁদের সাধ্যানুযায়ী খেজুরের ছড়া এনে মসজিদে নববীর দু'টি খুঁটির সঙ্গে বাঁধা রশিতে ঝুলিয়ে রেখে দিতেন। দরিদ্র নিঃস্ব মোহাজের সাহাবায়ে কেরাম সেই খেজুরগুলো দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ করতেন, কেননা তাঁরা সর্বদা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে পড়ে থাকতেন এবং তিনি যা বলতেন তা কণ্ঠস্ত করতেন এবং তাঁর মহান শিক্ষা ও আদর্শের প্রচারে মশগুল থাকতেন। তাঁদেরকে

আসহাবে ছোফ্ফা বলা হয়। তাঁদের সংখ্যা ৭০ থেকে ৪০০ পর্যন্ত ছিল। আনসারী সাহাবাদের মধ্যে যারা মোহাজেরীনদের উদ্দেশ্যে খেজুর রেখে যেতেন তাদের কেউ কেউ নিকৃষ্ট প্রকারের খেজুরও রেখে যেতেন। এরপর এ আয়াত নাযিল হয়। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এমন বস্তু সদকা দিতে নিষেধ করলেন।[১]

এ বিবরণ তিরমিযী শরীফ ও এবনে মাজা শরীফে সংকলিত হয়েছে। হযরত সাহল এবনে হানিফের বর্ণনা হলো কিছু লোক নিকৃষ্ট বস্তু সমূহ ওশর হিসেবে পেশ করলে এ আয়াত নাযিল হয়।

হাকেম হযরত যাবের (রঃ)-এর বর্ণনা সংকলন করেছেন যে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সদকায়ে ফেতর হিসেবে এক ছা' (সাড়ে তিন সের) খেজুর আদায়ের আদেশ দিলেন তখন কেউ কেউ নিকৃষ্ট খেজুর আদায় করলে এ আয়াত নাযিল হয়। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে একটি বর্ণনা সংকলিত হয়েছে যে, কয়েকজন সাহাবী সস্তা দরের খাদ্য-দ্রব্য ক্রয় করে সদকা করলে এ আয়াত নাযিল হয়।[২]

أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, ইতোপূর্বে আল্লাহ পাক দুর্গত মানবতার সেবায় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার তাগিদ করেছেন। অতঃপর সেই অর্থ-সম্পদ দানের পর যেন গ্রহীতার প্রতি কোন প্রকার অনুগ্রহ প্রকাশ না করা হয় এবং তাকে কোন প্রকার কষ্ট না দেয়া হয় তার তা'লীম রয়েছে। এরপর শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তথা দানের উদ্দেশ্য বা নিয়ত যেন সঠিক হয় তার তাগিদ রয়েছে। অতঃপর প্রত্যেক প্রকার দানের ব্যাপারে অতি সুন্দর মর্মস্পর্শী দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে। এরপর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহর রাহে যা দান করা হবে তা কেমন সম্পদ হবে? এ প্রশ্নের জবাব রয়েছে এ আয়াতে।[৩]

অর্থাৎ তোমাদের উত্তম সম্পদ সমূহ থেকে তোমরা আল্লাহর রাহে দান কর। যে উত্তম সম্পদ তোমরা রোজগার কর আর যা আল্লাহ পাক যমীন থেকে উৎপন্ন করেন। আলোচ্য আয়াতের "তায়্যেবাত" শব্দটির ব্যাখ্যা নিয়ে কথা আছে, এর অর্থ হলো উৎকৃষ্ট বা উত্তম বস্তু। অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৯
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৯
৩। তফসীরে কবীর খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৬০

(তোমাদের প্রিয় বস্তু আল্লাহর রাহে দান না করা পর্যন্ত তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে না।)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) এবং মুজাহেদ (রঃ) এ শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন হালাল বস্তু সমূহ।[১] কেননা হারাম বস্তু কখনো উৎকৃষ্ট হতে পারেনা। অতএব, সদকা খয়রাতের বস্তু যেমন হালাল হতে হবে তেমনি উৎকৃষ্টও হতে হবে। এ পর্যায়ে হযরত এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত একখানি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে বন্দা হারাম বা অবৈধ পন্থায় অর্জিত সম্পদ দান খয়রাত করে তার দান কবুল হয় না, হারাম ধন-সম্পদে বরকত হয় না। হারাম পন্থায় উপার্জিত সম্পদ যা মানুষ দুনিয়াতে রেখে যায় তা তার দোযখে নিক্ষিপ্ত হওয়ার উপকরণ হয়। ২ (আহমদ)

এখানে এ বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একাধিক মত প্রকাশ করেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্র রাহে দান করার যে নির্দেশ রয়েছ তা কি ফরজ যাকাত সম্পর্কিত? কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মতে এ আয়াতে যাকাতেরই তাগিদ রয়েছে। অন্য এক দল তথ্য সন্ধানী বলেন যে, এতে যাকাত নয়, বরং নফল দান খয়রাতের কথাই বলা হয়েছে। আর একটি মত হলো, এ আয়াতে ফরজ যাকাত এবং নফল দান খয়রাত সবই অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। যাদের মতে এর দ্বারা ফরজ যাকাতের কথা বলা হয়েছে তারা বলেন انفقو। আদেশ মূলক বাক্য, তাই এ আয়াতে ফরজ যাকাত আদায়েরই তাগিদ করা হয়েছে।

যারা বলেন এর দ্বারা নফল সদকার কথা বলা হয়েছে তারা হযরত আলী (রাঃ), হাসান ও মুজাহেদের বক্তব্যকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন। ওবায়দা সালমানী বর্ণনা করেন যে, আমি এ আয়াত সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তখন তিনি বলেছিলেন এ আয়াত ফরজ যাকাত সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এক ব্যক্তি যাকাত হিসেবে যখন খেজুর আদায় করত তখন ভালগুলো বেছে ঘরে রেখে মন্দগুলো আদায় করত, তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ

অর্থাৎ তোমরা নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করতে সংকল্প করোনা। তোমরা নিজেরা চক্ষু বন্ধ করা ব্যতীত যা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হও না।[৩]

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৭, পৃষ্ঠা- ৬১
২। তফসীরে মাজহারী-২, পৃষ্ঠা- ৫৯
৩। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৩ পৃষ্ঠা-৩৯

এ বাক্যটি দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে মন্দ বস্তু ব্যয় করেছিল যা সে ঘরে রাখতে চায় না তা আল্লাহর রাহে ব্যয় করেছিল। অতএব, এ আয়াত দ্বারা এমন কাজ সর্বকালের জন্যে নিষিদ্ধ হলো।

وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ

অর্থাৎ যে নিকৃষ্ট বস্তু আল্লাহ রাহে দান করার ইচ্ছা করেছ তা যদি তোমাদেরকে দান করা হয় তবে তা তোমরা গ্রহণ করবে না আর যদি গ্রহণ করতেও হয় তবে লজ্জায় তোমাদের চক্ষু বন্ধ হয়ে যাবে। অতএব যা নিজে গ্রহণ কর-না তা আল্লাহর রাহে দান করার ইচ্ছা কেন কর?

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ

এবং নিশ্চিত ভাবে জেনে রাখ আল্লাহ্ পাক কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি কারো পরোয়া করেন না, তিনি স্বয়ং প্রশংসিত। কারো প্রশংসার অপেক্ষা তিনি করেন না। যদি কেউ আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে আল্লাহর রাহে কোন উৎকৃষ্ট বস্তু দান করে তবে তা তিনি গ্রহণ করেন।

ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন এ বাক্যটিতে সতর্কবাণী রয়েছে তাদের জন্যে, যারা আল্লাহর রাহে মন্দ বস্তু দান করার ইচ্ছা করে।

বস্তুতঃ নিকৃষ্ট বস্তু দারিদ্র প্রপীড়িত মানুষকে দিয়ে আল্লাহ্ পাকের দরবার থেকে সওয়াবের আশা করা দুরাশা মাত্র। আল্লাহ্র রাহে দান করা উচিত নিজের প্রিয় বস্তু এবং উত্তম ও হালাল বস্তু। এতদ্বারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি প্রেম, ভক্তি এবং আনুগত্য প্রমাণিত হবে।

এ আয়াতে যেহেতু আল্লাহ্র রাহে উত্তম বস্তু ব্যয় করার নির্দেশ রয়েছে তাই স্বাভাবিকভাবেই মানুষ সর্বোত্তম বস্তুটি আল্লাহর রাহে দান করতে প্রয়াসী হবে। কিন্তু ইবলিস শয়তান মানুষকে এমন অবস্থায় এভাবে প্ররোচনা দিতে চেষ্টা করবেঃ যদি তুমি উত্তম বস্তু সমূহ আল্লাহর রাহে দান কর তবে নিজেই দারিদ্র প্রপীড়িত, ভাগ্যাহত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ শয়তানী ওয়াস ওয়াসা দূর করতে পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ

অর্থাৎ শয়তান তোমাদেরকে অভাবের ভয় দেখায় আর পাপাচারের নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ক্ষমা করার এবং তাঁর দানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। হযরত আবুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কা'বার মালিকের শপথ করে বলছি, তারা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত। আমি আরজ করলাম তারা কে? তিনি এরশাদ করলেনঃ সম্পদশালী লোকেরা তবে যারা এভাবে ওভাবে, সম্মুখে এবং পেছনে, ডানে এবং বামে দান করতে থাকে কিন্তু এমন লোক অনেক কম। (বোখারী ও মুসলিম)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ দানশীলতা জান্নাতে একটি বৃক্ষের নাম (যার শাখাগুলো জান্নাতের বাইরে ঝুঁকে আছে) অতএব, যে ব্যক্তি জান্নাতের এই শাখাকে ধরে (তথা দান করে) সেই শাখা তাকে জান্নাতের বাইরে থাকতে দেয় না (এবং টেনে ভেতরে নিয়ে যায়) আর কৃপণতা দোযখের একটি বৃক্ষ (যার শাখাগুলো দোযখের বাইরে পড়ে আছে) অতএব যে সেই শাখাগুলো ধরে (তথা কৃপণতা করে) দোযখ সে ব্যক্তিকে ভেতরে নিয়ে যায়। (বায়হাকী)

হযরত আলী (রাঃ)-এর কথা বর্ণিত আছে যে, দ্রুত দান খয়রাত কর (বিলম্ব করোনা) কেননা বিপদাপদ দান খয়রাতের দেয়াল টপকে তোমাদের কাছে আসতে পারেনা।[১]

অতএব, আল্লাহর রাহে দান করা কল্যাণকামী মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য। আর এ দান করতে হবে শুধু এক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। লোক দেখানোর জন্যে নয় অথবা কোন জাগতিক উদ্দেশ্যে নয়। আর দানের বস্তু হতে হবে উত্তম এবং প্রিয়। এভাবে যারা দান করবে তাদের জন্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً

অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা এবং দানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। পক্ষান্তরে, শয়তান মানুষকে দানশীলতা থেকে বিরত রাখার জন্যে অভাব-অনটনের ভয় দেখায় এবং মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়।

আলোচ্য আয়াতে الفحشاء শব্দটির অর্থ যাকাত সদকা আদায় থেকে বিরত থাকা বা সর্বপ্রকার পাপাচার। কালবী বলেছেনঃ এ আয়াত ব্যতীত পবিত্র কোরআনে আর যে সব স্থানে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, সর্বত্র এর অর্থ হলো অশ্লীল কাজ তথা ব্যাভিচার।[২] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য শব্দটি পবিত্র কোরআনে ৭ বার ব্যবহৃত হয়েছে সূরা বাকারায় দু'বার, সূরা আ'রাফে একবার এবং সূরা ইউসুফ, নাহ্ল, নূর এবং সূরা আনকাবুতে একবার করে।

وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৭০
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৭১

বাক্যটির ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, শয়তান সর্বপ্রথম মানুষকে এ প্ররোচনা দেয়, আল্লাহর হুকুমে তোমার উত্তম সম্পদ ব্যয় করোনা, দিতে হলে বিনষ্ট ও অকেজো দেখে কিছু দিয়ে দাও অন্যথায় তুমি নিজেই ফকীর হয়ে যাবে। যখন মানুষ শয়তানের একথার অনুসরণ করে তখন সে আরও কঠোর হয়, ভালো-মন্দ কোন কিছুই আল্লাহর রাহে ব্যয় করতে দেয় না, এমনকি অবশ্য কর্তব্য বা ফরজ ব্যয় তথা যাকাত আদায় থেকেও সে ব্যক্তিকে বিরত রাখে, এমনকি আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দায়িত্ব পালনে এবং মানুষের আমানত আদায় করতেও শয়তান বাধা দেয়। যখন এমনি অবস্থায় লোকটি উপনীত হয় তখন পাপাচারের শোচনীয় পরিণামের কোন ভয় তার অন্তরে অবশিষ্ট থাকে না এবং সর্বপ্রকার পাপ কাজ তার পক্ষে সহজ এবং সম্ভব হয়। আর এ অবস্থাকেই পবিত্র কোরআন "ফাহ্শা" শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছে।

মূলতঃ প্রতিটি চরিত্রেরই দুটি চরম দিক আছে আর এ দুয়ের মাঝে আরেকটি মধ্য পন্থাও আছে যেমন পরম দানশীলতা হলো আল্লাহর রাহে যথাসর্বস্ব দান করে দেয়া আর এর বিপরীত মন্দ পথ হলো আল্লাহ্র রাহে কোন কিছু দান না করা। আর এ দুয়ের মাঝে আরও একটি পথ রয়েছে। যখন মানুষ শয়তানের অনুগামী হয়ে মন্দ বস্তু দান করতে শুরু করে তখন তাকে চরম মন্দের প্রতি আকৃষ্ট করা হয় কোরআন বিষয়টিকে এক বাক্যে ব্যক্ত করেছেঃ

وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ

অর্থাৎ শয়তান মানুষকে মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। শয়তানী ওয়াস ওয়াসার দুটি স্তর বর্ণনার পর আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا

অর্থাৎ আর আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে ক্ষমার করার তথা আখেরাতের নাজাতের আর দুনিয়াতেও অধিকতর দান করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।[১]

উল্লেখ্য, আল্লাহর রাহে দান করার একটি পন্থা হলো অতি প্রিয় এবং উত্তম বস্তু সমূহ দান না করে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের বস্তু দান করা। ইবলিস শয়তান যখন মানুষকে এ পর্যায়ে পথভ্রষ্ট করতে চায় তখন প্রথমেই সে চরম মন্দের দিকে ডাকে না; বরং মাঝামাঝি পথের দিকে আহবান করে, মানুষকে এভাবে প্ররোচনা দেয় যে, আল্লাহর রাহে দান করার বিধান আছে কর, তবে উত্তম এবং প্রিয় বস্তুটি নিজের জন্যেই রাখ, এছাড়া অন্যগুলো গরীব দুঃখীকে দিয়ে দাও। অন্যথায় তুমি নিজেই অভাবগ্রস্ত হয়ে যাবে, আল্লাহ্ পাক এ অবস্থাকে বর্ণনা করেছেনঃ

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৭, পৃষ্ঠা- ৬৫

يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ

অর্থাৎ শয়তান তোমাদেরকে অভাবগ্রস্ত হওয়ার কথা বলে।[১]

বিনিময়ে আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর চির শান্তির নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে এ আয়াতে। আর শয়তানী প্ররোচনা থেকে আত্মরক্ষা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

আর আল্লাহ্ পাক পরম উদার, তাঁর ভাণ্ডারে কোন কিছুরই অভাব নেই। মানুষের প্রতি তাঁর দান অনন্ত-অসীম। যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দারিদ্র পীড়িত মানুষকে দান করে তারা আল্লাহ্ পাকের দানে ধন্য হয়। আর তিনি মহাজ্ঞানী, কে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দান করে তা তিনি সম্পূর্ণ অবগত। তাঁর নিকট সব কিছু দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট, কোন কিছুই গোপন নেই।

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ

আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে হেকমত দান করেন, আর যাকে হেকমত দান করা হয় তাকে নিশ্চয় বিরাট সম্পদ, প্রচুর কল্যাণ প্রদান করা হয়। 'হেকমত' শব্দটি পবিত্র কোরআনে বিশবার ব্যবহার করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। হেকমতের তাৎপর্য হলো এমন সঠিক জ্ঞান যা মানুষের জন্যে উপকারী হয় এবং সে এলম বা জ্ঞান মোতাবেক আমল করা হয় যা আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি, নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে হয়। এমন এলম বা জ্ঞান ওহী ব্যতীত অর্জন করা সম্ভব নয়, আর ওহী আল্লাহর নবীগণ ব্যতীত আর কেউ লাভ করেন না। অতএব, সর্বপ্রথম হেকমত লাভ করেন আম্বিয়ায়ে কেরাম আর তাঁদের মাধ্যমে প্রদান করা হয় অন্যদেরকে।[২]

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাসের (রাঃ) মতে এখানে হেকমত অর্থ হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত। তাঁর একটি মত হলো হেকমত অর্থ পবিত্র কোরআনের তফসীর বা ব্যাখ্যা। তাঁর আরেকটি মতও বর্ণিত হয়েছে হেকমত অর্থ জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে সঠিক মত এবং সঠিক কথা ও কাজ।[৩]

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন হেকমত হলো যে এলমের সাথে আমলের সমর্থন থাকে তথা এলম মোতাবেক আমল করা হয়, কথা ও কাজে

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৬৫
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩১
৩। তানবীরুল মেকবাস মীন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-৩৯

সামঞ্জস্য থাকা। বিখ্যাত তত্ত্বজ্ঞানী ইব্রাহীম নখয়ী (রঃ) বলেছেন বিভিন্ন বিষয়ের মা'রেফাত বা পরিচয় পাওয়াই হলো হেকমত।

আরও বলা হয়েছে নেক আমলের প্রতি মনোনিবেশ করাই হলো হেকমত।

পবিত্র কোরআনের তথ্য সম্পর্কে অবগত হওয়াই হেকমত লাভ করা। হেকমতের মূল তত্ত্ব হলো আল্লাহর ভয়। অধিকাংশ তফসীরকার বলেনঃ পবিত্র কোরআনের তফসীর বা ব্যাখ্যার এলম এবং নবুওয়্যতই হলো হেকমত।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) হেকমতের ব্যাখ্যায় বলেছেন এখানে হেকমত অর্থ পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফের জ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করা যদ্দারা হালাল হারামের মধ্যে পার্থক্য করা যায় এতদ্ব্যতীত, পবিত্র কোরআনের কোন্ আয়াত মনসুখ করা হলো এবং কোন্ আয়াত দ্বারা মনসুখ হলো, পবিত্র কোরআনের সঠিক জ্ঞান অর্জন করা এসবই হেকমতের অন্তর্ভুক্ত। সাদী (রহঃ) বলেন এখানে হেকমতের তাৎপর্য হলো নবুওয়্যত। তবে হেকমতের তাৎপর্যে সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত তন্মধ্যে নবুওয়্যত সর্বোচ্চ মর্তবা।[২]

হেকমত শব্দটির ব্যাখ্যায় আল্লামা আলুসী (রহঃ) লিখেছেনঃ হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) মতে, হেকমত হলো পবিত্র কোরআনের মর্ম বাণীর সঠিক জ্ঞান। কাতাদা (রঃ), যাহ্যাক (রঃ) এবং আরও অনেকে এ মতই পোষণ করেন। এবনুল মুনজের বর্ণনা করেছেন যে আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে হেকমত অর্থ এখানে নবুওয়্যত আর হযরত মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন হেকমত হলো কথা ও কাজে সঠিক পন্থা অবলম্বন করা আর একই বর্ণনা রয়েছে হেকমত হলো পবিত্র কোরআনের সঠিক তথ্য জানা আর আতা (রঃ) বলেছেন হেকমত হলো আল্লাহর মা'রেফাত হাসিল কর। আবু ওসমান (রঃ) বলেছেনঃ হেকমত হলো একটি নূর বা জ্যোতি যাদ্বারা মানুষ শয়তানের ওয়াস ওয়াসা এবং আল্লাহর তরফ থেকে আসা এলহামের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হয়। মোকাতেল বলেছেনঃ হেকমতকে পবিত্র কোরআনে চার ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

(১) পবিত্র কোরআনের মর্মস্পর্শী নসিহত সমূহ,

(২) পবিত্র কোরআনের মূল্যবান এবং বিস্ময়কর তত্ত্ব ও তথ্য সমূহ।

(৩) পবিত্র কোরআনের এলম এবং তার মর্মকথার যথার্থ উপলব্ধি এবং

(৪) নবুওয়্যত।

মূলত এসবই হেকমতের অন্তর্ভুক্ত।[৩] ইমাম রাজী (রঃ) হেকমতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ হেকমত অর্থ এলম বা সঠিক পথ বা পন্থা। আর মোকাতেলের (রঃ)

১। খোলাসাতুত তাফাসীর খন্ড (উর্দু) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা ১৭
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ১৭
৩। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা- ৪১

কথার উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছেনঃ হেকমতের তাৎপর্য (১) পবিত্র কোরআনের নসিহত সমূহ যেমন সূরা বাকারায় রয়েছেঃ

وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ

আর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তোমাদের প্রতি কিতাব ও হেকমত যদ্বারা তোমরা নসিহত হাসিল কর আর এ অর্থেই সূরা নেসায় এরশাদ হয়েছেঃ

وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

"এবং আল্লাহ পাক আপনার উপর কিতাব ও হেকমত নাযিল করেছেন"।

আর হেকমত অর্থ সঠিক জ্ঞান, নির্ভুল উপলব্ধি যেমন এরশাদ হয়েছে,

وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا

"আর আমি তাকে জ্ঞান, বিচার-বুদ্ধি তার শৈশবেই দান করেছি"।

আর সূরা লোকমানে রয়েছে,

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ

(আর নিশ্চয় আমি লোকমানকে সার্বিক জ্ঞান দান করেছি)

আর এই একই অর্থে হেকমত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সূরায়ে আনআমে এরশাদ হয়েছে ঃ

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ

(৩) এবং হেকমত শব্দটি নবুওয়্যত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যেমন সূরা নেসায় এরশাদ হয়েছে ঃ

فَقَدْ اٰتَيْنَآ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

(অর্থাৎ আলে ইব্রাহীমকে কিতাব এবং নবুওয়্যত দান করেছি।)

এমনিভাবে সূরা ছোয়াদে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ

(অর্থাৎ তাকে দান করেছি নবুওয়্যত এবং ফয়সালাকারী বাগ্মিতা।)

আর এই একই অর্থেই হেকমত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সূরা বাকারায় এরশাদ

হয়েছে ঃ

وَاٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ

(আর আল্লাহ্ পাক তাঁকে দান করেছেন ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এবং নবুওয়্যত।)

(৪) পবিত্র কোরআনের বিস্ময়কর তত্ত্ব ও তথ্য সমূহ যেমন সূরায়ে নাহলে এরশাদ হয়েছে ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

(তোমার প্রতিপালকের পথে মানুষকে আহবান কর হেকমত ও সদুপদেশ দ্বারা।) এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতেও হেকমত শব্দটি এই একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا

(আর যাকে হেকমত প্রদান করা হয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়।)

ইমাম রাজী (রঃ) বলেছেন শব্দটির উপর গবেষণা করলে দেখা যায় হেকমত শব্দটির ব্যাখ্যা হলো সঠিক জ্ঞান, পবিত্র কোরআনের মর্মবাণী অনুসরণ করে তার উপলব্ধি করা।[১] আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মতে সত্যোপলব্ধির নামই হেকমত। আবার কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, মূলত হেকমত হলো আল্লাহর ভয়, কেননা দ্বীন ইসলামের মূল শিক্ষাই হলো আল্লাহর ভয়। আর কোরআনে করীমে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُ

অর্থাৎ- আল্লাহর বন্দাদের মধ্য থেকে শুধু তত্ত্বজ্ঞানী আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করে। অতএব, প্রকৃত আলেমের বৈশিষ্ট্য হলো তার মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকবে।

হেকমতের ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ পাক কোন কোন মানুষকে এমন একটি দূর-দৃষ্টি দান করেন যা দ্বারা তারা কথায় ও কাজে সঠিক এবং নির্ভুল পথ অবলম্বন করতে পারে, সেই দূর-দৃষ্টির নামই হলো হেকমত। ইমাম তাবারী (রহঃ) তাঁর তফসীরে একথাও উল্লেখ করেছেন যে, কোন কোন আলেমের মতে আলোচ্য আয়াতে হেকমত অর্থ হলো পবিত্র কোরআনের মর্মকথা উপলব্ধি করার ক্ষমতা। তিনি আরও বলেছেন, কোন কোন আলেমের মতে হেকমত অর্থ এলমে দ্বীন। এবনে ওহাব ইমাম মালেক (রঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হেকমতের

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৬৮
তফসীরে তাবারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৬০

তাৎপর্য কি? তিনি বলেছিলেন হেকমতের তাৎপর্য হলো দ্বীন ইসলামের সঠিক পথের পরিচয় লাভ করা।

خَيْرًا كَثِيرًا

যাকে হেকমত দান করা হয় তাকে দুনিয়া আখেরাত দু' জাহানের কল্যাণ দান করা হয়। হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণিত একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ লোকমান তাঁর পুত্রকে নসীহত করে বলেছিলেন, তুমি আলেমদের মজলিসে হাযির হয়ো এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের কথা শ্রবণ করো, কেননা আল্লাহ পাক বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে যেমন মৃত ও শুস্ক যমীনকে জীবন-শ্যামলীমায় ভরপুর করে দেন ঠিক তেমনি তিনি মৃত অন্তরকে হেকমতের নূর দ্বারা পুনঃজীবিত করেন। (বোখারী, মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ শুধু দু' ব্যক্তির সাথে হিংসা করা যায়–

(১) যাকে আল্লাহ পাক ধন-সম্পদ দান করেছেন, সে তা আল্লাহর রাহে বিলীন করে দেয়।

(২) যাকে আল্লাহ পাক হেকমত দান করেছেন, সে সেই হেকমত অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং মানুষকে সেই হেকমতের শিক্ষা দান করে।

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন সমগ্র মানব জাতিকে একত্রিত করবেন। অতঃপর তিনি জ্ঞানী, সত্য-সন্ধানী হক্কানী আলেমদেরকে বাছাই করবেন এবং তাদের সম্বোধন করে বলবেনঃ হে আলেম সমাজ! আমি আমার এলম তোমাদেরকে এজন্যে দান করিনি যে, তোমাদেরকে শাস্তি দেব। অতএব, তোমরা যাও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছি। আর সালাব এবনুল হাকাম থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছেঃ আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন যে, আমি তোমাদেরকে এলম ও হেকমত এজন্যে দান করেছি যেন আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করি।[১]

অতএব, যাদেরকে নবুওয়্যতের এলম দান করা হয় তাদেরকেই হেকমত দান করা হয়। আর যাদেরকে হেকমত দান করা হয় তাদের জন্যেই রয়েছে এ উচ্চ মর্তবা। হযরত মাবীয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক যার কল্যাণ কামনা করেন, তাকে দ্বীন ইসলামের সঠিক জ্ঞান দান করেন। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী

১। তফসীরে রহুল মাআনী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪১

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ আবেদ ব্যক্তির উপর আলেমের ফজিলত এমন যেমন নক্ষত্রপুঞ্জের উপর ১৪ তারিখের চাঁদের ফজিলত রয়েছে। আলেমগণ আম্বিয়ায়ে কেরামের উত্তরাধিকারী আর আম্বিয়ায়ে কেরাম পৃথিবীর কোন প্রকার ধন-সম্পদ রেখে যাননি, বরং তাঁরা দ্বীনী এলম উত্তরাধিকার স্বরূপ রেখে গেছেন। যে এ উত্তরাধিকারকে গ্রহণ করে সে অত্যন্ত বড় ভাগ্যবান (তিরমিযী, আবু দাউদ, এবনে মাজা, মসনদে আহমদ)।

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, দু' ব্যক্তি একজন আবেদ, একজন আলেম। আবেদের উপর আলেমের এমন ফজিলত রয়েছে যেমন তোমাদের একজন সাধারণ লোকের উপর আমার ফজিলত রয়েছে। এরপর এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ্ পাক তাঁর ফেরেশতাগণ এবং আসমান যমীনের বাসিন্দাগণ এমনকি গর্তের অধিবাসী পিপিলীকা এবং পানির মৎস্য পর্যন্ত সে ব্যক্তিদের জন্যে দোয়া করে যারা মানুষকে সৎ কাজের শিক্ষা দেয় (অর্থাৎ যারা মানুষকে দ্বীনের তা'লীম দেয়, আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতি রহমত নাযিল করেন আর সমগ্র সৃষ্টি জগত তাদের জন্যে রহমতের দোয়া করে)।[১] (তিরমিযী শরীফ)

وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ

অর্থাৎ–"বুদ্ধিমান ব্যতীত আর কেউ এতদ্বারা নসীহত হাসিল করেনা"।

যারা বুদ্ধিমান, যারা পরিণামদর্শী, যারা কল্যাণকামী তারাই পবিত্র কোরআনের এই সমস্ত নসিহত গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করে। পক্ষান্তরে যারা ভাগ্যাহত তারা পবিত্র কোরআনের এ নসিহত থেকে হয় বঞ্চিত।

وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ
فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿۲۷۰﴾
اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَ
تُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ
مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۲۷۱﴾ لَيْسَ
عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَا
تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا
ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ
وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿۲۷۲﴾

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৭২

তরজমা

(২৭০) এবং তোমরা যা দান কর অথবা যা মানত কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত এবং জালেমদের জন্যে কোন সাহায্যকারী নেই।

(২৭১) যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান সদকা কর তবে ভাল কথা আর যদি তা গোপনে গরীব দুঃখীকে পৌঁছে দাও তবে তা তোমাদের জন্যে অতি উত্তম এবং তিনি তোমাদের কিছু গুনাহ মাফ করবেন আর আল্লাহ্ পাক তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

(২৭২) (হে নবী!) কাফেরদেরকে হেদায়েত করার দায়িত্ব আপনার নয় কারণ আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত করেন এবং তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করবে তা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের নিজেদেরই উপকারার্থে এবং আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ব্যতীত ব্যয় করোনা। আর যা কিছু তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করবে তা সম্পূর্ণ ভাবে তোমরা প্রাপ্ত হবে আর তোমরা অত্যাচারিত হবে না।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

ইতোপূর্বে আল্লাহ্ পাক উত্তম বস্তু দান খয়রাত করার নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর এরশাদ করেছেনঃ শয়তান তোমাদেরকে অভাবগ্রস্ত হওয়ার ভয় দেখিয়ে তোমাদেরকে দান খয়রাত থেকে বিরত রাখতে চায়। তোমাদেরকে মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। এরপর এরশাদ হয়েছেঃ তোমরা যা কিছু ব্যয় কর না কেন প্রকাশ্যে বা গোপনে, কম বা বেশী অথবা যা কিছু মানত কর সবই আল্লাহ্ পাক জানেন। তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই আর সদকাকারী ব্যক্তির নিয়তই আল্লাহ্ পাকের দরবারে দান গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণ হয়, কেননা কোরআনে করীমে আল্লাহ্ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

আল্লাহ্ পাক তো শুধু পরহেযগার লোকদের তরফ থেকেই কবুল করেন এমনিভাবে কোরআনে করীমে আরও এরশাদ হয়েছেঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ الاية

অর্থাৎ যে একটি কণা মাত্রও নেক আমল করবে তার শুভ পরিণতি অবশ্যই সে দেখতে পাবে। পক্ষান্তরে, যে সামান্যতম মন্দ কাজও করবে তার শোচনীয় পরিণাম সে অবশ্যই ভোগ করবে। আর কেউ তাদের জন্যে এ অবস্থায় সাহায্যকারী হবে না, এরপর এরশাদ হয়েছেঃ

দান সদকা প্রকাশ্যে না গোপনে

সদকা খয়রাত প্রকাশ্যেও দেয়া হয় গোপনেও দেয়া হয়। প্রকাশ্যে দিলে অন্য লোকেরাও দান খয়রাত করতে অনুপ্রাণিত হয় কিন্তু এতে লোক দেখানোর মনোভাব সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে। গোপনে দিলে এ আশংকা থাকেন। হাদীস শরীফে আছে প্রকাশ্যে সদকা কারী উচ্চস্বরে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত কারীর ন্যায়। আর গোপনে সদকা খয়রাতকারী নিম্নস্বরে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত কারীর ন্যায়। এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ এ আয়াত দ্বারা গোপনে সদকা কারীর ফজিলত প্রমাণিত হয়। এরপর তিনি বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত এবং হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এতে প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন নিজের ছায়ায় স্থান দেবেন যেদিন আল্লাহ পাকের ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না।

(১) সুবিচারক রাষ্ট্রনায়ক,

(২) যে যুবক তার যৌবনকে আল্লাহ্‌র এবাদত বন্দেগীকে অতিবাহিত করেছে,

(৩) সে দু' ব্যক্তি যারা শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে একে অন্যকে ভালবেসেছে,

(৪) সে ব্যক্তি যার অন্তরে মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত মসজিদের চিন্তাই থাকে,

(৫) যে ব্যক্তি একাকী আল্লাহ্ পাককে স্মরণ করে এবং ক্রন্দণ করতে থাকে,

(৬) সে ব্যক্তি যাকে কোন সুন্দরী পদ মর্যাদার অধিকারিনী নারী মন্দ কাজের প্রতি আহবান জানায় তখন সে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি।

(৭) সে ব্যক্তি যে নিজে দান খয়রাত এমন গোপন ভাবে দেয় যে তার বাম হাত ডান হাতের দানের খবর রাখে না অর্থাৎ সে দান খয়রাতের কথা অত্যন্ত গোপন রাখে।[১]

এর দ্বারাও একথা প্রমাণিত হয়, যদি গোপনে সদকা খয়রাত করা হয় তবে তাঁর ফজিলত হয় অধিকতর।

তিরমিযী শরীফে এবং মসনদে আহমদে সংকলিত একখানি হাদীসে রয়েছেঃ

لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْاَرْضَ جَعَلَتْ يَمْتَدُّ

আল্লাহ পাক যখন যমীনকে সৃষ্টি করলেন তখন যমীন দুলতে লাগল (কেননা যমীনকে পানির উপর সৃষ্টি করা হয়েছে। পানির ওপর ভাসমান নৌকা যেমন দুলতে

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৯৩

থাকে ঠিক তেমনি যমীন দুলতে থাকল)। তখন আল্লাহ্ পাক বিশাল বিস্তৃত পর্বতমালা সৃষ্টি করে যমীনের উপর বসিয়ে দিলেন তখন যমীন স্থবির হয়ে গেল হাদীসের ভাষায়ঃ

فعجبت الملائكة وقالت يارب هل من خلقك شيئ اشد من الجبال قال نعم الحديد الحديث الخ

তখন ফেরেশতাগণ আশ্চর্যন্বিত হলো এবং বললঃ হে পরওয়ারদেগার! তোমার সৃষ্টিতে পাহাড়ের চেয়েও শক্তিশালী কোন কিছু আছে কি? আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেন ঃ হ্যাঁ আছে আর তা হলো লোহা। ফেরেশতাগণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করলো হে পরওয়ারদেগার! তোমার সৃষ্টিতে লোহার চেয়েও শক্তিশালী কোন কিছু আছে কি? আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেন ঃ হ্যাঁ আছে তা হলো অগ্নি। ফেরেশতাগণ পুনরায় আরজ করলোঃ হে পরওয়ারদেগার! তোমার সৃষ্টি জগতে অগ্নির চেয়েও শক্তিশালী কোন কিছু আছে কি?

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেনঃ হ্যাঁ আছে পানি। ফেরেশতাগণ আবার আরয করলোঃ হে পরওয়ারদেগার! তোমার সৃষ্টিতে পানির চেয়েও শক্তিশালী কোন কিছু আছে কি?

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেনঃ আছে বাতাস।

এরপর ফেরেশতাগণ আরজ করলোঃ হে পরওয়ারদেগার! তোমার সৃষ্টি জগতের মধ্যে বাতাসের চেয়েও শক্তিশালী কোন কিছু আছে কি?

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেনঃ আছে সেই আদম সন্তান যে আল্লাহর রাহে ডান হাতে ব্যয় করে কিন্তু তার বাম হাত তা জানে না অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের সাথে তার এমন ঘনিষ্টতর এবং গভীরতর সম্পর্ক হয় যে সে অতি গোপনে তার যথা সর্বস্ব আল্লাহর রাহে বিলীন করতে এতটুকু কুণ্ঠিত হয় না। এমন ব্যক্তি সৃষ্টি জগতের মাঝে সর্বাধিক শক্তিশালী।

অন্য একখানি হাদীসে এরশাদ হয়েছেঃ উত্তম সদকা হলো গোপনে অভাবগ্রস্ত লোকদেরকে প্রদান করা, অর্থ-সম্পদের স্বল্পতা সত্ত্বেও আল্লাহর রাহে ব্যয় করা।[১]

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তিন ব্যক্তি আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয় ঃ

(১) যে রাত্রে জাগ্রত হয়ে আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করতে থাকে,

(২) যে ডান হাতে আল্লাহর রাহে ব্যয় করে এবং বাম হাত থেকে গোপন রাখে,

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২০

(৩) সে ব্যক্তি যে জেহাদে অংশগ্রহণ করে তার সাথী পরাজিত হয়ে পলায়ন করে কিন্তু সে দুশমনের মোকাবলোয় সুদৃঢ় থাকে।[১] (তিরমিযী শরীফ)

হযরত আবু জর (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ্ পাক তিন ব্যক্তিকে পছন্দ করেন আর তিন ব্যক্তিকে অপছন্দ করেন। যাদেরকে পছন্দ করেন তারা হলেন-

(১) কিছু লোকের নিকট একজন সাহায্য-প্রার্থী হাযির হলো সে ব্যক্তির সঙ্গে এই ব্যক্তির কোন আত্মীয়তার বন্ধন নেই। শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে সাহায্য কামনা করেছে কিন্তু মজলিসের কেউ তাকে সাহায্য করল না, এমনি অবস্থায় এক ব্যক্তি মজলিস থেকে উঠে গেল এবং ঐ সাহায্য-প্রার্থীকে এমন গোপনীয়তার সঙ্গে কিছু দান করল যে আল্লাহ ছাড়া আর ঐ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ জানতে পারল না।

(২) মুসলমানদের একটি দল দুশমনের সাথে যুদ্ধরত ছিল। রাতের শেষ প্রহরে যখন মানুষের কাছে নিদ্রা সর্বাধিক প্রিয় হয় তখন সকলেই নিদ্রার জন্যে যমীনে মাথা রেখে দেয় এমন সময় সেই দলের এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হয়। আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করতে থাকে। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করতে থাকে।

(৩) সে ব্যক্তি যে কোন জেহাদে শরীক হয়, যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তার সাথীরা পলায়ন করে কিন্তু এ ব্যক্তি দুশমনের মোকাবেলায় সে পর্যন্ত সুদৃঢ় হয়ে দণ্ডায়মান থাকে যে পর্যন্ত হয় শাহাদাত বরণ করে অথবা আল্লাহ্ পাক বিজয় দান করেন।

আর যে তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ পাক অপছন্দ করেন তারা হলো-

(১) বৃদ্ধ ব্যাভিচারী,

(২) অহংকারী ভিক্ষুক,

(৩) অত্যাচারী সম্পদশালী ব্যক্তি।

শানে নুযুল

ইমাম শা'বী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে এ আয়াত হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

তাবুকের যুদ্ধের সময় হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের জন্যে মুসলমানদেরকে চাঁদা দিতে বললেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ সাধ্য মোতাবেক আল্লাহর রাহে ব্যয় করার জন্যে অর্থ সম্পদ হাযির করলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর কাছে যা কিছু ছিল তার অর্ধেক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দস্তে মোবারকে পেশ করলেন আর হযরত আবু বকর (রাঃ) যথা সর্বস্ব এনে পেশ করলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে, তিনি তখন জিজ্ঞাসা করলেন,

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৭৪

কি নিয়ে এসেছ? হযরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার যা কিছু ছিল তা সমান দু'ভাগ করে একভাগ আমার সন্তান-সন্ততির জন্যে রেখে এসেছি। আর বাকি অর্ধেক আল্লাহর রাহে ব্যয় করার জন্যে হাযির করেছি। অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে আবু বকর (রাঃ)! আল্লাহর রাহে দেয়ার জন্যে কি এনেছ? হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ আমার যথা সর্বস্ব হাযির করেছি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, পরিবারবর্গের জন্যে কি রেখে এসেছ? হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক রেখে এসেছি। একথা শ্রবণ করে হযরত ওমর (রাঃ) কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি যে কোন কাজের ইচ্ছা যখনই করেছি তখনই আবু বকর সিদ্দিক! আপনাকে অগ্রগামী পেয়েছি (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)।

আলোচ্য আয়াতে যে সদকার কথা বলা হয়েছে তা ফরজ সদকাও হতে পারে বা নফলও হতে পারে তথা যাকাত এবং সর্ব প্রকার সদকা খয়রাতই এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে নফল সদকা গোপনে দান করলে তাতে সত্তর গুণ বেশী সওয়াব পাওয়া যায়, পক্ষান্তরে ফরজ সদকা তথা যাকাত প্রকাশ্যে আদায় করলে তাতে ২৫ গুণ অধিক ফজিলত হাসিল হয়। এরপর তিনি বলেছেন, সদকার বিনিময়ে আল্লাহ পাক তোমাদের গুনাহ-খাতা দূর করে দেবেন। বিশেষতঃ যখন সদকা গোপনে দান করা হয় তাতে অনেক কল্যাণ নিহিত থাকে। দাতার মর্তবা বৃদ্ধি পায়। পবিত্র কোরআনে এ কল্যাণের উল্লেখ এভাবে হয়েছেঃ

وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّاٰتِكُمْ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক সদকা খয়রাতের বরকতে তোমাদের গুনাহ সমূহ দূর করবেন।[১] তিরমিযী শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّ الصَّدَقَةَ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ

নিশ্চয় সদকা খয়রাত পাপাচারের কারণে আল্লাহর গযবের যে অগ্নি সৃষ্টি হয় তাকে নিভিয়ে দেয়।

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২১
খোলাসাতুত তাফাসীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা- ২১১-১২

আর মনে রেখ তোমরা যা কিছু কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক সম্পূর্ণ ওয়াকেফকাল, তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই।

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰهُمْ

(হে রসূল!) কাফেরদের হেদায়েত করতেই হবে এমন দায়িত্ব আপনার নয়, বরং এ কাজটি তো আল্লাহ পাকের, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত দান করেন। আপনার কাজ হলো সত্যের বাণী তাদেরকে পৌঁছে দেয়া। হেদায়েতের তৌফিক কে পাবে আর কে পাবে না এ সিদ্ধান্ত আল্লাহ্ পাকের।

শানে নুযুল

এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শুধু মুসলমানদেরকে দান খয়রাত করার হুকুম দিতেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। এবনে জরীর (রঃ) এ সম্পর্কে আরেকটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মদীনাবাসী আনসারদের অনেক আত্মীয়-স্বজন ইহুদী ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর তারা ইহুদীদেরকে সাহায্য করা বন্ধ করে দিলেন। এ ইহুদীরা ছিল অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত। এ সাহায্যের প্রয়োজন তাদের অত্যন্ত বেশী ছিল। মুসলমানগণ মনে করলেন তাদের সাহায্য দেয়া বন্ধ করলে তারা অবশ্যই ইসলাম কবুল করতে বাধ্য হবে, কিন্তু পবিত্র কোরআনের এ আয়াত তখন নাযিল হলো এবং সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হলো হেদায়েতের সঙ্গে দান খয়রাতের কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ পাক যাকে হেদায়েত করবেন সে-ই হেদায়েত পাবে। অতএব, দান খয়রাত বন্ধ করে হেদায়েত করার পরিস্থিতি সৃষ্টি করা অনুচিত। এবনে আবি শায়বা হযরত সাঈদ এবনে যোবায়েরের (রাঃ)-বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন তিনি বলেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

لا تصدقوا الا على دينكم

অর্থাৎ শুধু মুসলমানদেরকেই দান খয়রাত কর অন্যদেরকে নয় তখন নাযিল হলো-

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰهُمْ

অর্থাৎ যারা আপনার বিরোধিতা করে তাদেরকে দান সদকা বন্ধ করে তাদের ইসলামে প্রবেশের ব্যবস্থা করা আপনার দায়িত্ব নয়। আপনার দায়িত্ব হলো তাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়া। অতঃপর আল্লাহ পাক যাকে তওফিক দান করবেন সে হেদায়েত লাভ করবে আর যাকে তওফিক দেবেন না সে বঞ্চিত হবে।[১]

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৫

ইমাম রাজী (রঃ) তাঁর বিখ্যাত তফসীরে কবীরে এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেনঃ

হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর কন্যা আসমার মাতা নাতিলা এবং তাঁর মাতাসহ উভয়েই আসমার নিকট এসে সাহায্য প্রার্থনা করলো, তারা উভয়েই তখন মুশরেক ছিল। তাই আসমা বললেন আমি এ বিষয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুমতি গ্রহণ না করে আপনাদের কিছু দিতে পারবো না। এরপর তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট মুশরেক আত্মীয়দেরকে দান করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে এ আয়াত নাযিল হয়। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দান সদকা করার অনুমতি দান করেন।[১] কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ অর্থ-সম্পদের লোভে যেন কেউ মুসলমান না হয় এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুসলমান ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে দান খয়রাত করতে নিষেধ করেছিলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। এতে ঘোষণা করা হয় মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষ সকলকেই দান খয়রাত করা যায়।[২]

ইসলামের উদার নীতি

এ আয়াতে ইসলামের উদার নীতি ঘোষিত হয়েছে। দান খয়রাত বা সাহায্য শুধু মুসলমানরাই পাবে অমসুলমানরা বঞ্চিত হবে ইসলাম এমন কথা বলে না; বরং ইসলাম যেহেতু বিশ্ব প্রতিপালকের একমাত্র মনোনীত ধর্ম, বিশ্ব মানবের কল্যাণের জন্যে ইসলামের আবির্ভাব, মানবতা ও সভ্যতার বিকাশ ও উন্মেষ সাধনের লক্ষ্যে ইসলামের যাবতীয় কর্মসূচী, তাই ইসলাম সংকীর্ণতার অনুমতি দেয় না। এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, দান খয়রাত করার জন্যে মুসলমান হওয়া জরুরী নয়, বরং বিপদগ্রস্ত মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে, দুর্গত মানবতার সেবায় যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। মানবতার মান রক্ষা করা, মানুষকে মর্যাদা দেয়া, দুঃখী মানুষের দুঃখ নিবারণ করা মুসলমান মাত্রেরই কর্তব্য, এটিই ইসলামের মহান শিক্ষা। একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় একটি শবদেহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শবদেহটি দেখেই দণ্ডায়মান হলেন। তখন একজন সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এ ব্যক্তি ছিল একজন ইহুদী তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, সে কি মানুষ নয়? এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, ইসলামের দৃষ্টিতে মানবতার মান সর্বোচ্চে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৭৫
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২১

২। তফসীরে কবীর খন্ড-৭,পৃষ্ঠা-৭৬
ফাওয়ায়েদে ওসমানী পৃষ্ঠা- ৫৮

এ আয়াতের তফসীরে হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) লিখেছেন যে, হাদীস শরীফে রয়েছে তোমার খাদ্য যেন মুত্তাকী পরহেযগার ব্যক্তি আহার করে। এই হাদীস আলোচ্য আয়াতের মর্মকথার বিরোধী নয়, কেননা আয়াতে অভাবগ্রস্ত মানুষের সাহায্যের কথা রয়েছে আর উল্লেখিত হাদীসে দাওয়াতের খাবারের কথা রয়েছে। দাওয়াতের খাবার আর প্রয়োজনের খাবার আদৌ এক নয়। দ্বিতীয়তঃ এ পর্যায়ে হযরত থানবী (রহঃ) একথাও লিখেছেন 'কাফের' মুশরেকদের দান করার অনুমতি রয়েছে কিন্তু যে কাফের মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধরত তাকে দান খয়রাত করা জায়েয নয়।

তৃতীয়তঃ হযরত থানবী (রহঃ) আরও লিখেছেন কাফেরকে দান খয়রাত করা জায়েয কিন্তু যাকাতের অর্থ প্রদান করা জায়েয নয়। আলোচ্য আয়াতে সাধারণ দান খয়রাতের কথাই বলা হয়েছে। হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) আরও বলেছেন আলোচ্য আয়াতে একথার শিক্ষা রয়েছে যে হেদায়েতের ব্যাপারে কারো পেছনে লেগে যাওয়া উচিত নয় যেমন আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে কাফেরদেরকে সদকা না দিলে অভাবগ্রস্ত হয়ে তারা হয়ত ইসলাম কবুল করবে এমন তদবীর করার কোন প্রয়োজন নেই।[১] শুধু তাদের কাছে সত্যের বাণী পৌঁছে দেয়াই যথেষ্ট, কেননা আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ

হেদায়েত শুধু আল্লাহর হাতে

কিন্তু আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত করবেন। অর্থাৎ আল্লাহর রসূলের মহান দায়িত্ব হলো তবলীগ তথা আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়া। এরপর হেদায়েতের তওফিক কে পাবে আর কে পাবেনা তা শুধু আল্লাহর পাকের মর্জির উপরই নির্ভরশীল যেমন কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পিতৃব্য আবু তালেবের মৃত্যুর সময় তাকে তিনি বললেনঃ চাচা! একবার অন্ততঃ আপনি আমাকে শুনিয়ে কলেমা তাইয়্যেবা পাঠ করুন এবং আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপনের সুযোগ গ্রহণ করুন। ঈমান যদি থাকে আমলের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আমি আরযী পেশ করে ইনশাআল্লাহ একটা ব্যবস্থা করব। এদিকে আবু তালেবের জীবন সায়াহ্নে আবু জেহেল তার পাশে ছিল সে তাকে বললঃ জীবনে পূর্ব পুরুষদের ধর্মকে আঁকড়ে ছিলে আর আজ মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে কি তা বর্জন করবে?

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১১৪

এমনি অবস্থায় আবু তালেবের আর কলেমা পাঠ করা হয়নি। সে কাফের অবস্থায়ই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন আবু তালেবের জন্যে অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। কেননা, পিতামহ আবদুল মোত্তালেবের এন্তেকালের পর শৈশবে আবু তালেবই তাঁর দেখাশুনা করেছেন। এতদ্ব্যতীত, নবুওয়্যত লাভের পর যখন সমগ্র আরব প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রাণের শত্রু হয়ে গেল তখন আবু তালেব কাফের হওয়া সত্ত্বেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহায্যকারী হিসেবে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবু তালেবের পরকালের চিন্তায় অত্যন্ত ব্যাকুল হলেন। তখন উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ করলেনঃ হে রসূল! আপনি যাকে অত্যন্ত ভালবাসেন তাকে হেদায়েত করতে পারবেন না, কেননা আল্লাহ্ পাকের তওফিক ব্যতীত কেউ হেদায়েত লাভ করতে পারেনা। আর হেদায়েতের তওফিক আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা এবং মর্জির উপরই নির্ভর করে। এজন্যে মাওলানা রুমী (রঃ) বলেছেনঃ

بلال از حبش صهیب ازروم حسن زبصری است بوجهل که درمکه بود
این چه بوا لعجبیست-

(হযরত বেলাল (রাঃ) আবিসিনিয়া থেকে, সোহায়েব (রাঃ) রোম থেকে এবং হাসান বসরা থেকে এসে ইসলাম কবুল করেছেন অথচ আবু জেহেল মক্কায় থেকেও বঞ্চিত হয়েছে)

در ازل آنرا بهبودے نبود
در دیدن نبی سودے نبود

মূলত সৃষ্টির প্রথম দিনে এদের তকদীরে কল্যাণ লিপিবদ্ধ হয়নি। তাই আল্লাহর নবীর দীদার লাভ করেও তারা উপকৃত হতে পারেনি।

কেননা হেদায়েত আল্লাহ্ পাকের মর্জি এবং অনুমতি ব্যতীত লাভ করা যায় না। কোরআনে করীমের সূরা ইব্রাহীমের প্রথম আয়াতেও রয়েছে এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত। এরশাদ হয়েছেঃ

الٓرٰ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ

"আলীফ-লাম-রা। এই কিতাব, (হে রসূল!) আপনার নিকট এজন্যে নাযিল করেছি যেন আপনি গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন মানুষকে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসেন তাদের প্রতিপালকের অনুমতি ক্রমে"। এ আয়াতে بِاِذْنِ رَبِّهِمْ বাক্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। 'ইজিন' শব্দটির অর্থ অনুমতি তথা আল্লাহ পাকের অনুমতি ব্যতীত হেদায়েত লাভ করা কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয় যেমন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এ দোয়া করেছিলেনঃ "হে আল্লাহ! ওমর অথবা আবু জেহেলকে ইসলাম কবুল করার তওফিক দিয়ে ইসলামকে শক্তিশালী করুন"।

আল্লাহ পাক এ দোয়া কবুল করলেন হযরত ওমর (রাঃ)-এর পক্ষে।

আবু জেহেল হেদায়েত থেকে বঞ্চিতই রয়ে গেল। এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, হেদায়েত লাভ করে জীবনকে ধন্য করা আল্লাহ পাকের মর্জি ব্যতীত সম্ভব নয়, আর একথাটিই ঘোষিত হয়েছে এ আয়াতেঃ

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ

এজন্যেই তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন- ইসলামের নেয়ামত লাভ করার জন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে শোকর গুজার হওয়া মুসলমান মাত্রেরই কর্তব্য।

ادمیت دادئی بازم مسلمان کردئی

اے خداقربان شوم احسان براحساں کردئی

(প্রথমে মানুষ রূপে জন্ম গ্রহণ করার, অতঃপর মুসলমান হওয়ার তওফিক দান করেছ। হে আল্লাহ! তোমার নামে জান কোরবান, তুমি অনন্ত অসীম নেয়ামত দান করেছ, এহসানের পর এহসান করেছ।)

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ

আর তোমরা আল্লাহর রাহে যা কিছু ব্যয় কর তা শুধু তোমাদের নিজেদের উপকারার্থেই কর, কেননা দান খয়রাতের শুভ পরিণতি বা সওয়াব তোমরাই লাভ করবে। অতএব, দানের পর গ্রহীতার প্রতি কোন প্রকার অনুগ্রহ প্রকাশ করোনা বা অনুগ্রহ করেছ বলে চিন্তাও করোনা। এমনিভাবে অবৈধ পন্থায় উপার্জিত সম্পদও আল্লাহর রাহে দান করোনা। আর লোক দেখানোর জন্যে দান করোনা; বরং

وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ

আর যা কিছু তোমরা দান খয়রাত কর তা শুধু এবং শুধু এক আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যেই কর, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। আর আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য যা কিছু দান খয়রাত করবে তার পূর্ণ বিনিময় তোমাদেরকে যথা সময়ে পরিপূর্ণভাবে প্রদান করা হবে। আর তোমাদের প্রতি কোন প্রকার জুলুম করা হবে না অর্থাৎ প্রাপ্য সওয়াব থেকে এতটুকুও কম করা হবে না। এতে একথা ঘোষণা করা হলো যে যদি দাতার উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হয় তবে সে অবশ্যই তার দানের পূর্ণ সওয়াব লাভ করবে। গ্রহীতা নেককার হোক বা বদকার, মুসলমান হোক কি অমুসলিম তাতে সওয়াবের ব্যাপারে কোন পার্থক্য করা হবে না। এ পর্যায়ে বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন আল্লামা এবসে কাসীর (রহঃ)।

এক ব্যক্তি ইচ্ছা করল আজ রাত্রে কিছু দান সদকা করবে। রাত্রিকালে সে কিছু অর্থ-সম্পদ নিয়ে বের হলো এবং অতি গোপনে একজন স্ত্রীলোককে দিয়ে চলে আসল। সকালে মানুষের মধ্যে এই আলোচনা হলো যে আজ রাতে কোন ব্যক্তি একজন চরিত্রহীন স্ত্রীলোককে দান খয়রাত করেছে। সে একথা শ্রবণ করে আল্লাহর শোকর আদায় করল এবং মনে মনে সংকল্প করল আজ রাতে আবার সদকা করব এবং তাই করল। পরের দিন সকালে সে নিজেই শ্রবণ করল, লোকেরা আলোচনা করছে যে আজ রাতে কোন ব্যক্তি একজন সম্পদশালী লোককে দান খয়রাত করে গেছে। সে ব্যক্তি পুনরায় আল্লাহ্ পাকের হাম্‌দ বর্ণনা করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল এবং ইচ্ছা করল আজ রাতে পুনরায় সদকা করবে। রাত্রিকালে অতি গোপনে এক ব্যক্তিকে কিছু দান করল, পর দিন সকালে জানতে পারল যাকে সে রাতে দান করেছে সে ছিল চোর। একথা শ্রবণ করেও সে আল্লাহর প্রশংসা করল। পরবর্তী রাত্রে স্বপ্নে দেখল একজন ফেরেশতা তাকে বলছেঃ তোমার তিন দিনের সদকাই আল্লাহ্ পাকের দরবারে কবুল হয়েছে হয়তো সে চরিত্রহীন স্ত্রীলোকটি ধন-সম্পদ পাওয়ার কারণে মন্দ কাজ থেকে বিরত হবে এবং সম্পদশালী ব্যক্তি তোমার দান পেয়ে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং সেও আল্লাহর রাহে দান করতে অভ্যস্ত হবে। আর হয়তো চোর এ ধন-সম্পদ পাওয়ার পর চুরির মত মন্দ কাজ থেকে বিরত হবে।[১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২১-২২

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ
سَبِيْلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ ۫ يَحْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ
لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ
فَاِنَّ اللهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٢٧٣﴾ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ
بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٧٤﴾

তরজমা

(২৭৩) এবং দান খয়রাত সে সব ফকিরদের জন্যে যারা আল্লাহ পাকের পথে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। তারা যমীনে চলাফেরা করতে পারেনা, তারা কিছু চায় না বলে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে ধনী মনে করে। তুমি তাদের চেহারা দেখে চিনতে পার তারা মানুষের কাছে নাছোড় বন্দা হয়ে সওয়াল করেনা, আর তোমরা যা কিছু দান কর নিশ্চয় আল্লাহ পাক সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল।

(২৭৪) যারা দিনে রাতে গোপনে প্রকাশ্যে আল্লাহ পাকের পথে ব্যয় করে, তাদের পালনকর্তার নিকট রয়েছে তাদের জন্যে পুরস্কার এবং তাদের কোন ভয় নেই, আর তারা চিন্তিত হবে না।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহর রাহে দান করার উদ্দেশ্য এবং প্রকাশ্যে বা গোপনে কিভাবে দান করা হবে তার বিবরণ ছিল। আলোচ্য আয়াতে কাকে দান করা হবে তার বিবরণ রয়েছে। যারা আল্লাহর পথে জেহাদের কারণে অথবা এলম হাসিলের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে অর্থকরী কোন কাজে শরীক হতে পারেনা অথচ নিজের প্রয়োজনের কথা কারো কাছে প্রকাশও করেনা এমন লোকদেরকে দান খয়রাত করলে অধিকতর সওয়াব পাওয়া যায়।

আসবাবে সোফ্‌ফা

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে প্রায় চারশত সাহাবায়ে কেরাম আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে নিঃস্ব-হৃতসর্বস্ব অবস্থায় একত্রিত হয়েছিলেন। তাঁদেরকে আসহাবে সোফফা বলা হতো, তাঁরা ইসলাম গ্রহণের পর অত্যাচারিত-উৎপীড়িত হয়ে নিজেদের ভিটা-মাটি ছেড়ে এক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মহান উদ্দেশ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়েছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করা এবং সেই জ্ঞানের বিতরণ করা এবং ইসলামের জন্যে, সত্যের জন্যে, মানবতার বৃহত্তর কল্যাণের তাগিদে জেহাদ করাই ছিল তাঁদের কাজ. তাঁরা এক মুহূর্তের জন্যেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে দূরে থাকতে রাজী হতেন না। কোরআন হেফজ করা এবং দ্বীনের এলম হাসিল করার মধ্যেই তাঁরা নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখতেন। ফলে অর্থ সর্ম্পদ আয় রোজগারের কোন সময় তারা পেতেন না। তাঁরা দারিদ্র প্রপ্রীড়িত অবস্থায় দ্বীন গুজরান করতেন, তাঁদের চেহারায় দারিদ্রের কষাঘাতের ছাপ পরিদৃষ্ট হতো, দেহ হতো জীর্ণ শীর্ণ, চেহারার রং হতো ফ্যাকাশে কিন্তু এতদসত্তেও তাঁরা কারো কাছে সাহায্যপ্রার্থী হতেন না। এমন লোকদেরকে দান করার জন্যে আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে তাগিদ করা হয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, এবনে মুঞ্জের হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) একটি কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, তাঁরা হলেন আহলে সোফ্‌ফা, তাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে পড়ে থাকতেন, তাঁদের সংখ্যাও ছিল প্রায় চারশত, তাঁরা ছিলেন নিঃস্ব, মোহাজের এবং অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় তাঁরা ছিলেন, মদীনা শরীফে তাঁদের কোন বাড়ী-ঘর ছিল না। কোন আত্মীয়-স্বজনও ছিল না। তাঁরা সর্বদা মসজিদেই থাকতেন। সর্বক্ষণ আল্লাহর এবাদত অথবা শরীয়ত মা'রেফাতের জ্ঞান অন্বেষণে মশগুল থাকতেন কখনো কখনো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে জেহাদেও প্রেরণ করতেন। আল্লাহ্ পাক এমন লোকদেরকে সাহায্য করার জন্যে আলোচ্য আয়াতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। মদীনাবাসী সাহাবায়ে কেরাম যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। হযরত জোবায়ের এবনে আওয়াম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের মধ্য থেকে কেউ রজ্জু নিয়ে জঙ্গলে যায় এবং কাঠ কেটে বাজারে এনে বিক্রয় করে এবং এতদ্বারা নিজের ইজ্জত সম্মান রক্ষা করে তবে তা মানুষের নিকট সাহায্য প্রার্থনার চেয়ে উত্তম। (বোখারী শরীফ)

হযরত এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাল্লাম মিম্বরে তশরীফ রেখেছিলেন এবং মানুষের কাছে চাওয়া থেকে আত্মরক্ষার কথা এরশাদ করছিলেন, সেই সময় তিনি একথাও এরশাদ করেছিলেন যে, উপরের হাত তথা দাতার হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম (হাদীসের সমস্ত কিতাবে সংকলিত)।

ভিক্ষাবৃত্তির পরিণাম

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি কোন ব্যক্তি মানুষের কাছে কিছু চায় অথচ তার কাছে কিছু পরিমাণ সম্পদ থাকে তাহলে কেয়ামতের দিন মানুষের কাছে চাওয়ার কারণে তার মুখমণ্ডলে এক প্রকার জখম থাকবে। তখন আরজ করা হলো ইয়া রসূলাল্লাহ! কতখানি সম্পদ হলে কোন লোককে মানুষের কাছে চাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে? তিনি এরশাদ করলেনঃ পঞ্চাশ দেরহাম বা এই মূল্যের স্বর্ণ। (আবু দাউদ, তিরমিযী, এবনে মাজা)

হযরত সাহল এবনে হানজালা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মানুষের নিকট ভিক্ষা করে অথচ ধনী হওয়ার মত সম্পদ তার কাছে থাকে সে নিশ্চয় নিজের জন্যে অগ্নির মাত্রা বৃদ্ধি করতে চায়। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল এ অবস্থার জন্যে কত পরিমাণ সম্পদের মালিক হতে হবে? তিনি এরশাদ করলেন, যদ্বারা সকাল সন্ধ্যার আহারের ব্যবস্থা হয়। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেনঃ এ পরিমাণের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে তবে একথা সত্য যে আজকের খাবারের ব্যবস্থা যার আছে আর আগামী কালও পাওয়ার ব্যবস্থা আছে তার জন্যে ভিক্ষা করা বৈধ নয় কিন্তু যদি আগামী কাল পাওয়ার কোন আশা না থাকে তবে তার জন্যে ভিক্ষা করা জায়েয বা বৈধ।

এতে একথা প্রমাণিত হয় ইসলামে ভিক্ষা বৃত্তি অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ, এজন্যেই ওলামায়ে কেরাম এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করেছেন। কোন ব্যক্তির যে পর্যন্ত আগামী কালের আহারের কোন ব্যবস্থা না হয় তখন কারো কাছে চাওয়া তার জন্যে বৈধ হয়। অবশ্য খাদ্য-দ্রব্য ব্যতীত প্রয়োজনীয় পোষাকের জন্যে সাহায্য কামনার অনুমতি রয়েছে, আর যদি কারো কাছে ৪০ দেরহাম বা তার সম পরিমাণ অর্থ থাকে তবে তার জন্যে অন্যের কাছে কোন কিছু চাওয়াই বৈধ নয়।[১]

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৭৯

অর্থাৎ তোমরা যে ধন-সম্পদ আল্লাহর রাহে দান করবে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক সম্পূর্ণ অবগত।

এ আয়াতে আল্লাহর রাহে দান করার জন্যে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। বিশেষতঃ পূর্ববর্তী আয়াতে যাদের উল্লেখ রয়েছে তাদেরকে দান করার বিশেষ তাগিদ রয়েছে আর একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে তোমাদের দান সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক সম্পূর্ণ অবগত। অতএব, তোমাদের দান বিনষ্ট হবে না, বিনা দ্বিধায় তোমরা আল্লাহর রাহে দান করতে থাক।

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ - الايه

অর্থাৎ যারা আল্লাহর রাহে সর্বদা গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করতে থাকে, যখনই তাদের নিকট কোন দারিদ্র-পীড়িত মানুষ সাহায্য প্রার্থী হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে তারা সাহায্য করে সময় বা অবস্থার অজুহাতে বিলম্ব করেনা, তাদের সওয়াব বা শুভ পরিণতি সুনিশ্চিত। তাদের কোন ভয় নেই, তারা চিন্তিতও হবে না।

শানে নুযুল

এবনে মুনজের (রঃ) হযরত সাঈদ এবনুল মোসাইয়্যেব (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত আবদুর রহমান এবনে আওফ (রাঃ) এবং হযরত ওসমান (রাঃ) সম্পর্কে। যখন তাঁরা তাবুকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী মুজাহেদদের সাহায্য করেছেন।

এবনে জরীর, আবদুর রাজ্জাক, এবনে আবি হাতেম এবং তেবরাণী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে এ আয়াত হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। হযরত আলীর (রাঃ)-এর নিকট চারটি দেরহাম ছিল তিনি একটি দেরহাম রাত্রে, একটি দিনে, একটি প্রকাশ্যে, একটি গোপনে দান করেছিলেন।

আল্লামা বগবী হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর আরেকটি কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যখন এ আয়াত-

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا

নাযিল হয় তখন হযরত আবদুর রহমান এবনে আওফ (রাঃ) আসহাবে সোফ্ফাকে অনেক স্বর্ণ মুদ্রা প্রেরণ করেন, আর হযরত আলী (রাঃ) প্রেরণ করেন অনেক খেজুর, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। আল্লামা বগবী হযরত আবু উমামা (রাঃ) এবং হযরত আবু দরদার (রাঃ) উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে এ আয়াত তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যারা আল্লাহর রাহে জেহাদের উদ্দেশ্যে অশ্ব পালন করতেন এবং রাত

দিন গোপনে ও প্রকাশ্য এ অশ্বগুলোকে খাবার দিতেন। যাহোক, আয়াতের শানে নযুল বিভিন্ন হতে পারে তবে এর মর্মকথা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ইসলামের প্রচার প্রসারে বা দারিদ্র-পীড়িত মুসলমানদের সাহায্যে অনেক সওয়াব রয়েছে।

দান খয়রাতের ফজিলত

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ প্রত্যহ সকালে দুজন ফেরেশতা আসমান থেকে অবতরণ করে তন্মধ্যে একজন দোয়া করেঃ হে আল্লাহ! যে (তোমার রাহে) ব্যয় করে তাকে বিনিময় দান কর আর দ্বিতীয় ফেরেশতা দোয়া করে, হে আল্লাহ! যে সম্পদ ব্যয় করা থেকে বিরত থাকে তার অর্থ সম্পদ ধ্বংস কর। (মেশকাত শরীফ)

হযরত আবু ওমর (রাঃ) থেকে অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ হে আদম সন্তান! তোমার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে সম্পদ রয়েছে তা আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ব্যয় কর এ কর্মপন্থা তোমার জন্যে হবে উত্তম। আর যদি তা তুমি ধরে রাখ তবে তা হবে তোমার জন্যে মন্দ। (মুসলিম শরীফ)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি আমার নিকট ওহোদ পাহাড়ের সমান স্বর্ণ হতো তবে আমার নিকট এ বিষয় অত্যন্ত অপছন্দনীয় যে তিন দিন পর্যন্ত সেই স্বর্ণের কিছু মাত্র আমার নিকট থাকে। হ্যাঁ যদি কিছু ঋণ আদায়ের প্রয়োজন হয় তবে তা থাকতে পারে। ওহোদ পাহাড় মদীনা শরীফের উপকণ্ঠে অবস্থিত একটি বিরাট পাহাড়, সে পাহাড়ের সমান স্বর্ণও যদি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আসতো আর তা তিনি মাত্র তিন দিনের মধ্যে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দারিদ্র-পীড়িত মানুষের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। অর্থাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পদের মওজুদদারী আদৌ পছন্দ করতেন না। অর্থ সম্পদকে শুধু প্রয়োজন পূরণে ব্যবহার করতেন, তাঁর ভরসা ছিল এক আল্লাহর প্রতি।

অতএব, দুনিয়ার সম্পদের প্রতি তিনি কখনো দৃষ্টিপাত করেননি। তাঁর দৃষ্টি সর্বদা নিবদ্ধ থাকতো এক আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের প্রতি, এটিই তাঁর মহান আদর্শ, এটিই তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে তাঁর মহান শিক্ষা। মুসলিম জাতি যত দিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ মহান শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল শুধু ততদিনই তাদের মাথায় সম্মানের মুকুট শোভা পেয়েছিল। সম্পদের চাবি তাদের হাতে ছিল, এই বিশ্বের এক বিরাট অংশ তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। আজ অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে, সম্পদের মায়া মুসলমানদের

অন্তরে অনেক বেড়ে গেছে, আল্লাহর প্রতি ভরসা, আল্লাহর প্রতি ভালবাসা অপেক্ষাকৃত অনেক কমে গেছে। তাই পবিত্র কোরআনের ধারক ও বাহক হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুসলিম জাতির দুর্দিন। এ অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে শুধু আল্লাহর প্রতি ঈমান ও ভরসা সুদৃঢ় করণের মাধ্যমে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে, আর এ গুণ অর্জন করা সম্ভব হলে আল্লাহর রাহে দান করা সহজ হবে, যা এ আয়াতের মূল বক্তব্য।

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ
مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ
وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧٥﴾
يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ﴿٢٧٦﴾

তরজমা

(২৭৫) যারা সুদ গ্রহণ করে তারা কবর থেকে (কেয়ামতের দিন) সে ব্যক্তির ন্যায় উঠবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা মতিচ্ছন্ন করে দেয় (যে বিবেক বুদ্ধি বিলুপ্ত, পাগল) এজন্যে যে, তারা বলে ব্যবসাতো সুদের ন্যায়ই অথচ আল্লাহ পাক ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। অতএব, যার নিকট তার পালনকর্তার উপদেশ আসে আর সে উক্ত উপদেশ অনুযায়ী (সুদ থেকে) বিরত থাকে তবে যা অতীতে হয়েছে সবই তার রইল আর তার ব্যাপার সম্পূর্ণ আল্লাহ পাকের এখতিয়ারে। পক্ষান্তরে, যারা পুনরায় সুদ গ্রহণ করবে তারাই হবে দোযখবাসী এবং তারা চিরদিন তাতে থাকবে।

(২৭৬) আল্লাহ পাক সুদকে ধ্বংস করে দেন এবং দান খয়রাতকে বৃদ্ধি করেন আর আল্লাহ পাক অকৃতজ্ঞ পাপীষ্ঠদেরকে আদৌ পছন্দ করেন না।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতে সুদখোরীর শাস্তি এবং সুদখোরের শোচনীয় পরিণাম সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে সে সব নেককার লোকদের কথা উল্লেখিত হয়েছে যারা আল্লাহর রাহে দান খয়রাত করে, নিয়মিত যাকাত আদায় করে, দারিদ্র-পীড়িত মানুষ বিশেষ করে গরীব আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে। আর এ আয়াতে সে সব লোকদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে যারা মানুষের উপকার করা তো দূরের কথা বরং মানুষের প্রতি জুলুম অত্যাচার করে, তাদের থেকে সুদ গ্রহণ করে- এদের পরিণাম হবে অত্যন্ত বিপজ্জনক। সুদখোর লোকেরা কবর থেকে উঠবে পাগলের ন্যায় যারা জ্বীনগ্রস্ত হয় তাদের যে অবস্থা হয় সে অবস্থা হবে। এ শাস্তির কারণ এই যে, তারা একটি ভিত্তিহীন কথা বলত তা হলো, "সুদ ব্যবসারই অনুরূপ"। অথচ কথাটি আদৌ সত্য নয়, কেননা আল্লাহ পাক ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম ঘোষণা করেছেন। ব্যবসায়ে দশ টাকায় ক্রয় করা কোন বস্তু যদি পনের টাকা বিক্রয় হয় তবে তা সেই বস্তুটির বিনিময়ই হয় বাড়তি টাকা লাভ হিসেবে পরিগণিত হয়। পক্ষান্তরে, সুদের ক্ষেত্রে যে লাভ তা কোন কিছুর বিনিময়ে নয়, তাই সুদ অবৈধ বা হারাম। সুদখোরীর শাস্তি বর্ণনাতীত। অতএব, সুদ চির নিন্দনীয়, চির বর্জনীয়।

সুদ প্রথার ভয়াবহ পরিণাম

সুদ প্রথার বিলোপ সাধনের জন্যে তথা দুঃখীজনের দুঃখ দূর করতে আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অক্লান্ত সাধনা করেছেন। কেননা বর্বরতার যুগে আরব দেশে সুদের কারবার ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল। সুদখোরের অত্যাচার উৎপীড়নে যখন দারিদ্র-পীড়িত মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত ছিল, সুদখোর তার টাকা আদায়ের পূর্বে মৃত দেহের সৎকারেও যখন বাঁধা দিত, সুদ আদায় করলেও হয়ত চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আদায় সম্ভব হয়নি, ২০০ টাকা ঋণ করে বিভিন্ন সময়ে একাধিক কিস্তিতে ২০০ টাকাই হয়ত আদায় হয়েছে কিন্তু সুদাসলে পুনরায় আরও অনেক টাকা জমা হয়েছে যা পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি এজন্যে আজ শবদেহের মাথায় আঘাত করে হলেও সুদখোর তার পাওনা উসুল করবে এই তার সংকল্প। এতীমদের বিলাপ কান্না, বিধবার অসহায় অবস্থা কিংবা শোকাহত আত্মীয়-স্বজনের প্রতিশ্রুতি-এর কোন কিছুই সুদখোরের পাষাণ হৃদয়ে এতটুকু রেখাপাত করেনা। সে মৃত ব্যক্তির ভিটা মাটি দখল করবে। এতিম অনাথ বিপদগ্রস্তদেরকে তাদের ভিটা-মাটি থেকে উচ্ছেদ করবে। তার মনে অন্ততঃ আজকের এ চরম দুঃখের দিনেও কোন দয়ার উদ্রেক হলোনা, শেষ পর্যন্ত সুদখোরের সংকল্প বাস্তবায়িত হলো, পিতৃ হারা সন্তান, স্বামী হারা স্ত্রী, অসহায় নিরুপায় হয়ে ঘর-বাড়ী হারা হলো। কত করুণ ও মর্মন্তুদ এ দৃশ্য! কোন মানুষের পক্ষে কি এ অবস্থা বরদাশ্‌ত করা সম্ভব হয়? সুদখোরের এ অত্যাচার এবং সুদখোরীর এ বীভৎস চেহারা অহরহ দেখা যায় শুধু

সেই আইয়ামে জাহেলিয়াতেই নয়, বরং আধুনিক সভ্যতার এই পরম গৌরবময় যুগেও এমন অমানুষিক ঘটনার অভাব নেই। মূলতঃ বিশ্ব সভ্যতায় পবিত্র কোরআনের কি অবদান তার মূল্যায়ন করতে হলে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রকে এ বিষয়টির প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে। কেননা পবিত্র কোরআনের তা'লীম, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তবলীগ অভিশপ্ত সুদ প্রথার মূলোৎপাটন করেছিল। মানুষ এ অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছিল। এ সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কয়েকটি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তিনি এরশাদ করেছেন, সুদখোর ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সুদখোর সুদ দাতা উভয়ের উপরই আল্লাহ পাকের অভিশাপ পতিত হোক।

হযরত সামুরা এবনে জুন্দব (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মে'রাজের রাত্রে আমি দেখতে পেলাম একটি রক্তের নদী প্রবাহিত। তন্মধ্যে জনৈক ব্যক্তি হাবুডুবু খাচ্ছে। লোকটি সাঁতরে নদীর তীরে আসছিল কিন্তু তীরে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তি তার প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করে তাকে পুনরায় নদীর মধ্যখানে তাড়িয়ে দিচ্ছিল। এ অবস্থা অব্যাহত রয়েছে দেখে আমি জিব্রাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম এ কোন্ ব্যক্তি? জিব্রাঈল (আঃ) জবাব দিলেনঃ এ ব্যক্তি আপনার সুদখোর উম্মত।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ চার ব্যক্তিকে বেহেশতে প্রবেশ করতে না দেয়া আল্লাহর হক্ব বা দায়িত্ব। (১) নিত্য মদ্যপায়ী (২) সুদখোর (৩) এতিমের মাল আত্মসাত কারী (৪) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যখন কোন অঞ্চলে সুদ ও ব্যাভিচার ব্যাপক ভাবে চলতে থাকে তখন সেই অঞ্চলের জন্যে আল্লাহ পাকের গজব নাযিল হওয়া হালাল হয়ে যায় (এজন্যে গজব আসতেও থাকে)।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের পূর্বে সুদখোরী, মদ্যপান এবং ব্যাভিচার অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে।

হযরত যাবের এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ সুদখোর, সুদদাতা এবং সুদ সম্পর্কীয় লেখক ও সাক্ষী সকলেই সমান অপরাধী। আল্লাহ পাক সকলের উপরেই লা'নত করুন। কেউ কেউ বলেন অর্থ সম্পদ ব্যবসায়ীকে লগ্নি দিয়ে যথেষ্ট লাভ করে,

অতএব সে যদি শতকরা ৬/৭ টাকা হারে সুদ আদায় করে তাতে কি অন্যায় হতে পারে! এমন সহজ যুক্তি অনেক ক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয় কিন্তু তারা এ সত্য বেমালুম ভুলে যায় যে ব্যবসায়ে শুধু মুনাফাই হয় না, কখনো কখনো ব্যবসায়ে ক্ষতিও হয়। যদি মুনাফার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সুদের যৌক্তিকতা পরিলক্ষিত হয় তবে একথা জিজ্ঞাস্য যে, যখন ব্যবসায়ে ক্ষতি হয় তখন সুদখোর কি সেই ক্ষতির অংশীদার হবে? এতদ্ব্যতীত সুদপ্রথা হলো পুঁজিবাদের রাজপথ। এ রাজপথেই পুঁজিবাদের আমদানী হয়। তাই সুদখোরীর মাধ্যমে মানবতার কণ্ঠরোধ করা হয়। বস্তুতঃ কোন ব্যক্তি যে পর্যন্ত মানবতাকে বিসর্জন না দেবে সে পর্যন্ত সে সুদখোর হতে পারে না। কারণ দরিদ্র মানুষের সমাধির ওপরেই গড়ে ওঠে সুদখোরের সাধের সৌধ।

অতএব, মানবতার বৃহত্তর কল্যাণের খাতিরে এবং সভ্যতার বিকাশের প্রয়োজনেই সুদ প্রথা বর্জন করতে হবে। ব্যবসা সুদের ভিত্তিতে না করে যদি শরীকি ভিত্তিতে করা হয় তথা পুঁজি যে বিনিয়োগ করবে সে তার লভ্যাংশের নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্রহণে যদি সন্তুষ্ট থাকে এবং ক্ষতি হলে তাতেও যদি অংশীদার হয় তবে পুঁজি বিনিয়োগে কোন অসুবিধা হয় না এবং সুদখোরী থেকেও আত্মরক্ষা করা হয়। সুদখোরীর যে ভয়াবহ পরিণাম পবিত্র কোরআনে এবং হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে তার প্রতি লক্ষ্য করে এমন জঘন্য অপরাধ থেকে আত্মরক্ষা করা পরিণামদর্শী মানুষ মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ শবে মে'রাজে আমি এমন সব লোক দেখেছি যাদের পেট সাপে পরিপূর্ণ কক্ষের ন্যায় ছিল, আর পেটের বাইরে থেকেই সাপ দেখা যাচ্ছিল। আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করলাম এরা কারা? জিব্রাঈল জবাব দিল ঃ এরা সুদখোর লোক। (আহমদ, এবনে মাজা)

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) তাঁর তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) একটি কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন কেয়ামতের দিন যেহেতু সুদখোররা পাগল অবস্থায় হাযির হবে তাই তারা অতি সহজেই সুদখোর বলে পরিচিত হবে।[১]

এ পর্যায়ে হযরত আওফ এবনে মালিক বর্ণিত হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ এমন গুনাহ্ থেকে দূরে থাক যা মাফ করা হবে না, যেমন আমানতে খেয়ানত। কেননা যে আমানতে খেয়ানত করবে সে খেয়নত করা বস্তু নিয়ে কেয়ামতের দিন হাযির হতে বাধ্য থাকবে। এমনিভাবে সুদখোরী, কেননা সুদখোর কেয়ামতের দিন পাগল অবস্থায় হাযির হবে।[২]

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা- ৮২-৮৩
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৩

হযরত যাবের (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস বোখারী শরীফে সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সুদ গ্রহীতা এবং দাতা উভয়ের প্রতি লা'নত করেছেন। আবু দাউদ এবং তিরমিযী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে এবং এ মর্মেরই আরেকখানি হাদীস হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, যা মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে। তাতে এ বাক্যটি সংযোজিত হয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম লা'নত করেছেন সুদের লেখকের উপর এবং সুদের সাক্ষীর উপর।[১] হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যখন সূরা বাকারার শেষ দিকের আয়াত সমূহ নাযিল হলো (সুদ হারাম হওয়া সম্পর্কে) তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে আগমন করে এ আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করলেন এবং সুদের ব্যবসাকে হারাম ঘোষণা করলেন।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে এমন পাপ কার্য থেকে আত্মরক্ষা কর যার ক্ষমা নেই, তন্মধ্যে সুদখোরী অন্যতম।

হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ যে জাতির মধ্যে সুদের প্রচলন হবে, সঙ্গে সঙ্গে সে জাতিকে দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হতে হবে। যে জাতির মধ্যে ঘুষখোরী বিস্তৃতি লাভ করবে সে জাতি নৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়বে।

পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে এবং বহু হাদীসে সুদের পরিণাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, যারা সুদ গ্রহণ করে তারা একই সঙ্গে দুটি অপরাধ করে (১) সুদের মাধ্যমে তথা হারাম বা অবৈধ পন্থায় রোজগার করে (২) সুদকে হালাল মনে করে এবং ব্যবসার ন্যায় হালাল মনে করে তারা সুদের ব্যবসা করে। অথচ আল্লাহ পাক সুদকে হারাম ঘোষণা করেছেন এবং ব্যবসাকে হালাল করেছেন। অতএব দুটির মধ্যে রাত ও দিনের পার্থক্য। যারা আল্লাহ পাকের এ ঘোষণার পর সুদখোরী থেকে বিরত হয়, এ জঘন্যতম এবং নিন্দনীয় কাজ বর্জন করে তাদের সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে–

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ

অতএব, যে কেউ তার প্রতিপালকের নিকট থেকে নসিহত লাভ করেছে এবং বিরত রয়েছে, অতীতের যা কিছু তা তারই রইল অর্থাৎ সুদ সম্পর্কীয় এ ঘোষণা শ্রবণ করে যারা মনে প্রাণে তওবা করল এবং কার্যত এ জঘন্য অপরাধ থেকে বিরত রইল

১। তফসীরে রুহুল মা'আনী খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৯

তারা এ ঘোষণার পূর্বে সুদ হিসেবে যা কিছু গ্রহণ করেছিল তা কি ফেরত দিতে হবে? এ প্রশ্নের জবাবে এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ না, তা ফেরত দিতে হবে না আর যারা দিয়েছে তারাও ফেরত পাওয়ার জন্যে দাবী করতে পারবে না। বাকী রইল আখেরাতের ব্যাপার, তা সম্পূর্ণ আল্লাহ্ পাকের মর্জির উপর নির্ভর করছে। তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاَمْرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ

তার ব্যাপার আল্লাহ পাকের উপরই সোপর্দ, সবই তাঁর ইচ্ছাধীন। পক্ষান্তরে, পবিত্র কোরআনের এ শাস্তি ঘোষণার পরও যারা পুনরায় সুদ গ্রহণ করবে তারা দোযখবাসী হবে। আল্লাহ্ পাকের নির্দেশের বিরুদ্ধে যারা যুক্তি তর্ক উপস্থাপন করে এবং অপরাধে লিপ্ত থাকে তাদের শাস্তি অবধারিত।

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক সুদকে ধ্বংস করেন এবং দান খয়রাতকে বৃদ্ধি করে দেন। বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেনঃ যদিও সুদের কারণে প্রকাশ্য দৃষ্টিতে অর্থ সম্পদ বৃদ্ধি পায় বলে মনে হয় কিন্তু পরিণামে ধ্বংস আসে। (মসনদে আহমদ)

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ এর অর্থ হলো আল্লাহ্ পাক সুদ প্রথার মাধ্যমে অর্জিত ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দেন, অথবা সুদখোরের ধন-সম্পদের বরকতকে বিনষ্ট করে দেন। কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতের এ অর্থও বর্ণনা করেছেন যে, সুদের অর্থ-সম্পদ ধ্বংস করার এবং সদকা খয়রাতকে বৃদ্ধি করার সম্পর্ক আখেরাতের সাথে অর্থাৎ সুদখোর ধন-সম্পদের যে পাহাড় গড়ে তুলল তা এ ব্যক্তির পরকালীন জিন্দেগীর কোন কাজে আসবেনা; বরং তার কঠোর ও কঠিন শাস্তির কারণ হবে। অথচ যে দান খয়রাত করে আখেরাতে তা দাতার জন্যে চির শান্তির কারণ হবে। সহীহ্ বোখারী শরীফে সংকলিত একখানি হাদীস এ পর্যায়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরশাদ হয়েছেঃ যে ব্যক্তি নিজের পবিত্র রোজগার থেকে একটি খেজুর দান করে আল্লাহ্ পাক তা তার দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করেন। অতঃপর সে দানকে তিনি লালন পালন করেন যেভাবে তোমরা গরুর বাছুরকে লালন কর। আর সেই খেজুরের সওয়াবকে পাহাড়ের সমান করে দেন আর আল্লাহ্ পাক পবিত্র বস্তু ব্যতীত অপবিত্র কোন বস্তু কবুল করেন না। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে একটি খেজুর যা আল্লাহর রাহে দান করা হয় আখেরাতে ওহোদ পাহাড়ের ন্যায় হয় তার সওয়াব। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, এক লোকমা খাদ্য-দ্রব্য যা আল্লাহর রাহে দুনিয়াতে দান করা হয়

তা কেয়ামতের দিন ওহোদ পাহাড়ের ন্যায় হয়ে হাযির হবে। অতএব, তোমরা আল্লাহর রাহে দান খয়রাত করতে থাক।[১]

আলোচ্য আয়াতে সুদ এবং দান খয়রাতকে একত্রিত করে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রশ্ন হলো সুদ এবং দান খয়রাতের মধ্যে কি কোন সামঞ্জস্য রয়েছে? তফসীরকারগণ বলেছেন ঃ এ দুটি পরস্পর বিরোধী কাজের মধ্যে একটি সামাঞ্জস্য রযেছে আর তা হলো দান খয়রাত মানুষকে দেয়া হয় আর তার কোন বিনিময় নেয়া হয়না। আর সুদ কোন বিনিময় ছাড়াই নেয়া হয়, তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ যারা সুদ গ্রহণের ন্যায় মানবতা বিরোধী কাজ করে আল্লাহ পাক তাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দেন। পক্ষান্তরে যারা কোন বিনিময়ের আশায় নয়; বরং শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দান খয়রাত করে আল্লাহ পাক তাদের সে দানকে বৃদ্ধি করেন।

এ অবস্থা ইনশাআল্লাহ আখেরাতে তো হবেই। ক্ষেত্র বিশেষে দুনিয়াতেও এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। যারা দান খয়রাত করে তাদের ধন-সম্পদে আল্লাহ পাক বরকত দান করেন। তাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং তাদের ওয়ারিশানরাও সেই সম্পদের অধিকারী হয়। আর এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই যে যারা সুদ গ্রহণের মাধ্যমে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে কিন্তু কিছুদিন পর নেমে এসেছে তাদের জীবনে ধ্বংস, তাদের বাড়ী-ঘর হয়েছে বিরাণ, তারা হয়েছে নিঃস্ব, হৃত-সর্বস্ব। এভাবে তারা বিশ্ববাসীর সম্মুখে পবিত্র কোরআনের এ ঘোষণার সত্যতা প্রমাণ করেছে।

আল্লামা আলুসী (রঃ) মা'মারের একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন আমরা শুনেছি চল্লিশ বছরের মধ্যে সুদখোরের অর্থ সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়।

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ.......

আল্লাহ পাক পছন্দ করেন না অকৃতজ্ঞ পাপীষ্ঠদেরকে, যারা আল্লাহর দানে ধন্য হয়ে ধন-সম্পদের অধিকারী হয়েছে তাদের কর্তব্য হলো ভাগ্যাহত দারিদ্র-পীড়িত মানুষকে সাহায্য করা। এভাবেই তারা আল্লাহ পাকের দানের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারত কিন্তু তারা তা করেনি শুধু তাই নয়; বরং তারা ইচ্ছা করলে দরিদ্র মানুষকে কর্জে হাসানার মাধ্যমেও সাহায্য করতে পারত কিন্তু তারা তা-ও করেনি; বরং তারা মানুষের দারিদ্রের সুযোগে তাদের প্রতি সুদ প্রথার মাধ্যমে জুলুম অত্যাচার করেছে। সুদ এবং চক্রবৃদ্ধি সুদের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষকে তাদের ভিটা-মাটি থেকে উৎখাত করেছে। এমন পাপীষ্ঠ অকৃতজ্ঞ লোকদের আল্লাহ পাক পছন্দ করেন না।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৬
তফসীরে মাজহারী খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা-১০৪
তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫১-৫২

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِنْ
لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ
فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِنْ
كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ
إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

তরজমা

(২৭৭) নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে এবং নামায কায়েম করেছে ও যাকাত আদায় করেছে তাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের নিকট তাদের জন্যে রয়েছে পুরস্কার। তাদের কোন ভয় নেই, তারা চিন্তিতও হবেনা।

(২৭৮) হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা কিছু বাকী রয়েছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মোমেন হও।

(২৭৯) কিন্তু যদি তোমরা তা না কর, তবে আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের তরফ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা হলো, আর যদি তোমরা তওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। তোমরাও কারো প্রতি অত্যাচার করোনা আর কারো দ্বারা অত্যাচারিত হয়োনা।

(২৮০) এবং সে (খাতক) যদি অভাবগ্রস্ত হয় তবে সচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও, আর যদি তোমরা (এ সত্য) উপলব্ধি করতে পার তবে তোমাদের পক্ষে মাফ করে দেয়াই উত্তম।

(২৮১) এবং সেদিনকে ভয় কর যেদিন তোমরা আল্লাহ্ পাকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। অতঃপর প্রত্যেককে তার কর্মফল সম্পূর্ণভাবে দেয়া হবে। এবং তারা অত্যাচারিত হবেনা।

তফসীরুল কোরআন

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

পূর্ববর্তী আয়াতে সুদখোরদের সম্পর্কে কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে আর এ আয়াতে পূণ্যাত্মা মোমেনদের শুভ পরিণতির ঘোষণা রয়েছে। যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনে, যারা আসমানী কিতাব সমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যারা একথার প্রতিও বিশ্বাস করে যে সুদ হারাম এবং যারা নেক আমল করে তথা আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে অর্পিত দায়িত্ব সমূহ্ সঠিক ভাবে পালন করে; সুদ প্রথা বর্জন করে এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে তাদের জন্যে রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট দাওয়াত এবং তাদের কোন ভয় নেই। আর তারা চিন্তিতও হবেনা। কেননা তারা বেহেশ্‌ত বাসী হবে আর কখনো দোযখের ভয় তাদেরকে স্পর্শ করবেনা।[১]

এ আয়াতের তফসীরে মওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী লিখেছেন, যারা প্রকৃত মোমেন, যারা নেক আমল করে এবং আল্লাহর নাফরমানী থেকে বিরত থাকে তাদের জন্যে আখেরাতে অনন্ত অসীম নেয়ামত তো রয়েছেই উপরন্তু দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনেও তারা মনের শান্তি ভোগ করে অল্পে তুষ্টির নেয়ামত তারা লাভ করে। তাদের সুখ শান্তি এবং আনন্দ সম্পর্কে সেসব লোক কোন ধারণাই করতে পারেনা, যারা মানুষের কাছ থেকে সুদ গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্‌র অকৃতজ্ঞ ও অবাধ্য হয়ে জীবন যাপন করে।[২]

আল্লামা আলুসী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে আমলে সালেহ বা নেক আমলের উল্লেখ করার পর আল্লাহ্ পাক নামায এবং যাকাতের তাগিদ করেছেন, কেননা শারীরিক এবাদতের মধ্যে নামায সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আর্থিক এবাদতের মধ্যে যাকাত সর্বশ্রেষ্ঠ।[৩]

এ আয়াত সম্পর্কে ইমাম রাজী (রঃ) তাঁর তফসীরে কবীরে বলেছেন ঃ পবিত্র কোরআনের বর্ণনা ধারা হলো এই যে যদি অন্যায় অবিচারের জন্যে শাস্তির ঘোষণা থাকে তবে তার পাশাপাশি নেক আমলের জন্যে পুরস্কারের ঘোষণাও থাকে। যেহেতু পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে সুদখোরদের ঘৃণ্য চরিত্র বর্ণনার পর তাদের কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে তাই এ আয়াতে নেককার মুসলমানদের শুভ পরিণতি বা অশেষ সওয়াবের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।[৪]

১। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-৪০

২। তফসীরে মাজেদী খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১১৬

৩। তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫২

৪। তফসীরে কবীর খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৯৬

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا

এবনে জরীর (রঃ) হযরত একরামা (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে এ আয়াত 'ছাকীফ' গোত্রের চার ভাই মাসউদ, আবদুল ইয়ালিল, হাবীব এবং রাবীয়া সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এ চার জনই ওমর এবনে আমীরের সন্তান ছিল। মুকাতেলের বর্ণনাও এরূপ। কিন্তু বগবী (রঃ) সাদী (রঃ)-এর সূত্র উল্লেখ করে লিখেছেন যে বর্ণিত আয়াত হযরত আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত খালেদ বিন ওলীদ (রাঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এ দুজনই জাহেলিয়াতের যুগে ছাকীফ গোত্রের বণী ওমর এবনে আমীরকে সুদে ধার দিয়ে থাকতেন। উভয়েই একে অপরের ব্যবসায়ে শরীক ছিলেন। ইসলামের আবির্ভাব যখন হলো তখন তাদের অনেক সুদের অর্থ মানুষের হাতে ছিল। সে সূত্রে আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযিল করেছেন।

এজন্যে বিদায় হজ্জের সময় আরফার দিনে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর ভাষণে এরশাদ করেছিলেন, "তোমরা ভাল করে শুনে নাও যে জাহেলিয়াত যুগের সব বিষয় আমার পদতলে দলিত হয়েছে। জাহেলিয়াত যুগের খুনের প্রতিশোধ আর নেয়া হবে না। সর্ব প্রথমে আমি আমার নিজ বংশের তরফ থেকে রাবীয়া বিন হারেসের খুনের প্রতিশোধ রহিত ঘোষণা করছি (রাবীয়া ছিল বণী হারেস গোত্রের দুগ্ধপোষ্য। বণী হোজাইল তাকে খুন করেছিল)। জাহেলী যুগের সুদও রহিত করে দেয়া হলো। সর্বাগ্রে আমি আব্বাস এবনে আবদুল মুত্তালিবের সুদ গ্রহণ বন্ধ করছি। আব্বাসের তরফ থেকে সকল সুদ মাফ করে দেয়া হলো"।[১]

আল্লামা বগবী (রঃ) হযরত একরামা এবং হযরত আতা (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে হযরত আব্বাস এবনে আবদুল মুত্তালিব এবং হযরত ওসমান এবনে আফ্ফান (রাঃ) একবার কিছু যব 'সলম্' নিয়মে বেচা-কেনা করেছিলেন। ফসল কাটার সময় যখন হলো তখন যবের মালিক বললেন, 'যদি আপনি আপনার হক্ব পুরোপুরি নিয়ে নেন তবে আমার ছোট ছোট সন্তানদের জন্যে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এজন্যে যদি আপনার হক্ব থেকে অর্ধেক এখন গ্রহণ করেন এবং বাকী অর্ধেকের জন্যে একটি সময় নির্দিষ্ট করে দেন তবে ভাল হয় এবং তখন আমি আপনাকে আপনার হক্বের দ্বিগুণ প্রদান করবো'। এ প্রস্তাবে উভয়ে সম্মত হলেন। এরপর যখন নির্দিষ্ট সময় আসলো তখন পূর্বের প্রস্তাব অনুযায়ী অতিরিক্ত দ্বিগুণ শষ্য দাবী করা হলো। এ ব্যাপারে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অবহিত হয়ে উভয়কে এমনি অতিরিক্ত দেয়া-নেয়া থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিলেন এবং আল্লাহ্ পাক উপরোক্ত আয়াত নাযিল করলেন। তখন উভয় সাহাবী (রাঃ) এ নির্দেশ পালন করলেন এবং আসল মাল গ্রহণ করে অতিরিক্ত মাল অর্থাৎ সুদ ছেড়ে দিলেন।

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১০৫
তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৩
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৬

আবু ইয়ালা মুসনাদে হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আমর এবনে আওফ ছাকাফী গোত্রের লোকেরা মুগীরা এবনে ওসাইর এবনে মখযুমের বংশের লোকদেরকে সুদের ভিত্তিতে ঋণ দিত। যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ পাক মক্কা বিজয় দান করলেন আর তিনি মক্কা বিজয়ের দিন সমস্ত সুদ বাতিল করে দিলেন তখন বণী আমর এবং বণী মুগীরা মক্কার কমিশনার হযরত এতাব এবনে উসাইদের নিকট হাযির হলেন এবং বললেন আল্লাহ্ পাক সকলের সুদ বাতিল করে দিলেন কিন্তু আমরা এমন বদ নসীব যে আমাদের উপর সুদের বিপদ রয়ে গেল।

তখন বনী ওমায়ীর বললেন ঃ আমাদের সঙ্গে মীমাংসা এ শর্তেই হয়েছে যে মানুষের উপর আমাদের যে সুদ রয়েছে তা বহাল থাকবে। হযরত এতাব এ ঘটনাটি লিখিত ভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে প্রেরণ করলেন। তখন আলোচ্য আয়াত দুটি নাযিল হলো।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে লিখেছেন এ আয়াত নাযিল হয়েছে মক্কাবাসীর জন্যে, কেননা তারা জাহেলিয়াতের যুগে ব্যবসা করত, যখন মক্কা বিজয়ের দিনে তারা ইসলাম কবুল করল তখন তাদেরকে আল্লাহ পাক আদেশ দিলেন যে তোমরা সুদের ব্যবসা বর্জন কর এবং শুধু আসল গ্রহণ কর। এতদ্ব্যতীত তফসীর গ্রন্থে এ আয়াতের যে শানে নুযুল বর্ণিত হয়েছে ইমাম রাজী (রঃ) তাঁর তফসীরে কবীরে তার উল্লেখ করেছেন।[১]

আলোচ্য আয়াতে সুদখোরের ব্যাপারে যে কঠোর শাস্তির ঘোষণা রয়েছে তা ব্যাখ্যা করার অপেক্ষা রাখে না। হযরত এবনে আব্বাস (রঃ) বর্ণনা করেনঃ কেয়ামতের দিন সুদখোরদের বলা হবে অস্ত্র ধারণ কর এবং আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। হযরত কাতাদা (রঃ) বর্ণনা করেন এ আয়াতে আল্লাহ পাক সুদখোরদের ধ্বংস করার কথা ঘোষণা করেছেন। তাদেরকে অপমানিত করার যোগ্য বলে বিবেচনা করেছেন। অতএব, এমন অন্যায় থেকে আত্মরক্ষা করা কল্যাণকামী মানুষ মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য।

হযরত আমর এবনুল আস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এই বলতে শুনেছি যে সম্প্রদায় বা জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে সুদ গ্রহণ করা হয় তাদেরকে অভাবের কষ্ট দিয়ে পাকড়াও করা হয়। আর যে সম্প্রদায়ে প্রকাশ্যে ঘুষ গ্রহণ করা হয় তাদেরকে দুশমনের ভয় দ্বারা পাকড়াও করা হয়।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৯৮

আল্লাহর তরফ থেকে যুদ্ধের তাৎপর্য

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন যে আল্লাহ্র তরফ থেকে যুদ্ধের তাৎপর্য হলো দোযখের শাস্তি আর আল্লাহর রসূলের তরফ থেকে যুদ্ধের তাৎপর্য হলো তরবারী। এজন্যেই ইমাম বয়যাবী (রঃ) লিখেছেনঃ এ শব্দটির তাৎপর্য হলো যেন কোন ব্যক্তি সুদখোরী থেকে তওবা করে সে যেন আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং যুদ্ধ বর্জন করে। যদি সে তওবা করতে প্রস্তুত না হয় তখন তার সঙ্গে যুদ্ধ কর্তব্য হয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন মুসলিম শাসনকর্তার কর্তব্য হলো সুদখোরকে বন্দী করা যতক্ষণ পর্যন্ত সে তওবা না করে, বন্দী অবস্থায় রাখা। আর যদি তাকে বন্দী করা সম্ভব না হয় তবে তাকে বিদ্রোহী ঘোষণা করে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তওবা না করে ততক্ষণ যুদ্ধ অব্যাহত রাখা।

রাযীন হযরত ওমর (রাঃ) এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেনঃ যখন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এন্তেকাল হয় তখন আরবের অনেক লোক ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে যায়, তারা বলে আমরা যাকাত দেব না। খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত আবু বকর (রাঃ) ঘোষণা করলেন যদি কোন ব্যক্তি যাকাতের হিসাবের একটি রশিও আদায় করতে অস্বীকার করে তবে আমি তার বিরুদ্ধে জেহাদ করব, তখন আমি আরজ করেছিলাম হে আল্লাহর রসূলের খলিফা! মানুষের সাথে বিনম্র ব্যবহার করুন। তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেছিলেন হে ওমর! তুমি বর্বরতার যুগে অত্যন্ত কঠিন ছিলে আর ইসলাম গ্রহণের পর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছ। আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেছে এবং ইসলাম জীবন বিধান হিসেবে পরিপূর্ণ হয়েছে, এখন আমাদের জীবনেই কি দ্বীন ইসলামের ক্ষতি হবে? বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-বর্ণিত যে হাদীস সংকলিত হয়েছে তাতে রয়েছে হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহর শপথ! আমি সে ব্যক্তির সাথে লড়াই করব যে নামায এবং যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে, কেননা যাকাত হলো আর্থিক কর্তব্য যদি লোকেরা একটি বকরীর বাচ্চা দিতে অস্বীকার করে যা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে দিত, তবে আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি তাদের সঙ্গে লড়াই করব। হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন সেই সময়ে আমি উপলব্ধি করলাম যে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কথাই সত্য।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১০৬-০৭

এতে একথাই প্রমাণিত হয়, যারা আল্লাহর বিধানকে প্রকাশ্যে অমান্য করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা কর্তব্য, কেননা জেহাদের মাধ্যমেই আল্লাহ্র দুশমনকের মোকাবেলা করা হয় আর সুদখোরীর মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহর মোকাবেলা করা হয়। অতএব, এর চেয়ে জঘন্য অপরাধ আর কি হতে পারে?

وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ اَمْوَالِكُمْ

অর্থাৎ তোমরা যদি সুদখোরী থেকে তওবা কর তবে আসল তোমাদেরই থাকবে, তোমরা আসলের উপর বাড়তি গ্রহণ করে ঋণ গ্রহীতার উপর জুলুম করবে না, আর আসল টাকা আদায়ে গাফলত করে তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না। হযরত আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সম্পদশালী ঋণ আদায়ে সক্ষম ব্যক্তির ঋণ আদায়ে টালবাহানা করা জুলুম।

ঋণ গ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হলে যা করণীয়

আল্লামা বগবী (রঃ) লিখেছেনঃ এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর বণী আমর সহ অন্যান্য যারা সুদের ব্যবসা করতো, তারা বললো আমরা তওবা করি আমরা আল্লাহ্ রসূলের সাথে লড়াই করার ক্ষমতা রাখিনা। এরপর তারা আসল গ্রহণ করলো, সুদ ছেড়ে দিল।

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ

অর্থাৎ আর যদি ঋণ গ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হয় তবে তার সচ্ছল অবস্থা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা কর্তব্য। হযরত আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে অভাবগ্রস্ত ঋণগ্রহীতার জন্যে সহজ পন্থা অবলম্বন করবে তথা ঋণ আদায়ের ব্যাপারে তাকে সময় দেবে আল্লাহ পাক দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে তার যাবতীয় কার্যাবলী সহজ করবেন। (মুসলিম শরীফ)

وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ

আর যদি তোমরা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ মাফ করে দাও তবে তা তোমাদের জন্যে হবে উত্তম। তেবরানী সংকলিত হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের আরশের ছায়াতলে স্থান পেতে চায় সে যেন এমন অভাবগ্রস্ত ঋণ গ্রহীতাকে সময় দেয় অথবা তাকে মাফ করে দেয়। মসনদে আহমদে সংকলিত হাদীসে রয়েছেঃ যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত মানুষ থেকে ঋণ আদায়ের ব্যাপারে বিনম্র হয় অথবা তাকে সময় দেয় তবে যত দিন সে ব্যক্তি ঋণের টাকা আদায় করতে না

পারে ততদিন পর্যন্ত প্রত্যেক দিন এত টাকা আল্লাহর রাহে দান করার সওয়াব সে পাবে।

হযরত আবু কাতাদা (রঃ) এক ব্যক্তির নিকট কিছু টাকা পেতেন। তিনি সে টাকার তাগাদা করতে আসলে লোকটি আত্মগোপন করতো। একদিন তিনি টাকার তাগাদায় আসলেন, এমন সময় একটি শিশু বাড়ী থেকে বের হলো, হযরত আবু কাতাদা সেই শিশুকে জিজ্ঞাসা করলেন সেই ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি গৃহে আছে কি-না? শিশুটি বললঃ আছেন এবং আহার করছেন। তখন হযরত আবু কাতাদা অত্যন্ত উচ্চস্বরে তাকে ডাক দিলেন এবং বললেন আমি জানি তুমি ঘরেই আছ অতএব বের হয়ে আস। সে অবশেষে বের হয়ে আসল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তুমি আত্মগোপন করে কেন থাক? সে বলল, জনাব প্রকৃত অবস্থা এই যে আমি অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত। আমি এ মুহূর্তে আপনার ঋণ আদায় করতে পারছিনা এজন্যে লজ্জিত। হযরত আবু কাতাদা (রঃ) বললেন, তুমি একথার উপর শপথ করতে পার? সে সঙ্গে সঙ্গে শপথ করলো। ঐ সময় হযরত আবু কাতাদা (রঃ) ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি কোন ঋণ গ্রহীতাকে সময় সুযোগ দেবে অথবা ঋণ মাফ করে দেবে সে কেয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ার নীচে স্থান পাবে। (মুসলিম শরীফ)

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে হাযির করা হবে আল্লাহ পাক তাকে জিজ্ঞাসা করবেন বল তুমি কি নেক কাজ করে এসেছ? সে বলবে জীবনে আমার দ্বারা এমন কোন নেক আমল হয়নি যার পুরস্কার আমি পেতে পারি। আল্লাহ পাক তাকে পুনরায় এ প্রশ্ন করবেন, সে একই উত্তর দেবে। এভাবে তিনবার প্রশ্ন করা হবে তিনবার জবাব দেয়া হবে, অতঃপর সে বলবে অবশ্য একটি ছোট কথা এখন আমার মনে পড়েছে হে আল্লাহ! তুমি দয়া করে আমাকে সম্পদশালী করেছিলে, লোকেরা আমার কাছ থেকে বাকীতে মালপত্র নিত। আমি তাদের মধ্যে যারা দরিদ্র হতো, ঋণ আদায়ে সক্ষম হতো না তাদেরকে আরো সময় দিতাম আর যারা সম্পদশালী হতো তাদের প্রতিও কঠোর ব্যবহার করতাম না। আর যারা অত্যন্ত দরিদ্র-পীড়িত হতো তাদেরকে মাফ করে দিতাম। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, তাহলে আমি কেন তোমার প্রতি সহজ করব না? যাও আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর।[১]

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ الاية

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৭

অর্থাৎ সেদিনকে ভয় কর যেদিন তোমরা আল্লাহ পাকের দরবারে প্রত্যাবর্তন করবে তথা কেয়ামতের দিন বা মৃত্যুর দিনকে ভয় কর এবং আল্লাহ পাকের দরবারে প্রত্যাবর্তনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ কর। তৎপর প্রত্যেককে তার ভাল বা মন্দ কর্মের বদলা দেয়া হবে, প্রত্যেককে তার আমলের পরিণাম ভোগ করতে হবে। আর তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না অর্থাৎ তাদের সৎ কর্মের সওয়াব কম করার মাধ্যমে বা তাদের অপরাধ অনুপাতে অধিকতর শাস্তির মাধ্যমে জুলুম করা হবে না।

বর্ণিত আছে যে এটিই পবিত্র কোরআনের সর্বশেষ আয়াত। এবনে জোরায়েহ বর্ণনা করেন যে, পূর্ববর্তী লোকদের মতে এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শুধু ৯টি রাত জীবিত ছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) মতে এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ৩১ দিন জীবিত ছিলেন। বর্ণিত আছে যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াতের পর ৭ দিন মাত্র জীবিত ছিলেন।

এবনে আবি হাতেমের বিবরণ মোতাবেক হযরত সাঈদ এবনে যোবায়ের (রাঃ) এ মতই পোষণ করতেন।[১]

এভাবে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, এ আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে ঋণ গ্রহীতার প্রতি বিনম্র ব্যবহান নির্দেশ রয়েছে। যদি ঋণ গ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হয় তবে তাবে অবকাশ দেয়ার হুকুম হয়েছে। আরও এরশাদ হয়েছে যদি অভাবগ্রস্ত ঋণ গ্রহীতাকে ক্ষমা করা হয় তবে তা হবে তোমাদের জন্যে উত্তম, এরপরই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে তোমরা সেদিনকে ভয় কর যেদিন তোমরা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ফিরে যাবে, সেদিন তোমাদেরকে কর্মফল দেয়া হবে। সঙ্গত কারণেই সেদিন তোমরা আল্লাহর দয়াপ্রার্থী হবে। অতএব, আজ দুনিয়াতে তোমরা মানুষের প্রতি দয়া কর। অভাবগ্রস্ত ঋণ গ্রহীতার প্রতি দয়া করে তার ঋণ ক্ষমা কর। তাদের প্রতি নির্দয় হয়োনা, কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে কারো প্রতি দয়া করেনা তার প্রতিও দয়া করা হবে না। অতএব, পরকালীন জিন্দেগীর প্রস্তুতি স্বরূপ আল্লাহকে ভয় করতে থাক। শেষ বিচারের দিন আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হতে হবে একথা মনে রেখে জীবনের যাবতীয় দায়িত্ব পালন কর।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৮
তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১১০
তফসীরে কবীর খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-১০৪
তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৫

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوْهُ ؕ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۪ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ
يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ
الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ
وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ؕ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ
لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ؕ
وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ؕ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ
صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا
تَكْتُبُوْهَا ؕ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۪ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ
وَّلَا شَهِيْدٌ ؕ۬ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ؕ وَ
اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٨٢﴾

তরজমা

(২৮২) হে মোমেনগণ! যখন তোমরা কোন নির্দৃষ্ট কালের জন্যে ধারের ভিত্তিতে ব্যবসা কর তখন তা লিখে নাও এবং তোমাদের জন্যে কোন লেখকের ন্যায় নীতি অনুসারে লেখা উচিত এবং লেখক যেন লিখে দিতে অস্বীকার না করে যেহেতু আল্লাহ পাক তাকে শিক্ষা দিয়েছেন তাই সে যেন লিখে দেয় এবং ঋণ গ্রহীতা যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয় এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে যেন ভয় করে আর তা থেকে কোন কিছু যেন কম না করে কিন্তু ঋণ গ্রহীতা যদি নির্বোধ

অথবা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অপরাগ হয় তবে তার অভিভাবক যেন ন্যায়ভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয় এবং তোমাদের মধ্যে দুজন পুরুষকে সাক্ষী রাখ কিন্তু যদি দুজন পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা, মহিলাদের মধ্যে একজন ভুলে গেলে অন্য জন স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সাক্ষীগণকে যখন সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে ডাকা হয় তখন তারা যেন সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার না করে আর ঋণ কম হোক বা বেশী তা লিখে নিতে তোমরা শৈথিল্য প্রদর্শন করোনা। এটি আল্লাহ পাকের নিকট হক্ব, ইনসাফ এবং সাক্ষ্যের জন্যে সরলতর পন্থা এবং সন্দিহান না হওয়ার জন্যে নিকটতর। কিন্তু তোমরা পরস্পর যে ব্যবসায় আদান প্রদান কর তা লিখলেও তোমাদের কোন দোষ হবে না এবং যখন তোমরা পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় কর তখন সাক্ষী রেখে দিও, লেখক এবং সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যদি তোমরা তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত কর তবে তা হবে তোমাদের জন্যে পাপ আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চল এবং আল্লাহ পাকই তোমাদেরকে শিক্ষা দেন আর আল্লাহ্ পাক সব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে প্রথমে দান খয়রাতের ফজিলত এবং নিয়ম কানুন বর্ণিত হয়েছে, পরে সুদের শোচনীয় পরিণাম সম্পর্কে ঘোষণা রয়েছে। আর এ আয়াতে নির্ধারিত সময়ে ধারের ভিত্তিতে ব্যবসায়ের নিয়ম কানুন সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে। যেহেতু এ ব্যবসা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে হয়ে থাকে তাতে ভুল-ক্রটি হওয়া অস্বাভাবিক নয়, আর সে ভুল ক্রটির কারণে সৃষ্টি কলহ-দ্বন্দ্ব মুসলিম সমাজ ও জাতির জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই পবিত্র কোরআন সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, এ ধরনের ব্যবসার ব্যাপারে যাবতীয় জরুরী বিষয় লিপিবদ্ধ করে রাখ। লেখকের কর্তব্য হবে সঠিকভাবে লেখা এবং যা কিছু কথাবার্তা হবে তার উপর সাক্ষী রাখা। দু'জন পুরুষ সাক্ষী হতে হবে, যদি তা না হয় তবে একজন পুরুষ ও দূজন মহিলা সাক্ষী থাকতে হবে। লেখক বা সাক্ষীর কোন ক্ষতি যেন না হয় সেদিকেও নজর রাখতে হবে। ঋণ গ্রহীতা যদি নিজের হাতে লিখে দিতে পারে তবে তা সর্বোত্তম। অন্যথায় লেখক সঠিক ভাবে সব কিছু লিখবে। লেখক বা সাক্ষী লিখতে বা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করবে না, ঋণ গ্রহীতারা যদি দুর্বল, নির্বোধ কাহিল হয় এবং লেখককে বোঝাতেও অক্ষম হয় এমন অবস্থায় তার অভিভাবকগণ সঠিকভাবে যেন তা লিখিয়ে দেয়। মোটকথা, ধারের ব্যবসার কারণে পরবর্তীতে যেন কোন প্রকার কলহ-দ্বন্দ্ব, অসন্তোষ অশান্তি সৃষ্টি না হয় তার জন্যে নিশ্চিত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে পবিত্র কোরআন। বস্তুতঃ মানুষ যদি পবিত্র কোরআনের এই সমস্ত বিধি-নিষেধ সঠিকভাবে পালন করে তবে দুনিয়ার এ জীবন হবে শান্তিপূর্ণ, সাফল্যমণ্ডিত আর পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে লাভ হবে চির শান্তি, চির নাজাত।

এবনে জোরায়েহ (রঃ) বর্ণনা করেন যে বাকী দেয় সে যেন লিখে নেয়। আর যে বিক্রয় করে সে যেন সাক্ষী করে নেয়। আবু সোলায়মান মারাশী (রঃ) যিনি বিখ্যাত সাহাবী হযরত কা'ব (রঃ)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন দীর্ঘ দিন, তিনি একদিন তাঁর সঙ্গীদেরকে বললেন তোমরা কি সেই মজলুমকে জান যে আল্লাহকে ডাকে অথচ তার দোয়া কবুল হয় না? লোকেরা জিজ্ঞাসা করল কেন কবুল হয় না? তিনি বললেন এ হলো সে ব্যক্তি যে মানুষকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ধার দেয় অথচ তা লিখিত রাখে না এবং তার উপর কোন সাক্ষীও রাখে না। এরপর সে নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়ার পর সে ব্যক্তির নিকট ঋণ আদায়ের দাবী করে কিন্তু সে ঐ দাবী অস্বীকার করে বসে। এখন এ ব্যক্তি আল্লাহর নিকট দোয়া করে কিন্তু আল্লাহ পাক তার দোয়া কবুল করেন না, কেননা সে আল্লাহর হুকুমের বরখেলাফ কাজ করেছে।[১]

ইমাম রাজী (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত তফসীরে কবীরে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন ইতোপূর্বে আল্লাহর রাহে দান করার আদেশ দিয়েছেন আর এ আদেশ পালনের মাধ্যমে অর্থ সম্পদ কমে যাওয়া স্বাভাবিক। এরপর সুদ বর্জনের তাগিদ করেছেন আর এ আদেশও অর্থ সম্পদের কম হওয়ার কারণ হয়। এরপর আখেরাতকে স্মরণ করার এবং এ ক্ষণস্থায়ী জগৎকে অবশেষে একদিন ছেড়ে দেয়ার কথা স্মরণ করিয়ে বিশেষ সর্তকবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ الاية

আর আলোচ্য সুদীর্ঘ আয়াতে অর্থ সম্পদ সংরক্ষণের পন্থা অবলম্বনের তাগিদ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে মোমেনদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ

يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

অর্থাৎ হে মোমেনগণ! তোমরা যখন ধারে ব্যবসা কর নিদিষ্ট কালের জন্যে তখন তা লিখে নিও আর এ আদেশটিকে দ্বিতীয়বার তাগিদ করে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

অর্থাৎ কোন লেখক যেন সেই ধারের ব্যবসা সম্পর্কে ন্যায়নীতি অনুসারে লেখে আর বিষয়টির উপর গুরুত্বারোপ করে তৃতীয়বার এরশাদ হয়েছেঃ

১। তফসীরে এবনে কাসীর খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৩

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ

অর্থাৎ কোন লেখক যেন বিষয়টি লিখতে অস্বীকার না করে যেহেতু আল্লাহ পাকই তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আর চতুর্থবার বিষয়টির উপর গুরুত্বারোপ করে এরশাদ হয়েছেঃ

فَلْيَكْتُبْ

অর্থাৎ অবশ্যই যেন ধারের ব্যবসা সম্পর্কে লিখে নেয়া হয়।

পরস্পরের সম্প্রীতি রক্ষার তাগিদে ভবিষ্যতে কোন প্রকার অশান্তি সৃষ্টি না হওয়ার লক্ষ্যে বিশেষ সংরক্ষণমূলক পন্থা অবলম্বনের শিক্ষা দিয়ে এ আয়াতে পঞ্চম বারের মত এরশাদ হয়েছেঃ

وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ

অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা যেন অবশ্যই বিষয়টি লিখে নেয়।

আর ধারের ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে হক্কুল এবাদ সম্পর্কে অত্যন্ত সর্তকতা অবলম্বনের তাগিদ করে ষষ্ঠবার বলা হয়েছেঃ

وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ

অর্থাৎ এসব লেনদেনের ব্যাপারে আল্লাহ পাককে যেন ভয় করা হয়।

আর বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করে সপ্তমবারের মত এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

অর্থাৎ এবং তাতে যেন কোন প্রকার কম না করা হয়।

বিষয়টির গুরুত্ব কোরআনের দৃষ্টিতে কত বেশী তা বিশেষভাবে এজন্যে লক্ষণীয় যে আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে অষ্টমবার তাগিদ করে এরশাদ করেছেনঃ

وَلَا تَسْئَمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ

অর্থাৎ ঋণের টাকা কম হোক কি বেশী নির্দিষ্ট সময় তা লিখে নিতে তোমরা শৈথিল্য প্রকাশ করোনা।

পবিত্র কোরআনের বর্ণনা শৈলীর প্রতি লক্ষ্য করলে বিস্ময়াভিভূত হতে হয়। কেননা এতে একটি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করে কতভাবে তাগিদ করা হয়েছে যেমন আলোচ্য আয়াতে ধারের ব্যবসা সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করার জন্য নবমবার তাগিদ করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰى اَلَّا تَرْتَابُوْا

অর্থাৎ যখন তোমাদের পরস্পরের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট কালের জন্যে ধারের ভিত্তিতে ব্যবসা হয় তখন তা লিখে নেয়ার যে বিধান আলোচ্য আয়াতে পেশ করা হয়েছে তা আল্লাহ্ পাকের নিকট হক্ব, ইনসাফ এবং সাক্ষ্যের জন্যে সরলতর পন্থা এবং সন্দিহান না হওয়ার জন্যে নিকটতর কার্যক্রম।[১] কেননা মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়। মানুষ ভুলে যায় আর ভুলে যাওয়ার কারণে যদি কারো হক্ব নষ্ট হয় তবে তার শাস্তি ভোগ করতে হবে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে। এজন্যেই পবিত্র কোরআন বিশ্ব মানবের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে এ বিধান পেশ করেছে যে, ধারে ব্যবসা হলে অথবা ঋণ গ্রহণ করা হলে তা লিখে নাও শুধু তাই নয়, বরং তার উপর সাক্ষী রাখ যাতে করে পরবর্তীতে এ বিষয়ে কোন মতভেদ বা কলহ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না হয়।

মসনদে আহমদে একখানি হাদীস সংকলিত হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একজন গ্রাম্য ব্যক্তি থেকে একটি অশ্ব ক্রয় করলেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরপর তাঁর বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলেন, গ্রাম্য লোকটি তাঁর অনুসরণ করল যেন তাঁর বাড়ী থেকে অশ্বের দাম নিয়ে যায়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটু দ্রুত এগিয়ে গেলেন আর অশ্ব বিক্রেতা লোকটি পেছনে রইল পথিমধ্যে কিছু লোক যারা জানতো না যে অশ্বটি বিক্রি হয়ে গেছে তারা তা ক্রয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করল এবং পূর্ব নির্ধারিত মূল্য থেকে চড়া মূল্যে অশ্বটি ক্রয় করতে চাইলে ঐ লোকটির নিয়ত তখন বদলে গেল, সে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উচ্চস্বরে আওয়াজ দিয়ে বলল, আপনার ইচ্ছা হলে অশ্বটি এখনই নিন অন্যথায় আমি অন্য কারো নিকট বিক্রয় করে দেব। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এরশাদ করলেনঃ তুমিতো আমার নিকট বিক্রি করেই ফেলেছ। এখন তুমি নতুন করে কি বলছ? সে বলল না, আল্লাহর কসম, আমি বিক্রয় করিনি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এরশাদ করলেন ঃ তুমি অসত্য কথা বলছ। তোমার আমার মধ্যে এই বিক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। লোকটি বললঃ আমি যে আপনার নিকট অশ্বটি বিক্রয় করেছি এর কোন সাক্ষী আপনি পেশ করুন। তখন সমবেত মুসলমানগণ বললেনঃ হে বদ্‌নসীব! ইনি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম), তাঁর জবান মোবারক থেকে শুধু

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১০৬

হক্ব কথাই বের হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ঐ গ্রাম্য লোকটি বলতে থাকল আমি যে আপনার নিকট অশ্বটি বিক্রয় করেছি আপনি তার সাক্ষী পেশ করুন। এমন সময় সাহাবী হযরত খোজায়মা (রাঃ) উপস্থিত হলেন এবং ঐ গ্রাম্য লোকটির কথা শ্রবণ করে তিনি বললেনঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তুমি অশ্বটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট বিক্রয় করেছ। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কিভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছ? তিনি বললেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার সত্যবাদীতার উপর আমার ঈমান আছে আর এ ঈমানের ভিত্তিতেই আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ আজ থেকে খোজায়মার একার সাক্ষ্যই দু' সাক্ষীর সমান বলে বিবেচিত হবে।[১]

এ ঘটনায়ও প্রমাণিত হয় যে আলোচ্য আয়াতের বিধান শুধু যৌক্তিকই নয়, বরং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং পরস্পরের সম্প্রীতির জন্যে জরুরী।

এ পর্যায়ে আরেকখানি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যা এবনে মরদবিয়া এবং হাকেমে সংকলিত হয়েছে এরশাদ হয়েছে ঃ তিন ব্যক্তি এমন যাদের দোয়া আল্লাহ্ পাক কবুল করেন না (১) যে ব্যক্তির গৃহে চরিত্রহীন স্ত্রী থাকে অথচ সে তাকে তালাক দেয় না। (২) সে ব্যক্তি যে এতিমের ধন-সম্পদ তার বালেগ হওয়ার পূর্বেই তাকে সোপর্দ করে। (৩) যে ব্যক্তি কোন লোককে ঋণ প্রদান করে এবং তার উপর সাক্ষী রাখে না।[২]

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, যে কোন বেচাকেনা যা ধারের ভিত্তিতে হয় তা লিপিবদ্ধ করা কর্তব্য আর এর উদ্দেশ্যে হলো মানুষের হক্ব বা অধিকারের সংরক্ষণ। দ্বিতীয়তঃ أَجَلٍ مُّسَمًّى শব্দ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে এমনি ব্যবসায়ের জন্যে একটা সময় নির্দিষ্ট হওয়া পূর্বশর্ত আর সময় নির্দিষ্ট না হলে তা লিপিবদ্ধ করা অনর্থক হবে। তৃতীয়তঃ যতক্ষণ নির্দিষ্ট সময় শেষ না হবে ততক্ষণ ধারের বস্তু আদায়ের দাবী করা বৈধ হবে না। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর মতে এ আয়াত "বায়ে সালাম" সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, এটি এমনি একটি ব্যবসা যে বিক্রীত সম্পদের পূর্ণ মূল্য পূর্বেই আদায় করা হয় এবং বিক্রীত বস্তু একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর গ্রহণ করা হয়। এতে কয়েকটি শর্ত রয়েছে (১) বিক্রীত বস্তু আদায়ের স্থান এবং সময় নির্দিষ্ট হওয়া (২) বিক্রীত বস্তুর বিস্তারিত বিবরণ (৩) বিক্রীত বস্তুর পরিমাণ ও মূল্য (৪) বিক্রীত বস্তুর পূর্ণ বিনিময়

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩০-৩১
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩২

মূল্য একই মজলিসে আদায় করা যখন লেনদেন সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা হয় (৫) যে জিনিস বিক্রির কথা হলো বাজারে তার সরবরাহ থাকা (৬) বিক্রয়ের বস্তু এমন হওয়া উচিত যার বিবরণ দেয়া যায়, যার সম্পর্কে ধারণা করা যায়। (৭) বিক্রয়ের বস্তু এবং মূল্য উভয়ের মধ্যে সুদের কোন ব্যবস্থা না থাকা। এমনি ব্যবসায় ধারের বস্তু আদায়ের জন্যে কত সময় নির্দিষ্ট হবে তা নিয়ে তত্ত্ববিদগণ আলোচনা করেছেন। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মতে এই সময় অর্ধেক দিনের বেশী হওয়াই যথেষ্ট, কেননা পবিত্র কোরআনে কোন সময় নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মতে এই সময় হবে তিন দিন। আমাদের ইমাম আবু হানিফার (রঃ) মতে এই সময় এক মাসের কম হওয়া উচিত নয়, কেননা সাধারণতঃ এ ধরণের কাজের সময় একমাস ধরা হয় আর এর চেয়ে কম সময়ের জন্যে লিপিবদ্ধ করা সাক্ষ্য রাখা জরুরী হয়না।[১]

আলোচ্য আয়াতে ধারের ভিত্তিতে ব্যবসায়ের ব্যাপারে লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং দুজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা সাক্ষী রাখার নির্দেশ রয়েছে। এখানে যে কথাটি স্মরণ যোগ্য তা হলো, ইহুদীদের ধর্মে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়না কিন্তু ইসলাম নারী জাতিকে তার প্রাপ্য এ অধিকার দান করেছে এবং দুজন মহিলাকে সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে একজন পুরুষের সমান বলা হয়েছে।[২]

اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا

অর্থাৎ সাক্ষী একজন পুরুষ হলে আর দুজন মহিলা হতে হবে। যদি একজন কোন কথা ভুলে যায় তবে অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারবে। এ পর্যায়ে এমন প্রশ্ন অবান্তর যে ভুলে যাওয়ার এ আশঙ্কা শুধু মহিলাদের ব্যাপারে কেন করা হলো? পুরুষদের ব্যাপারেও এ প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে, কেননা যিনি সৃষ্টি করেছেন মানব জাতিকে তিনিই জানেন কার কি বৈশিষ্ট্য? কি কারণে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও পুরুষকে গর্ভধারণের যোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়নি? এ প্রশ্নের জবাব স্বয়ং স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকই জানেন। সবই তার নখদর্পণে, কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই।

সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারে ইসলাম

কারো কারো মতে দুনিয়া বর্তমানে অনেক উন্নতি করেছে এখন শুধু আখেরাতের কথা বলে বা এবাদত বন্দেগীর কথা শুনিয়ে ধর্মীয় ব্যাপারে আধুনিক

১। খোলাসাতুত তাফাসীর খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২২২
২। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১১৮

কালের মানুষকে আকৃষ্ট করা যাবে না। আজকের পৃথিবীর কর্মের পৃথিবী। যে জীবন-বিধান বা যে ধর্ম মানুষের দৈনন্দিন কর্ম জীবনের অসংখ্য সমস্যার সমাধান পেশ করতে পারে মানুষ স্বাভাবিক কারণেই সেই ধর্মকে গ্রহণ করবে।

এ মানদণ্ডটি শুদ্ধ কি অশুদ্ধ? এটি একটি স্বতন্ত্র প্রশ্ন, তবে যদি এ মানদণ্ডে বিচার করা যায় তাহলে দেখা যাবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ছোট-বড় সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারে একমাত্র ইসলাম। আমাদের এ বক্তব্যের সত্যতার প্রমান স্বরূপ আলোচ্য আয়াতকে পেশ করা যেতে পারে। কেননা ধারের ব্যবসার ব্যাপারে কত সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়েছে এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা দেখে শুধু বিস্মিত হতে হয়। একদিকে তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনের তাগিদ করা হয়েছে অন্যদিকে কারো যেন ক্ষতি না করা হয় সেদিকে বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে। যেমন এরশাদ হয়েছে-

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ

অর্থাৎ লেখক বা সাক্ষীর যেন ক্ষতি না করা হয়, লেখককে তার বিনিময় না দিয়ে লিখতে বাধ্য না করা হয়, এমনিভাবে সাক্ষীকে তার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তার যাতায়াত খরচ না দেয়ার মাধ্যমে যেন তাকে কষ্ট না দেয়া হয়।

وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ

যে সব বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে সেগুলো যদি কেউ করে তবে তা হবে অত্যন্ত পাপ কার্য, আর পাপ কার্যের ব্যাপারে আল্লাহ্ পাককে ভয় করা কল্যাণকামী মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য। এজন্যে পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে-

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং আল্লাহ পাক শিক্ষা দেবেন তোমাদেরকে হেকমতের কথা।

এ আয়াত দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানীগণ একথা প্রমাণ করেছেন যে, প্রকৃত এলম অর্জিত হয় তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনের মাধ্যমে। তারা বলেছেন, তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন কর তাহলে আল্লাহ পাক প্রকৃত এলম বা খাটি জ্ঞান দান করবেন। আর জ্ঞানের উৎস তো স্বয়ং আল্লাহ পাকই। তাই এরশাদ হয়েছে-

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ

এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ
أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَ
اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ
وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ۖ
فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

তরজমা

(২৮৩) এবং যদি তোমরা সফ়রে থাক, আর কোন লেখক না পাও তবে কিছু বন্ধক রেখে যাও, তোমাদের একে অন্যকে বিশ্বাস করলে যাকে বিশ্বাস করা হয় সে যেন আমানত ফিরিয়ে দেয় এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে যেন ভয় করে। এবং তোমরা সাক্ষ্য গোপন করোনা। আর যে সাক্ষ্য গোপন করে তার অন্তর পাপী। আল্লাহ্ পাক তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।

(২৮৪) আসমান এবং যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্ পাকের। তোমাদের মনের গহনে যা কিছু আছে তা প্রকাশ কর বা গোপন কর আল্লাহ্ পাক তার হিসাবে গ্রহণ করবেন। অতঃপর তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন এবং আল্লাহ্ পাক সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে ধারের ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপার লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ ছিল। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যদি ভ্রমণরত অবস্থায় ধারের ব্যবসা হয় এবং ভ্রমণকালে কোন লেখক পাওয়া না যায় অথবা কাগজ কলমের অসুবিধা হয় এমন অবস্থায় তোমরা কোন বস্তু ধারের পরিবর্তে বন্ধক রেখে দাও। প্রকৃত অবস্থা এই যে মানুষ যখন বাড়ী-ঘরে থাকে তখন ঋণ দাতা হিসেবে দস্তাবেজ লিপিবদ্ধ করানো এবং সাক্ষী রেখে ধারের ব্যবসা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সহজ। কিন্তু প্রবাসে যদি ধারের ব্যবসা করতে হয় এবং তা লিপিবদ্ধ করার মত লোকও না থাকে তখন ধারের পরিবর্তে কোন কিছু বন্ধক রাখার বিধান পেশ করা হয়েছে। কোন কোন

তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, বন্ধক রাখার বিধান শুধু প্রবাস কালের জন্যেই রয়েছে। হযরত মুজাহেদ সহ কয়েকজন মনীষী এ মত পোষণ করেন। কিন্তু বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফসহ সমস্ত হাদীস গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত এই হাদীস সংকলিত হয়েছে যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফে আবু হাসাম নামক এক ইহুদীর নিকট কিছু পরিমাণ যবের বিনিময়ে তাঁর যুদ্ধ পোষাক বন্ধক রেখেছিলেন। তাঁর এন্তেকাল পর্যন্ত তা সেই ইহুদীর নিকট বন্ধক ছিল।

فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ

আর যদি ঋণ দানকারী ঋণ গ্রহীতাকে বিশ্বাস করে এবং সে নিশ্চিন্ত হয় যে তার হক্ব বিনষ্ট হবে না। ফলে কোন বন্ধক না রাখে এমন অবস্থায় ঋণ গ্রহীতার একান্ত কর্তব্য হলো ঋণ দাতার প্রাপ্য পুরোপুরি আদায় করা আর ঋণ গ্রহীতার কর্তব্য হলো আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীনকে ভয় করা। হক্বদারের হক্ব আদায়ে সম্পূর্ণ ঈমানদারী, আমানতদারীর প্রমাণ উপস্থাপন করা।

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ

"আর তোমরা সাক্ষ্যকে গোপন করোনা আর যে সাক্ষ্যকে গোপন করে নিশ্চয় তার অন্তর পাপী"।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া অথবা সত্য সাক্ষ্য গোপন করা কবীরা গুনাহ্। সাক্ষ্য গোপন করা দু' ভাবে হতে পারে (১) সাক্ষ্য না দেয়া। (২) সত্য সাক্ষ্য গোপন করা এবং মিথ্যা কথা বলা। এটি জঘন্য অপরাধ।

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

আর আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। তাঁর নিকট কোন কিছু গোপন নেই। কোন সাক্ষী যদি সাক্ষ্য গোপন করে অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তবে মানুষের নিকট সত্য গোপন থাকলেও আল্লাহ পাকের নিকট তা আদৌ গোপন থাকে না। এজন্যে পূর্ববর্তী বাক্যে সাক্ষ্য গোপন করাকে অন্তরের পাপ বলা হয়েছে।

فَاِنَّهٗ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ

মূলতঃ অন্তরের পাপই সর্বশ্রেষ্ঠ পাপ যেমন আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করা। পক্ষান্তরে অন্তর দ্বারাই সবচেয়ে বড় নেক আমল হয় যেমন আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান। আর এমনিভাবে সাক্ষ্য গোপন করা অন্তরের পাপ সমূহের অন্তর্ভুক্ত আর

আল্লাহ্ পাক মানব অন্তরের সকল গোপন বিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। অতএব, সত্য সাক্ষ্য গোপন করার শাস্তি অবধারিত।

সূরায়ে বাকারা পবিত্র কোরআনের সবচেয়ে দীর্ঘ সূরা। এতে তৌহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের কথা রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত শরীয়তের অনেক বিধান যথা নামায, যাকাত, কেছাছ, রোজা, হজ্জ, জেহাদ, ইদ্দত, ব্যবসা-বাণিজ্য, সুদ, ঋণ প্রভৃতি বিষয়ের নিয়ম কানুন বর্ণিত হয়েছে। তাই এ সূরার পরিসমাপ্তিতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে কে আল্লাহ্ পাকের এ বিধান সমূহ পালন করে আর কে অমান্য করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। আর এজন্যেই পরবর্তী আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে তোমরা কোন কিছু গোপন কর বা প্রকাশ কর আল্লাহ্ পাক সব বিষয়ের হিসাব গ্রহণ করবেন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ

আসমান যমীনের মালিকানা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই। তোমাদের অন্তরে যা কিছু রয়েছে তা প্রকাশ কর বা গোপন কর আল্লাহ পাক অবশ্যই তার হিসাব গ্রহণ করবেন। একথাটি আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে এভাবে এরশাদ করেছেন ঃ

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِىْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ

অর্থাৎ "তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে তা গোপন কর বা প্রকাশ কর আল্লাহ পাক সব জানেন"।

বিশ্ব সৃষ্টির কোন কিছুই তাঁর অজানা নয়। তিনি সর্বময় ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে শাস্তি দেবেন। হযরত হারেস এবনে ওহাব (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি কি বলবো তোমাদেরকে জান্নাতী কে? সেই দুর্বল ব্যক্তি যাকে দুর্বল মনে করা হয় (কিন্তু যে বড় আল্লাহ ওয়ালা) যদি সে আল্লাহর নামে শপথ করে তবে আল্লাহ পাক তার শপথ পূর্ণ করে দেন। আর আমি কি বলবো তোমাদেরকে দোযখী কে? সে ব্যক্তি যে মানুষের সাথে কঠোর ব্যবহার করে, অর্থ সম্পদ একত্রিত করতে থাকে এবং যে অহংকারী।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মোবারক (রঃ) বর্ণনা করেন, আমি হযরত সুফিয়ান সওরী (রঃ)-কে এ আয়াতের প্রেক্ষিতে জিজ্ঞাসা করেছি, কোন মানুষ যদি পাপ কার্যের ইচ্ছা করে শুধু তাতেই কি তাকে পাকড়াও করা হবে? তিনি বলছেন, হ্যাঁ যদি পাপ কার্যের সুদৃঢ় ইচ্ছা বা সংকল্প গ্রহণ করা হয় তবে তাকে পাকড়াও করা হবে। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ প্রসঙ্গে বলেছেন পাপ কার্যের সংকল্পের প্রতি পাকড়াও করার যে কথা রয়েছে তার কারণ হলো যদিও পাপ কার্যের শুধু সংকল্পই করা হয়েছে কার্যত পাপ কার্য সংঘটিত হয়নি কিন্তু সংকল্পটি অন্তরের পাপের অন্তর্ভুক্ত। আর প্রত্যেক পাপই পাকড়াও করার যোগ্য। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ প্রসঙ্গে একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি কোন ব্যক্তি পাপ কার্যের ইচ্ছা করে আর তা না করে তবে তার আমলনামায় তা লিপিবদ্ধ হয় না। আর যখন সে পাপ কার্য করে তখন তা লিপিবদ্ধ হয়। অতএব, এতে একথা প্রমাণিত হয় পাপ কার্য সম্পাদিত না হলে শাস্তি হবে না তবে হিসাব হবে।[১]

يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ

অর্থাৎ কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক হিসাব গ্রহণ করবেন।

فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ

তখন যাকে ইচ্ছা তিনি মাফ করবেন আর যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেবেন।

وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক সর্ব বিষয়ের উপর শক্তিশালী, আযাব ও মাগফেরাত তাঁর ইচ্ছাধীন। এর উপর কারো কোন প্রশ্ন হতে পারেনা। তিনি ইচ্ছা করলে কোন ক্ষুদ্র পাপের জন্যে শাস্তি দিতে পারেন আর তিনি ইচ্ছা করলে মহা পাপকেও ক্ষমা করতে পারেন। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৫০-৫২

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ
الْمُؤْمِنُونَ ط كُلٌّ آمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ قف
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ قف وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ق
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا
وُسْعَهَا ط لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ج رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا
إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ج رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا
مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ج وَاعْفُ عَنَّا قف وَاغْفِرْ لَنَا قف وَارْحَمْنَا قف
أَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

তরজমা

(২৮৫) রসূল বিশ্বাস স্থাপন করেছেন তাঁর প্রতি যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তাঁর প্রতিপালকের তরফ থেকে এবং মোমেনগণও। প্রত্যেকেই বিশ্বাস স্থাপন করেছে আল্লাহ পাকের প্রতি বরং তাঁর ফেরেশতাদের ও আসমানী কিতাব সমূহ এবং তাঁর রসূলগণের প্রতি। তারা বলে, আমরা তাঁর রসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না আর তারা বলে, আমরা শ্রবণ করেছি এবং পালন করেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমার নিকট ক্ষমা চাই, আর তোমারই নিকট যে আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

(২৮৬) আল্লাহ পাক কারো প্রতি এমন কোন দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তাঁর সাধ্যাতীত। তার সৎ কর্মের ফল তারই জন্যে, তার অসৎ কর্মের শোচনীয় পরিণাম তারই উপর। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের ধরপাকড় করোনা, যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি যেমন দায়িত্ব অর্পণ করেছ, আমাদের প্রতি তেমন দায়িত্ব অর্পণ করোনা। হে আমাদের পালনকর্তা! এমন বোঝা আমাদের উপর অর্পণ করোনা যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আর আমাদেরকে মাফ কর এবং আমাদেরকে মাগফেরাত দান কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর তুমিই যে আমাদের প্রভু। অতএব, কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়যুক্ত কর (আমীন)।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে মানুষের অন্তরের গোপনতম প্রকোষ্ঠে যেসব ভাবনার অবতারণা হয় সেগুলোর প্রতিও ধরাপাকড় হবে এবং সেসব বিষয়ের হিসাব গ্রহণ করা হবে। এ ঘোষণার কারণে সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এ আরযী পেশ করেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের মনের ভাবনার উপরতো আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই এমনি অবস্থায় যদি এ বিষয়েরও হিসাব হয় তবে আমাদের জন্যে তা হবে চরম বিপদের কারণ। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তোমরা বল–

سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا

অর্থাৎ আমরা শ্রবণ করেছি ও আনুগত্য প্রকাশ করেছি হে আল্লাহ্! তোমার আদেশ আমাদের সাধ্য মোতাবেক হোক অথবা সাধ্যাতীত সকল অবস্থায় তোমার সমীপে আত্মসমর্পণ করি, তোমার সকল আদেশ আমাদের জন্যে শিরোধার্য। এরপর আল্লাহ্ পাক তাঁর সন্তুষ্টি প্রকাশ করে আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন ঃ

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ

এ আয়াত দ্বারা একথার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে যে কোন ব্যক্তিকে তার সাধ্যাতীত কষ্ট দেয়ার ইচ্ছা আল্লাহ পাকেরই নেই। এটি তাঁর নীতি বিরোধী কাজ। কারো অন্তরে যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন পাপ কার্যের বাসনা সৃষ্টি হয় কিন্তু কার্যতঃ সে বাসনা বাস্তবায়িত না হয় তবে তাতে পাপ হবে না।

সূরা বাকারার এ দু' আয়াতের অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।

বোখারী শরীফে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এই হাদীস সংকলিত হয়েছেঃ যে ব্যক্তি এ দু' আয়াত রাত্রে পাঠ করবে তা তার জন্যে যথেষ্ট হবে। মসনদে আহমদে রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সূরা বাকারার শেষ আয়াত আরশের তলদেশের ভাণ্ডার থেকে প্রদত্ত হয়েছে। ইতিপূর্বে কোন নবীকে এ আয়াত সমূহ দেয়া হয়নি।[১]

হযরত নোমান এবনে বশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আসমান যমীন সৃষ্টির দু' হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ পাক লিপিবদ্ধ করেছেন যে, সূরা বাকারার শেষ দু' আয়াত যে ঘরে তিনদিন পাঠ করা হবে শয়তান সে ঘরের কাছে আসতে পারবে না।[২] (বগবী)

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৫
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৬৭
খোলাসাতুত তাফাসীর খন্ড-১-পৃষ্ঠা- ২৩০

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যখন আমাকে সিদরাতুল মুনতাহায় (শবে মে'রাজে) নিয়ে যাওয়া হয় (সিদরাতুল মুনতাহা ষষ্ঠ আসমানে অবস্থিত। জমিন থেকে সমস্ত আমল সিদরাতুল মুনতাহায় পৌছে আর তা নিয়ে নেয়া হয় আর উপর থেকে যে আদেশ জারী হয় তা-ও এই সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছানো হয় আর সেখান থেকে তা নিয়ে নেয়া হয়) তখন তিনটি জিনিস প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দান করা হয় (১) পাঁচ ওয়াক্তের নামায (২) সূরা বাকারার শেষ আয়াত সমূহ এবং (৩) এ উম্মতের যে সব লোক শেরক না করে তাদের কবীরা গুনাহ মাফ হওয়ার সুসংবাদ।[১] (মুসলিম শরীফ)

বায়হাকী সংকলিত একখানি হাদীসে রয়েছে যে ব্যক্তি সূরা বাকারা পাঠ করবে তাকে জান্নাতে মুকুট পরানো হবে।

দায়লামী হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। দু'টি আয়াত যা পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারার শেষে রয়েছে এ আয়াত সমূহ শাফাআত করবে, এ দু' আয়াত আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয়।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াত সমূহের ফজিলতে একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন আমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট উপবিষ্ট ছিলাম, হযরত জীব্রাঈল (আঃ)-ও উপস্থিত ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ আসমান থেকে একটি ভয়ংকর আওয়াজ আসল। জীব্রাঈল (আঃ) তখন উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং বললেনঃ আসমানের এমনি একটি দ্বার উন্মুক্ত হলো যা ইতিপূর্বে উন্মুক্ত হয়নি, তখন সে দ্বার দিয়ে একজন ফেরেশতা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলেন এবং বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি সন্তুষ্ট হোন। আপনাকে এমন দুটি নূর প্রদান করা হয়েছে যা ইতোপূর্বে কোন নবীকে প্রদান করা হয়নি তা হলো সূরা ফাতেহা এবং সূরা বাকারার শেষ আয়াত সমূহ, এর প্রত্যেকটি অক্ষরে আপনাকে নূর প্রদান করা হবে। (মুসলিম শরীফ)[২]

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন এর পূর্ববর্তী আয়াতে-

وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ الاٰية

আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে "তিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সমস্ত বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত"।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৬৬
খোলাসাতুত তাফাসীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা- ২৩০
তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা- ১৬৭-৬৮
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা- ৩৬
খোলাসাতুত তাফাসীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা- ২১০

এরপর আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

آمَنَ الرَّسُوْلُ الاية

এর তাৎপর্য হলো, আল্লাহ্ পাক যেন মোমেনদের গুণ প্রকাশ করে এরশাদ করেছেন যে যদিও আমি তোমাদের সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে অবগত কিন্তু আমি তোমাদের মন্দ অবস্থা প্রকাশ করব না; বরং তোমাদের প্রশংসনীয় অবস্থা প্রকাশ করব যাতে তোমরা উপলব্ধি করতে পার যেভাবে আমার ক্ষমতা, জ্ঞান এবং কুদরত পরিপূর্ণ তেমনি আমার দান, রহমতও সম্পূর্ণ, আর এ সত্য প্রকাশিত হচ্ছে তোমাদের গুণাবলী প্রকাশ্যের মাধ্যমে এবং তোমাদের মন্দ অবস্থা গোপন রাখার মাধ্যমে।

ইমাম রাজী (রহঃ) এ আয়াত সমূহের তফসীরে আরও বলেছেন যে এ সূরার প্রারম্ভে মুত্তাকীদের যে বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে তার একটা বিশেষ সামঞ্জস্য রয়েছে সূরার সর্বশেষ আয়াত সমূহের সঙ্গে, কেননা সূরা বাকারার শুরুতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

অর্থাৎ মুত্তাকী বা পরহেযগার সেসব লোক যারা অদৃশ্য বিষয় সমূহের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করে, যারা নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে আর এ সূরার উপসংহারে সেই ঈমানের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ

সকলেই ঈমান এনেছে আল্লাহ্ পাকের প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি এবং তাঁর কিতাব সমূহের প্রতি এবং তাঁর রসূলগণের প্রতি। আর এমনি সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় আলোচ্য আয়াতের এ বাক্যেও

وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا

অর্থাৎ মোমেনগণ বললো, আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি আর একথাটি সূরার শুরুতে বলা হয়েছে-

وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ الاية

বাক্য দ্বারা অর্থাৎ তারা নামায কায়েম করে ও আল্লাহর প্রদত্ত রিয্ক থেকে দান করে, আর এটিইতো মেনে নেয়া তথা আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা।

এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

অর্থাৎ- হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে ক্ষমা কর আর তোমার নিকটই তো আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। এ কথাটিকেই সূরার শুরুতে এভাবে এরশাদ হয়েছেঃ

وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ

অর্থাৎ মুত্তাকীদের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হলো তারা আখেরাত তথা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে। এভাবে এ সুদীর্ঘ সূরার প্রথম এবং শেষ আয়াত সমূহের মধ্যে রয়েছে এক বিশেষ এবং বিস্ময়কর সামঞ্জস্য।[১]

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ

অর্থাৎ পবিত্র কোরআনের মাধ্যেমে আল্লাহ পাকের যে মহান বাণী তাঁর প্রিয় রসূলের নিকট অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি সর্বপ্রথম ঈমান এনেছেন স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, সাধারণ মানুষের ঈমান এবং আল্লাহর নবীর ঈমানের মধ্যে আসমান-যমীনের পার্থক্য রয়েছে। এরপর এরশাদ হয়েছেঃ

وَالْمُؤْمِنُوْنَ

অর্থাৎ মোমেনগণও ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করেছে আল্লাহ পাকের মহান বাণী কোরআনে করীমের প্রতি, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের প্রতি। অতঃপর কি কি বিষয়ের উপর ঈমান আনা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে আর তা হলো চারটি বিষয়, এরশাদ হয়েছেঃ

كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ

অর্থাৎ সকলেই ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর নিকট থেকে অবতীর্ণ কিতাব সমূহের প্রতি এবং তাঁর প্রেরিত রসূলগণের প্রতি।

আলোচ্য আয়াতে সর্বপ্রথম আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্তা, তাঁর একত্ববাদ বা তওহীদ এবং তাঁর যাবতীয় গুণাবলীর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপনের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, অতএব তওহীদ বিরোধী যাবতীয় মতবাদের বাতুলতা প্রমাণিত

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা- ১২৭

হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে নাস্তিকতার ভয়াবহতাও ঘোষিত হয়েছে এবং মানবতার চরম অধঃপতন পৌত্তলিকতা, নাস্তিকতা এবং সভ্যতার ক্রমবিকাশের প্রধানতম অন্তরায় অংশীবাদ থেকে আত্মরক্ষা করার তাগিদ করা হয়েছে এ বাক্যে। যারা বিশ্ব সৃষ্টির পতি দৃষ্টিপাত করে, সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে একটু চিন্তা ও গবেষণা করে তারা সর্ব শক্তিমান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের অনন্ত অসীম কুদরত হেকমত সচক্ষে প্রত্যক্ষ করে এবং তাঁর অস্তিত্ব এবং একত্ববাদে পূর্ণ বিশ্বাসী হয়ে তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে। অহরহ তাঁর যে অফুরন্ত নেয়ামত ভোগ করে তার জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এটিই আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের বৈশিষ্ট্য। আর এ বৈশিষ্ট্য অর্জনের মধ্যেই রয়েছে মানব জীবনের পরম সাফল্য। এরপর এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَلٰئِكَتِهٖ

অর্থাৎ তারা আল্লাহর প্রতি ঈমানের পর তাঁর ফেরেশতাদের প্রতিও ঈমান আনে, কেননা ফেরেশতাদের মাধ্যমেই আল্লাহ পাক তাঁর রসূলগণের নিকট ওহী প্রেরণ করেছেন। ফেরেশতাগণ আল্লাহর একটি নূরানী সৃষ্টি। তাদের দ্বারা আল্লাহ পাকের নাফরমানী সম্ভব নয়। তাঁরা সর্বদা আল্লাহ পাকের অনুগত, তাঁর হুকুম পালনে ব্যস্ত, তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত, তাঁর জিকরে মশগুল। وَكُتُبِهٖ - তারা আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থ সমূহের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করেছে। যুগে যুগে মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ পাক যেমন নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন তেমনি হেদায়েতের জন্যে, বিশ্ব মানবের সার্বিক কল্যাণ সাধণের লক্ষ্যে নাযিল করেছেন আসমানী কিতাব সমূহ। এ কিতাব হলো চারটি তওরাত, যবুর, ইঞ্জিল এবং কোরআনে করীম। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং নবীগণের দলপতি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব কোরআনে করীম। সমস্ত আসমানী কিতাবের সত্যতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা হলো পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা।

وَرُسُلِهٖ

অর্থাৎ তারা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ পাকের প্রেরিত রসূলগণের প্রতি এবং তারা বলে-

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ

অর্থাৎ আমরা আল্লাহর রসূলগণের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য করিনা, এরপর মোমেনগণ বলে-

وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا

হে আল্লাহ! আমরা তোমার বিধি-বিধান শ্রবণ করেছি এবং তোমার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেছি, হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং অবশেষে আমাদেরকে তো তোমার নিকটই ফিরে আসতে হবে। অতএব, তোমার ক্ষমা ব্যতীত কোন গত্যন্তর নেই, তোমার দয়া ব্যতীত আমাদের কোন উপায় নেই, তুমি বিনা আমাদের কেউ আপন নেই।

এরপর আল্লাহ্ পাক তাঁর মোমেন বন্দাদেরকে এ সুসংবাদ দিয়েছেন যে, কোন মানুষকে তার সাধ্যাতীত কষ্ট দেয়া হবে না। এরশাদ হয়েছেঃ

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

অর্থাৎ কোন মানুষকে আল্লাহ্ পাক তার সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্ট দেন না, সে যা সৎ কাজ করবে তার বিনিময় পাবে আর যা মন্দ কাজ করবে তার শাস্তি তাকে ভোগ করতে হবে। এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে মানব মনে যে সব অনিচ্ছাকৃত ধারণা বা ভাবনার অবতারণা হয় তার জন্যে হিসাব দিতে হবে। এ আয়াত দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানী সুফীগণ এ সত্য উপলব্ধি করেছেন যে আল্লাহর পথের পথিক মাত্রকে তার অবস্থা মোতাবেক সাধনার নির্দেশ দিতে হবে, এমনিভাবে সাধকের মনে আল্লাহ্ পাকের নূরের তাজাল্লী তার অবস্থা মোতাবেকই প্রকাশিত হয়ে থাকে। অতএব, এতে কম বেশী হলে চিন্তিত হওয়া উচিত নয়।

পবিত্র কোরআন সুস্পষ্ট ভাষায় এ সত্য বারে বারে ঘোষণা করেছে যে মানুষের কর্মই তার ভবিষ্যতকে উজ্জল বা অন্ধকার করবে অর্থাৎ সৎ কর্মের শুভ পরিণতি সে লাভ করবে এবং তার পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগী শান্তিময় হবে। পক্ষান্তরে মানুষের মন্দ কাজের পরিণতিতে তাকে পরকালীন জিন্দেগীতে কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে আর একথাটিই এরশাদ হয়েছে এ আয়াতে—

لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَااكْتَسَبَتْ

এরপর আল্লাহ্ পাক মোমেনদের দোয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে এভাবে দোয়া করার শিক্ষা দিয়েছেন, কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দোয়াই হলো মূল বস্তু। মানুষ যখন দরবারে এলাহীতে দু' হাত তুলে মুনাজাত করে, মিনতি জানায়, নিজের অসহায়ত্ব থাকে তার কাছে সুস্পষ্ট, সে উপলব্ধি করে মর্মে মর্মে যে আমি নিতান্ত অসহায় নিরুপায়, আল্লাহ্ পাকের রহমত ব্যতীত আমার

নেই কোন উপায়, তাই সে দরবারে এলাহীতে তাঁর দয়া মায়া লাভের জন্যে কান্নাকাটি করতে থাকে। আর মানব মনে এ অবস্থা সৃষ্টির হওয়াই হলো সকল এবাদতের উদ্দেশ্য। তাই আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন দয়া করে তাঁর মহান দরবারে মিনতি জানাবার পন্থা শিক্ষা দানের মাধ্যমে এ সূরা শেষ করেছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا

হে আমাদের পরওয়ারদেগার! যদি আমাদের ভুল-ত্রুটি হয় তবে ধর পাকড় করোনা, পূর্বেকার উম্মতের ন্যায় আমাদের প্রতি কঠিন কঠোর নির্দেশ নাযিল করো না। হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে এমন নির্দেশ দিওনা যা পালনের শক্তি আমরা রাখি না, আমাদেরকে মাফ করে দিও, আমাদেরকে মাগফেরাত দান করো আর আমাদের প্রতি তোমার করুণা ধারা বর্ষণ করো, তুমিই যে আমাদের মওলা, মালিক, অভিভাবক। অতএব, কাফের সম্প্রদায়ের উপর আমাদেরকে জয়যুক্ত করো। আমিন।

(আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ১৮ই জিলহজ্জ ১৪০৬ হিজরী মোতাবেক ২৪ই আগষ্ট ১৯৮৬ রোজ রোববার সূরা বাকারার তফসীর সমাপ্ত হলো।)

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১২১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আলে-এমরান

(মদীনা শরীফে অবতীর্ণ ঃ ২০ রুকু ২০০ আয়াত)

سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرَانَ مَدَنِيَّةٌ وَّهِيَ مِائَتَا اٰيَةٍ وَّعِشْرُوْنَ رُكُوْعًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

الٓمّٓ ① اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۙ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ② نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ

بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ③

مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُوانْتِقَامٍ ④

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ⑤

هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا

هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ⑥

তরজমা

(১) আলিফ লাম মীম।

(২) আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সর্বদা বিরাজমান।

(৩) তিনি (হে রসূল!) আপনার নিকট কিতাব নাযিল করেছেন যা পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের সত্যতা প্রমাণকারী। এবং তিনি ইতিপূর্বে মানব জাতির পথ-প্রদর্শক হিসেবে তওরাত ও ইঞ্জিল নাযিল করেছেন এবং তিনিই ফোরকান (পবিত্র কোরআন) নাযিল করেছেন।

(৪) নিশ্চয় যারা আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহকে অবিশ্বাস করে তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

(৫) নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক, যাঁর নিকট আসমান যমীনের কোন বিষয়ই গোপন নেই।

(৬) তিনি যেভাবে ইচ্ছা মাতৃ-গর্ভে তোমাদের আকৃতি গঠন করেন, তিনি ভিন্ন অন্য কোন মা'বুদ নেই, তিনি প্রবল পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়।

এ সূরার নাম আল্ল এমরান। যেহেতু এতে আল্ল-এমরানের আলোচনা রয়েছে তাই এ নামকরণ করা হয়েছে।

সূরার ফজিলত

দুররে মনসুরে রয়েছে হযরত কা'ব বলেছেনঃ সূরা বাকারা এবং সূরা আল এমরান উভয়ে নিজ নিজ পাঠকদের সম্পর্কে বলবে হে প্রতিপালক! এ ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সূরা বাকারা এবং সূরা আলে এমরান জুমআর রাতে তথা বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে পাঠ করবে, আল্লাহ্ পাক তাকে সাত যমীন থেকে সাত আসমান পর্যন্ত সওয়াব দান করবেন।[১]

সূরা বাকারা ও আলে এমরানের মধ্যে সামঞ্জস্য

তফসীরকারগণ বলেছেন, সূরা বাকারা এবং সূরা আলে এমরানের মধ্যে তত্ত্বের দিক থেকে অতি সুন্দর সামঞ্জস্য রয়েছে। সূরা বাকারায় তৌহীদের সত্যতার উপর দলিল পেশ করা হয়েছে। আর সূরা আলে এমরানে এ পর্যায়ে সকল সন্দেহ দূর করা হয়েছে। সূরা বাকারায় মানব জাতির সৃষ্টির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, আর সূরা আলে এমরানে মানুষকে তার মাতৃ-গর্ভে আকৃতি দানের কথা এরশাদ হয়েছে।

সূরা বাকারায় আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির ইতিকথা বর্ণিত হয়েছে। আর এ সূরায় আদম সন্তানদের সৃষ্টির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এমনিভাবে সূরা বাকারা শুরু করা হয়েছে আদম (আঃ)-এর ঘটনা দ্বারা যাঁকে আল্লাহ্ পাক তাঁর বিশেষ কুদরতে পিতা-মাতা ব্যতীত সৃষ্টি করেছেন, আর এ সূরায় সৃষ্টির ব্যাপারে তার একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্ পাক পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করেছেন আর এজন্যেই এ সূরায় হযরত ঈসা (আঃ)-এর সৃষ্টির ব্যাপারে হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। সূরা বাকারায় হযরত আদম (আঃ)-এর উল্লেখ বিশেষভাবে করা হয়েছে, কেননা এটি সর্ব প্রথম সূরা আর হযরত আদম (আঃ) অস্তিত্ব লাভের ব্যাপারে সর্ব প্রথম মানুষ এবং আদি পিতা। যেহেতু হযরত ঈসা (আঃ)-এর ঘটনা বোঝাতে হযরত আদম (আঃ)-এর ঘটনার দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে তাই হযরত আদম (আঃ)-এর ঘটনা পূর্বেই

১। খোলাসাতুত তাফসীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা- ২৩১

সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত তফসীরকারগণ এ দুটি সূরার মধ্যে আরও তাত্ত্বিক সামঞ্জস্য খুজে বের করেছেন যেমন সূরা বাকারায় দোযখের বিবরণ দেয়ার পর এরশাদ হয়েছেঃ

أُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ

(অর্থাৎ দোযখ কাফেরদের জন্যে তৈরী করা হয়েছে) আর এ সূরার শেষে বেহেস্তের বিবরণ দিয়ে এরশাদ হয়েছেঃ

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ

অর্থাৎ সেই জান্নাত যার প্রস্থ হলো আসমান জমীনের সমান যা তৈরী করা হয়েছে পরহেযগারদের জন্যে। এমনিভাবে সূরা বাকারা শুরু করা হয়েছে মুত্তাকী বা পরহেযগার লোকদের বিবরণ দ্বারা আর তারাই যে অবশেষে সফলকাম হবে একথাও ঘোষণা করা হয়েছে। ঠিক এমনিভাবে এ সূরার উপসংহারে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক হয়তো তোমরা সফলকাম হবে"।[১]

অর্থাৎ আল্লাহ্র ভয় যার অন্তরে থাকবে, যে আল্লাহ্ পাককে ভয় করে জীবন যাপন করবে, আল্লাহ্ পাক তাকে জীবন সাধনায় সাফল্য মণ্ডিত করবেন অতএব, জীবন-সংগ্রামের সাফল্যের জন্যে আল্লাহর ভয় হলো পূর্বশর্ত, উভয় সূরাতেই এ বিষয়টির ঘোষণা রয়েছে।

শানে নুযুল

নবম হিজরীতে নাযরানবাসী খৃষ্টানদের একটি দল মদীনায় আসে। তাদের সম্পর্কেই এ সূরার প্রথম ৮৩টি আয়াত নাযিল হয়। এবনে আবি হাতেম রবি এবনে আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন একদল খৃষ্টান প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়। তখন সূরা আলে-এমরানের এ আয়াত সমূহ নাযিল হয়।

এবনে এসহাক বর্ণনা করেছেনঃ আমাকে মোহাম্মদ এবনে যাহাল এবনে আবি উমামা (রাঃ) বলেছেন যে নাযরানের খৃষ্টানদের প্রতিনিধি দল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে প্রশ্ন করে। তখন তাদের সম্পর্কে সূরা আলে এমরানের প্রথম আশিটি আয়াত নাযিল হয়।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৭৩

আল্লামা বগবী (রঃ) কালবী এবং রবি এবনে আনাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেনঃ এ আয়াত সমূহ নাযরানের প্রতিনিধি দল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এ প্রতিনিধি দলের সংখ্যা ছিল ষাট। তারা উষ্ট্রের উপর আরোহণ করে এসেছিল। ষাটজনের এই দলের মধ্যে চৌদ্দজন ছিল উপনেতা। আর তিনজন ছিল নেতা। আহকেব নামক এক ব্যক্তি ছিল দলীয় প্রধান যার পরামর্শ ব্যতীত দলের কেউ কোন কাজ করত না। আহকেবের প্রকৃত নাম ছিল আবদুল মাসীহ্। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন আছরের নামায আদায় করেছেন তখন তারা মসজিদে প্রবেশ করে। তারা অত্যন্ত মূল্যবান এবং সুন্দর পোশাকে সুসজ্জিত ছিল। তাদের নামাযের সময় হওয়ায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুমতি লাভ করে তারা পূর্ব দিকে মুখ করে নিজেদের নামায আদায় করে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ইসলাম কবুল করার আহ্বান জানালেন। তারা বলল আমরা তো আপনার আগমনের পূর্বেই ইসলাম কবুল করে ফেলেছি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তোমরা অসত্য কথা বলেছ, তোমাদেরকে যে বিষয়টি ইসলাম থেকে বিরত রাখছে তা হলো তোমরা ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্র পুত্র বলে দাবী করে থাক। তোমরা ক্রুসেডের পূজা কর এবং শুকরের গোশত খাওয়াকে হালাল বলে মনে কর। তখন তারা বলল, যদি আল্লাহ্ পাক ঈসা (আঃ)-এর পিতা না হন তাহলে তাঁর পিতা কে? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমরা কি জান না যে আমাদের প্রতিপালক চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। আর ঈসা (আঃ) মৃত্যুমুখে পতিত হবেন। খৃষ্টানগণ বলল একথা সত্য। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তোমরা কি জান না, আমাদের প্রতিপালক সব কিছুর নিয়ন্ত্রণকর্তা, সকলের নেগাহবান এবং রিয্কদাতা। তারা বলল হ্যাঁ, একথাও সত্য। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, এসব কাজের কোনটি ঈসা (আঃ)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে কি? খৃষ্টান প্রতিনিধিদল বলল, না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ তোমরা কি জান না যে, আল্লাহ্ পাকের নিকট আসমান যমীনের কোন কিছুই গোপন নেই। তখন তারা বলল, জানব না কেন? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তাহলে তোমরা বল ঈসা (আঃ)-কে যে খাছ এলম আল্লাহ পাক দান করেছেন তা ছাড়া এসব বিষয় তিনি কিছু কি জানতেন? তারা বলল না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আমাদের প্রতিপালক তাঁর ইচ্ছা মোতাবেক ঈসা (আঃ)-কে মাতৃ-গর্ভে আকৃতি দান করেছেন, আমাদের প্রতিপালক পানাহার করেন না, প্রতিনিধি দল বলল জ্বী হ্যাঁ। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তোমরা কি একথা উপলব্ধি কর না যে ঈসা (আঃ)-কে তাঁর মাতা

এভাবেই গর্ভে ধারণ করেছেন, যেভাবে মায়েরা ধারণ করেন। আর এভাবেই তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছেন যেভাবে সাধারণতঃ ভূমিষ্ঠ হয় আর ঈসা (আঃ)-কে এভাবেই আহার প্রদান করা হয়েছে যেভাবে শিশুদেরকে প্রদান করা হয় আর ঈসা (আঃ) পানাহার করতেন। প্রস্রাব পায়খানাও করতেন। প্রতিনিধি দল বলল হ্যাঁ এসব কথা আমরাও জানি। তখন তিনি এরশাদ করলেন ঃ তাহলে তোমরাই বল তোমাদের দাবী মোতাবেক ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র কি করে হতে পারেন? একথার পর প্রতিনিধি দল নীরব হয়ে যায়। তখন আল্লাহ্ পাক সূরা আলে এমরানের প্রথম ৮০টি আয়াত নাযিল করেন।[১]

الٓمٓ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ

'আলিফ লাম মীম'। এ অক্ষরগুলোকে মোকাত্তাআত বলা হয়। এ সম্পর্কে সূরা বাকারার শুরুতে আলোচনা হয়েছে। যেভাবে সূরা বাকারায় ইহুদীদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে তেমনি এ সূরায় খৃষ্টানদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

খৃষ্টানদের বাতিল আকীদা

এ সূরায় ঈসা বা খৃষ্টানদের বাতিল আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদের বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে তাদের ধারণা অত্যন্ত ভ্রান্ত। তারা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ পথভ্রষ্ট, কেননা তারা মনে করে ঈসা (আঃ) স্বয়ং খোদা বা খোদার পুত্র অথবা তিনি তিনজন খোদার অন্যতম (নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক), বলাবাহুল্য এর চেয়ে অলীক ভিত্তিহীন বাজে কথা আর কিছুই হতে পারে না। ইয়েমেনের নাযরান নামক স্থানের যে খৃষ্টান প্রতিনিধি দল দশম হিজরীতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান দরবারে হাযির হয় তাদেরকে তিনি নিরংকুশ তৌহীদের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানান। তখন এ সূরা নাযিল হয়। তাই এ সূরার শুরুতেই ঘোষিত হয়েছে তৌহীদের কথা এবং খৃষ্টানদের ভ্রান্ত ও অমূলক কথার প্রতিবাদে এরশাদ হয়েছে- 'আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি আউয়াল, তিনি আখের, মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তাঁর বিদায় নাই, বিনাশ নাই, তিনি সর্বত্র বিরাজমান, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, সর্বশক্তিমান, তিনিই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, মানব-দানব তথা সব কিছুর অস্তিত্ব তাঁরই দান। শুধু তাই নয়; বরং সমগ্র সৃষ্টি জগতের অস্তিত্ব রক্ষায়ও এক আল্লাহ পাকের মর্জিই কার্যকর।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা ১৭৯-৭০
খোলাসাতুত্যা ফাসীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা- ২৩১
তফসীরে কবীর খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৪৫-১৫৫

অথচ হযরত ঈসা (আঃ)-কে একদিন মৃত্যু বরণ করতেই হবে। অতএব, তাঁর সম্পর্কে খৃষ্টানদের ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এ সূরার প্রথম আয়াতের দুটি শব্দ অত্যন্ত তাৎপর্যবহ–

اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ

এটি আল্লাহ পাকের বৈশিষ্ট্য যে তিনি সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান। তিনি পূর্বে জীবিত ছিলেন এখন আছেন এবং সর্বদা জীবিত থাকবেন। মৃত্যুর কোন কল্পনাও তাঁর সম্পর্কে করা যায় না। এমনিভাবে “কাইয়ুম” শব্দটি দ্বারাও খৃষ্টানদের বাতিল ধর্ম বিশ্বাসের বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা যিনি স্বয়ং সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সমগ্র সৃষ্টি জগতের অস্তিত্বকে যিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনিই আল্লাহ পাক। অতএব, পবিত্র কোরআন এ আয়াত দ্বারা খৃষ্টানদের সকল ভ্রান্ত মতবাদের প্রতিবাদ করেছে। কেননা তাদের ভ্রান্ত ধারণা হলো তাদের ভাষায় “যেভাবে পুত্র পিতা ব্যতীত একা খোদা নয় (এনসাইক্লোপেডিয়া অফ রিলিজিয়ন এন্ড এথিক্স খন্ড-৭, পৃষ্ঠা ৫৩৬)”। নাউজুবিল্লাহ। তাদের ভ্রান্ত ধারণা হলো আল্লাহর পুত্র এবং আল্লাহ উভয়ে পরস্পর অংশীদার এবং একে অন্যকে মুখাপেক্ষী। কাইয়ুম শব্দটিতে রয়েছে খৃষ্টানদের এই বাতিল ধারণার সুস্পষ্ট প্রতিবাদ, এরপর এরশাদ হয়েছে যে আল্লাহ পাকই (হে রসূল!) আপনার প্রতি কোরআন নাযিল করেছেন যে কোরআন জ্ঞান সমৃদ্ধ, যুক্তি সঙ্গত, ন্যায় এবং সত্যের জীবন্ত প্রতীক, যা পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের সত্যতা ঘোষণাকারী যা মানব জাতির জন্যে পথ প্রদর্শক এবং যা সত্য-অসত্য, হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায় এবং হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী। অতএব কল্যাণকামী, বাস্তববাদী এবং পরিণামদর্শী মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো এক আল্লাহর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন ও আনুগত্য প্রকাশ করা। কিন্তু যারা এ কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয় তাদের শোচনীয় পরিণাম সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে-

পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে–

اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا

অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহকে অবিশ্বাস করে আল্লাহর একত্ববাদকে অস্বীকার করে তাঁর অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হয় তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন ও কঠোর শাস্তি। আর আল্লাহ পাক প্রবল পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। অতএব, অবাধ্য কাফেরদের শাস্তি অবধারিত।

اِنَّ اللّٰهَ لَا یَخْفٰی عَلَیْهِ شَیْءٌ الاٰیة

ইতোপূর্বে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে তিনি হাইয়ুন কাইউম, অর্থাৎ তিনি চিরঞ্জীব, তিনি সবার রক্ষাকর্তা। আল্লাহ পাকের এ বৈশিষ্ট্য আরও দুটি গুণের দাবীদার।

(১) তাঁর জ্ঞান হতে হবে সব কিছুর পরিবেষ্টনকারী। কেননা তিনি সকলের প্রয়োজনের আয়োজন করেন, তিনি মহান দাতা, তাঁর দানে সকলেই ধন্য। অতএব, কার কি প্রয়োজন এ বিষয়ে অবগত থাকা তাঁর জন্যে স্বাভাবিক।

(২) শুধু জ্ঞান থাকা যথেষ্ট নয়, বরং বিশ্ব সৃষ্টির কল্যাণ সাধনের ক্ষমতাও তাঁর থাকতে হবে।

আলোচ্য আয়াতের মর্মকথা

মূলতঃ আলোচ্য আয়াতে এ দুটি কথাই ঘোষণা করা হয়েছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায়। এরশাদ হয়েছে, নিশ্চয় আসমান জমিনের কোন কিছুই আল্লাহ পাকের নিকট গোপন নয়, সব কিছুই তাঁর নখ দর্পণে। তাঁর জ্ঞানের সীমা নেই, শেষও নেই ঠিক এমনিভাবে আল্লাহ পাকের ক্ষমতাও অনন্ত অসীম এবং অচিন্তনীয়। আয়াতে আসমান যমীনের উল্লেখ এজন্যে করা হয়েছে যে মানুষ আসমান যমীনের বাইরে কোন কিছু চিন্তা করতে পারে না। অথচ আল্লাহ পাকের জ্ঞান শুধু বিশ্বব্যাপী নয়; বরং সর্বব্যাপী। সৃষ্টি জগতের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর কোন কিছুই আল্লাহ পাকের মহান দরবারে গোপন নেই, সবই প্রকাশ্য, সবই দেদীপ্যমান। এমনিভাবে আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমত, তাঁর ক্ষমতা সবার উপরে এবং সর্বত্র বিরাজমান। সমগ্র সৃষ্টি জগত তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, সবই তাঁর কর্তৃত্বাধীন, কোন কিছুই তাঁর নাগালের বাইরে নয়। এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর একজন সৃষ্টি, খৃষ্টানদের ভ্রান্ত মতবাদ হলো তিনি আল্লাহর পুত্র (নাউজুবিল্লাহ মিন জালেক), তিনি যে জ্ঞান আল্লাহর দরবার থেকে লাভ করেছেন তার বেশী কিছুই জানতেন না, আর আল্লাহ পাকই তাঁর বিশেষ কুদরতের মহিমা প্রকাশ করে পিতার উসিলা ব্যতীত তাঁর সম্মানিত মাতার উদরে তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। আর এ কাজ তাঁর জন্যে অতি সহজ, কেননা তিনি সর্বশক্তিমান। আল্লাহ পাক পিতা মাতা ব্যতীত হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন এবং পিতা ব্যতীত শুধু মাতার মাধ্যমে হযরত ঈসা (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন এবং সাধারণতঃ পিতা মাতার উসিলায় মানুষকে সৃষ্টি করে থাকেন এই সমস্ত সম্ভাব্য সৃষ্টি প্রক্রিয়া সবই আল্লাহ পাকের জন্যে সহজতর।[১]

১। তফসীরে হক্কানী খন্ড-১, পারা-৩, পৃষ্ঠা-৩৩
তফসীরে কবীর খন্ড- ৭, পৃষ্ঠা- ১৬২-৬৩

আলোচ্য আয়াতে যমীন এবং আসমানের ব্যাপারে প্রথমতঃ যমীনের উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ড যমীনে হয়ে থাকে এবং পরে আসমানে তার বিবরণ পেশ করা হয়।[১]

هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ

তিনিই সেই আল্লাহ্ পাক যিনি তোমাদেরকে যেমন ইচ্ছা মাতৃ-গর্ভে তোমাদের আকৃতি প্রদান করেন, তোমাদের চেহারা, নাক-নকশা- নমুনা তাঁর ইচ্ছা মোতাবেক তৈরী করেন। নর ও নারী, সুন্দর ও অসুন্দর, সাদা-কালো সবই তাঁর ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, সর্ব গুণাকর সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের সৃষ্টি নৈপূণ্যের মহিমা বুঝবার ক্ষমতার কার আছে? তিনি এক ফোটা অপবিত্র পানিকে বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবর্তন করার পর তাকে একটি জীবন্ত মানুষে পরিণত করেন, কোন সময় কি তাঁর জ্ঞানের বা ক্ষমতার অভাব হতে পারে? না কোন সময়ই না। কেননা তিনি সর্বশক্তিমান, তিনিই সর্বত্র বিরাজমান। তাঁর অনন্ত অসীম ক্ষমতা সকল অবস্থায় বিদ্যমান। সমগ্র সৃষ্টি জগত তাঁর মুখাপেক্ষী আর তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। অতএব, যে আদম সন্তান মাতৃ-গর্ভের অন্ধকারে কাল যাপন করে এসেছে আর পৃথিবীতে অন্য দশজন মানুষের ন্যায় পানাহার করে মল-মূত্র ত্যাগ করে সে কিভাবে সেই পবিত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের পুত্র হতে পারে (নাউজুবিল্লাহ মিন জালেক)?

هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

তিনি পরাক্রমশালী, তিনি বিজ্ঞানময়, তাঁর ক্ষমতা অচিন্তনীয়, তাঁর কুদরত অনন্ত অসীম।

মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়া

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে আল্লাহর সত্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির প্রক্রিয়া এই যে, তোমরা চল্লিশ দিন পর্যন্ত মাতৃ-গর্ভে শুক্র রূপে অবস্থান কর আর এ পরিমাণ সময় জমাট রক্ত হিসেবে এবং এমনিভাবে পর্যায়ক্রমে তোমরা মাংস-পিণ্ডে পরিণত হও। এরপর আল্লাহ পাক চারটি কথা লিপিবদ্ধ করার জন্যে ফেরেশতা প্রেরণ করেন। আল্লাহ পাকের হুকুম মোতাবেক সেই ফেরেশতা এ ব্যক্তির রিযক এবং ভাল-মন্দ আমল, বয়স এবং নেক বা বদ লিপিবদ্ধ করে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কোন

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা- ১৭৫

কোন লোক জান্নাতী লোকদের আমল এত বেশী করে যে তার মধ্যে আর জান্নাতের মধ্যে শুধু এক গজের তফাত থাকে। অবশেষে তার জন্যে নির্দিষ্ট তকদীর অথবা অদৃষ্ট কার্যকর হয়। আর সে দোযখীদের ন্যায় কাজ করতে থাকে এবং দোযখে গমন করে। আর কোন কোন লোক দোযখীদের কাজ এত অধিক পরিমাণে করে যে দোযখ এবং তার মধ্যে শুধু এক গজের দূরত্ব থাকে, এরপর তার তকদীর বা অদৃষ্ট প্রাধান্য বিস্তার করে এবং সে জান্নাতী কাজ করে এবং জান্নাতে প্রবেশ করে।[১]

হযরত যাবের এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণিত এবং মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে যে সোরাকা এবনে মালেক (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরয করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের দ্বীন সম্পর্কে কিছু বলুন। আমরা বর্তমানে যে আমল করছি তার অবস্থা কি? মানব জীবন সম্পর্কে কি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে না ভবিষ্যতে আমলের প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে?

তিনি এরশাদ করলেনঃ না চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। তকদীর লিপিবদ্ধ হওয়ার পর কলমের কালি শুস্ক হয়ে গেছে। তখন সোরাকা (রাঃ) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, তবে আমল কি কাজে লাগবে? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তোমরা কাজ করতে থাক। আল্লাহ পাক যাকে যে কাজের জন্যে তৈরী করেছেন তার জন্যে সে কাজ সহজ করা হয়।

هُوَ الَّذِىٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ
اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ
فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشٰبَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ
وَابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ ؔ وَالرّٰسِخُوْنَ
فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ
اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝٧ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا
وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝٨
رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ
الْمِيْعَادَ ۝٩

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৭৫

তরজমা

(৭) তিনিই সেই আল্লাহ! যিনি (হে রসূল!) আপনার নিকট কিতাব (কোরআন শরীফ) নাযিল করেছেন, যার কোন কোন আয়াত প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট অর্থ প্রকাশ করে। এ আয়াত সমূহ হলো এই কিতাবের মূল আর কিছু আয়াত আছে যার অর্থ অজানা বা অস্পষ্ট, অতঃপর যাদের অন্তর বাঁকা তারা অশান্তি সৃষ্টির নিমিত্ত অস্পষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যার অন্বেষণে ব্যস্ত হয়, অথচ আল্লাহ্ পাক ব্যতীত এর মর্ম আর কেউ জানে না এবং যারা জ্ঞানবান তারা বলে আমরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি, সমস্ত কিছুই আমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে অবতীর্ণ। এবং বুদ্ধিমানগণ ব্যতীত অন্য কেউ নসীহত কবুল করতে পারেনা।

(৮) হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি যখন আমাদের হেদায়েত করেছ তখন আর আমাদের অন্তরকে বক্র করোনা এবং তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর নিশ্চয় তুমিই পরম দাতা (তুমিই সব কিছু দিয়ে থাক)-৯হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি মানুষকে সেদিন সমবেত করবে যেদিন সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তাঁর কথার বরখেলাফ করেন না।

তফসীরুল কোরআন

নাযরান এলাকার খৃষ্টান প্রতিনিধি দল যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথার জবাব দিতে অক্ষম হলো তখন তারা বললঃ[১]

الست تزعم ان عيسى كلمة الله تعالى وروح منه؟ قال: بلى قالواحبسنا ذالك

যাহোক আপনিতো হযরত ঈসা (আঃ)-কে রুহুল্লাহ্, কলেমাতুল্লাহ্ বলে স্বীকার করেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ হ্যাঁ। তখন তারা বলল আমাদের দাবীর পক্ষে একথাটুকুই যথেষ্ট। তাদের একথা যে বাতিল এবং অসত্য তার সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। এ সম্পর্কে অর্থাৎ পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহ সম্পর্কে একটি মৌলিক নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। এ নীতি অনুধাবনে মাধ্যমই এক্ষেত্রে সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটতে পারে।

هُوَ الَّذِىٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ

মোহকাম ও মুতাশাবিহ'র ব্যাখ্যা

তিনিই সেই আল্লাহ পাক (হে রসূল!) যিনি আপনার প্রতি পবিত্র কোরআন

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা- ১৭৭

নাযিল করেছেন, যার কোন কোন আয়াত মোহকাম এবং কোন আয়াত মুতাশাবিহ অর্থাৎ পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহ দু' ভাগে বিভক্ত (১) যে আয়াত সমূহের অর্থ সুস্পষ্ট, প্রকাশ্যে এ আয়াত সমূহ বুঝতে কোন জটিলতা দেখা দেয় না এবং এতে একাধিক অর্থের সম্ভাবনা থাকে না অথবা একাধিক অর্থের সম্ভাবনা থাকলেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অর্থ বর্ণনার কারণে তা সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে। পবিত্র কোরআনের পরিভাষায় এ আয়াত সমূহের নাম মোহকাম আর এই মোহকাম আয়াত সমূহ হলো পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার মূল ভিত্তি। মোহকাম আয়াত যেমন-

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ

এমনিভাবে-

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

আর সেই আয়াত সমূহকেও মোহকাম বলা হয় যে আয়াত সমূহ সম্পর্কে একটু চিন্তা করলে তার অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যেমন

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ الايه

মোহাম্মদ এবনে জাফর এবনে যোবায়ের বলেনঃ মোহকাম সে আয়াত যার একই সুস্পষ্ট অর্থ হয়। একাধিক অর্থের সম্ভাবনা সেখানে থাকে না। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেনঃ মোহকাম সে আয়াত সমূহ যার অর্থ সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট, যাতে নাম মাত্রও অস্পষ্টতা নেই। পক্ষান্তরে যেসব আয়াতের অর্থ অস্পষ্ট, কোন ভাষাবিদ শুধু ভাষা জ্ঞানের কারণে এর অর্থ নির্ধারণ করতে পারে না যে পর্যন্ত না প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্ট ভাষায় তার ব্যাখ্যা দান করেন এই সমস্ত আয়াতের নামই 'মুতাশাবিহ'। যদি এ ধরনের শব্দের ব্যাখ্যা শরীয়ত প্রণেতা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তরফ থেকে করা হয় তবে এমন মুতাশাবিহকে "মুজমাল" বলা হয় যেমন সালাত, যাকাত, হজ্জ এবং ওমরাহ প্রভৃতি। আর যদি এমন শব্দের কোন ব্যাখ্যা প্রদান না করা হয় সেই শব্দগুলোকে ফেকাহ শাস্ত্রের পরিভাষায় "মুতাশাবিহ' বলা হয়। এর দৃষ্টান্ত হলো মুকাত্যায়াত অক্ষর সমূহ যথা আলীফ- লাম- মীম, আলীফ-লাম-রা, ক্বাফ, হা, ইয়া, আইন প্রভৃতি। এ অক্ষর সমূহের অর্থ আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলই জানেন। মানুষকে এর অর্থ জানানো হয়নি, আর আমলের সঙ্গে এ অক্ষরগুলো কোন সম্পর্কও

নেই।[১] অতএব, পাণ্ডিত্যের দাবীতে এ শব্দ সমূহের অর্থ নির্ধারণে ব্যস্ত না হওয়া যুক্তিসঙ্গত এবং নিরাপদ। এর অর্থ আমরা বুঝি না, একথা বুঝতে হবে আমাদের জ্ঞানের দৈন্য আছে, আমরা সব-জান্তা নই– এ সত্য উপলব্ধি করতে হবে। এ মুতাশাবিহ্ শব্দগুলোর অর্থ নির্ধারণে যে জটিলতা এবং অস্পষ্টতা রয়েছে তাতেও আল্লাহ পাকের বিরাট হেকমত রয়েছে। অতএব, একথা বিশ্বাস করতে হবে যে, এই সমস্ত কিছুই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

পবিত্র কোরআনের একখানি আয়াতে এরশাদ হয়েছে–

الٓرٰ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ

এতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র কোরআনের প্রত্যেকটি আয়াতই "মোহকাম" আর অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে-

كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا

যদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র কোরআনের সমস্ত আয়াতই মুতাশাবিহ্। আর আলোচ্য আয়াতে রয়েছে পবিত্র কোরআনের কিছু আয়াত মোহকাম, আর কিছু আয়াত "মুতাশাবিহ"। প্রশ্ন হলো আয়াতের এ বিবরণের ব্যাখ্যা কি? তত্ত্বজ্ঞানী তফসীরকারগণ এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এভাবে যে, পবিত্র কোরআনের সমস্ত আয়াত মোহকাম হওয়ার তাৎপর্য হলো সমস্ত আয়াতের অর্থ সংরক্ষিত রয়েছে। কেউ এর ব্যাখ্যায় কোন প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবে না, আর কোন যুগে কেউ পবিত্র কোরআনের অর্থও বিকৃত করতে পারবে না, এর মোকাবেলাও করতে পারবে না।

আর সমস্ত কোরআন মুতাশাবিহ্ হওয়ার তাৎপর্য হলো পবিত্র কোরআনের বর্ণনা–শৈলীর সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতায় পবিত্র কোরআনের সমস্ত আয়াত সমূহ একটি আরেকটির অনুরূপ। প্রত্যেকটি আয়াতই সৌন্দর্য মণ্ডিত, ভাষার অলংকারে সমৃদ্ধ, অর্থপূর্ণ, তাৎপর্যবহ।

আলোচ্য আয়াতে যে পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এর তাৎপর্য হলো কোন কোন আয়াতের অর্থ সুনির্দিষ্ট আর কোন আয়াতের অর্থ মানুষের জ্ঞানের অতীত। এখানে মানুষের জ্ঞানের দৈন্য সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়।[২]

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা- ৭৯
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৭৮
তফসীরে কবীর খন্ড- ২, পৃষ্ঠা-১৬৮

فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ

"যাদের অন্তর বাঁকা, তারা মুতাশাবিহ আয়াতের অর্থ নির্ধারণে এবং গোমরাহীর প্রচার প্রসারে আত্মনিয়োগ করে"।

যেমন আলোচ্য বিষয়ে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা হলো-

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ

"নিশ্চয় আল্লাহ্ পাকের নিকট ঈসা (আঃ)-এর দৃষ্টান্ত আদম (আঃ)-এর ন্যায়। তিনি আদমকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করলেন তৎপর বললেন হও, তাতে আদম হয়ে গেল"। আরও এরশাদ হয়েছে–

ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِىْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ

অর্থাৎ "এ হলো মরয়ম পুত্র ঈসা (আঃ) যে বিষয়ে তোমাদের সন্দেহ সে সম্পর্কে এটি প্রকৃত সত্য কথা"। আরও এরশাদ হয়েছে-

اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ

"বস্তুত ঈসা (আঃ) আমারই কৃপা-ধন্য গোলাম ব্যতীত কেউ নয়"।

আরও এরশাদ হয়েছে–

مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ سُبْحٰنَهٗ

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক মহিমাময়, তিনি সন্তান সন্ততি ধারণের বহু উর্দ্ধে, এটি তাঁর শানের খেলাফ।

পবিত্র কোরআনে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে এই সমস্ত মোহ্কাম আয়াতে সুস্পষ্ট ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও যাদের অন্তর বাঁকা, যারা পথভ্রষ্ট, তারা একটি মুতাশাবিহ আয়াতের অর্থ নিজের খেয়াল খুশি মত করে, হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে আপত্তিকর তথা ভ্রান্ত ধারণা প্রকাশ করে, আয়াতটি হলো-

وَكَلِمَتُهٗٓ اَلْقٰهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ

অর্থাৎ "তিনি মরয়মের প্রতি নিক্ষিপ্ত আল্লাহর একটি কলেমা এবং তাঁর রুহ"।

এটি মুতাশাবিহ্ আয়াত। এর অর্থ আল্লাহ পাকই জানেন কিন্তু দূরাত্মা পথভ্রষ্ট নাযরানের খৃষ্টান প্রতিনিধি দল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথার জবাব না দিতে পেরে এ মুতাশাবিহ্ আয়াতের কথাটি উল্লেখ করে বললো আপনি ঈসা (আঃ)-কে কলেমাতুল্লাহ ও রুহুল্লাহ মানেন কিনা? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন- কেন মানব না? তখন প্রতিনিধি দল বলল একথাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। তখন এ আয়াত নাযিল হলোঃ

فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ

অর্থাৎ এই খৃষ্টানদের অন্তর বাঁকা, তারা পথভ্রষ্ট, লক্ষ্যচ্যুত, তাই তারা এমন সব আপত্তিকর কথা বলে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) তাঁর তফসীরে মাজহারীতে এবং আল্লামা আলুসী (রহঃ) তফসীরে রুহুল মাআনীতে এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে অন্য একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কালবী (রহঃ) বলেছেনঃ এ আয়াত ইহুদীদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে যারা আবজাদের হিসেবে এ উম্মতের বয়স সম্পর্কে মন্তব্য করেছিল।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রঃ) বর্ণনা করেনঃ হাই এবনে আখতাব এবং কা'ব এবনে আশরাফ সহ ইহুদীদের একটি দল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলো এবং বললঃ আমরা জানতে পেরেছি আপনার প্রতি আলিফ লাম মীম নাযিল হয়েছে। আমরা আপনাকে শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি আল্লাহ পাক আপনার প্রতি এ বাক্যটি নাযিল করেছেন? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ হ্যাঁ। হাই বলল, যদি একথা সত্য হয় তবে আমি এতে আপনার উম্মতের বয়স বলে মনে করছি, আর এই সময় হবে ৭১ বছর। এতদ্ব্যতীত আরও কিছু কি আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এরশাদ করলেনঃ হ্যাঁ আলিফ লাম মীম ছোয়াদ নাযিল হয়েছে। তখন হাই এবনে আখতাব বললঃ তাহলে আপনার উম্মতের সময়কাল হবে ১৬১ বছর। এতদ্ব্যতীত আপনার প্রতি কি আরও কিছু নাযিল হয়েছে? তিনি এরশাদ করলেন ঃ হ্যাঁ আলীফ লাম রা, হাই এবনে আখতাব বললঃ তাহলে এই উম্মতের মুদ্দত হবে ২৩১ বছর। এরপর সে জিজ্ঞাসা করল আরও কিছু আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে কি? তিনি এরশাদ করলেনঃ হ্যাঁ। তখন সে বললঃ তাহলে এ উম্মতের মেয়াদ হবে ২৭১ বছর। আপনি যে আমাদের জন্যে বিপদ এনে দিলেন। আমরা বুঝতে পারছিনা যে এ উম্মতের জন্যে কম সময় নির্ধারণ করবো না বেশী। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৭৮-৭৯

এবনে জোরায়েহ (রহঃ)-এর মতে এ আয়াতের বক্তব্য মুনাফেকদের উদ্দেশ্যে, আর হাসান (রঃ) এর মতে এ আয়াতের বক্তব্য হলো খারেযীদের উদ্দেশ্যে। ইমাম কাতাদা (রঃ) যখন এ আয়াত পাঠ করতেন তখন বলতেন যদি এ আয়াত হারুরীয়া এবং সাবীয়া সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে না হয় তবে আমি জানি না যে এ আয়াত কার জন্যে এরশাদ হয়েছে? আর কারো কারো মতে এ আয়াত সকল বেদআত পন্থী লোকের উদ্দেশ্যেই নাযিল হয়েছে (বেদআত হলো এমন কাজ যা শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত নয় অথচ তাকে শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত মনে করা)। আল্লামা পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ পর্যন্ত যত সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখিত হয়েছে যথা খৃষ্টান, ইহুদী, মুনাফেক, খারেযী, হারুরীয়া, সাবীয়া এবং বেদআতী এককথায় সবই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

প্রিয়নবী (সঃ)-এর সতর্কবাণী

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াত

هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ......اُولُوا الْاَلْبَابِ

পর্যন্ত পাঠ করে বলেছিলেনঃ যদি তোমরা এমন লোক দেখ যে পবিত্র কোরআনের মুতাশাবিহ আয়াতের পেছনে পড়েছে তখন বুঝে নেবে যে এরাই সেসব লোক যাদের কথা এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, আর এমন লোকদের থেকে তোমরা সতর্ক থাকবে।[১] (বোখারী শরীফ)

হযরত আবু মালেক আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে আমি নিজে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছিঃ আমার উম্মতের ব্যাপারে আমি শুধু তিনটি বিষয়ে অত্যন্ত চিন্তিত, তন্মধ্যে একটি হলো কেউ কেউ পবিত্র কোরআন খুলে তার মুতাশাবিহ আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করবে, অথচ এ আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা এক আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কেউ জানে না। যারা সত্যিকার অর্থে জ্ঞানী তারা শুধু একথা বলে যে আমরা কোরআনে করীমের প্রতি ঈমান এনেছি। এর সবটুকুই আমাদের মালিক আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এসেছে। আর একথা সর্বজন বিদিত যে শুধু বুদ্ধিমান লোকেরাই নসীহত গ্রহণ করে।[২] আর যে দুটি বিষয় নিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম চিন্তিত ছিলেন তাহলো অধিক পরিমাণে অর্থ সম্পদ লাভ হওয়া। এর পরিণামে পরস্পরের

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা- ৩৯
২। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা- ১৭৯

মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ, কলহ দ্বন্দ্ব শুরু হবে। আর তৃতীয় বিষয় হলো লোকেরা এলম হাসিল করে তা বিনষ্ট করে দেবে।[১]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত মালেক এবনে আনাস (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামের মতে, মুতাশাবিহ আয়াতের অর্থ আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কেউ জানে না। যারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী তারা শুধু একথার প্রতি বিশ্বাস করে যে সব কিছু আল্লাহ পাকের তরফ থেকে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন তফসীর চার প্রকার–

(১) যা বুঝতে কারো অসুবিধা হয় না,

(২) যা আরববাসী তাদের ভাষা জ্ঞানের কারণে বুঝতে পারে,

(৩) যা শুধু যোগ্য আলেমগণ বুঝতে পারেন,

এবং (৪) যা আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কেউ কিছুই জানেনা।[২]

দক্ষ আলেম কে?

وَالرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ

অর্থাৎ যারা তত্ত্বজ্ঞানী, তথ্য সন্ধানী দক্ষ আলেম তারা বলে পবিত্র কোরআনের সমস্ত কথাই আমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে।

হাদীস শরীফে আছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয় দক্ষ আলেম কে? তিনি এরশাদ করেন যার শপথ সঠিক থাকে, যে সত্যবাদী, যার অন্তর সুরক্ষিত থাকে, যার উদর হারাম খাদ্য থেকে সংরক্ষিত থাকে, যে ব্যাভিচার থেকে দূরে থাকে সে সঠিক জ্ঞানী। (এবনে আবি হাতেম)

হাদীস শরীফে একথাও আছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিছু লোককে দেখলেন যে তারা পবিত্র কোরআনের ব্যাপারে কলহ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে। তখন তাদের উদ্দেশ্যে তিনি এরশাদ করলেনঃ শোন! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এমনিভাবে ধ্বংস হয়েছে। তারা আল্লাহর কিতাবের আয়াত সমূহের মধ্যে একটিকে আরেকটির বিরুদ্ধে বলে পরস্পর মত বিরোধ করেছে, অথচ আল্লাহর কিতাবের প্রত্যেকটি আয়াত একটি আরেকটির সত্যতা প্রমাণকারী। তোমরা আল্লাহর কিতাবে মতবিরোধ করে একটিকে আরেকটির মোকাবেলায় দাড় করাবে না। যা জান তা বল। (মসনদে আহমদ)

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪০
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা- ৪৫

আর এজন্যেই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন পরবর্তী আয়াতে এ দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন যেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের উপর সুদৃঢ় রাখেন।

এরশাদ হয়েছেঃ

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا

অর্থাৎ হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি যখন আমাদেরকে হেদায়েত দান করেছ, তখন আর আমাদের অন্তরকে বক্র করোনা। এবং তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর, আর এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ দোয়া করতেনঃ

يَامُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ

"হে অন্তর সমূহের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর সুদৃঢ় রাখ"।

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, হেদায়েত লাভের তৌফিক দেয়া না দেয়া আল্লাহ পাকের মর্জির উপর নির্ভরশীল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, এমন কোন অন্তর নেই যা আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। অতএব, আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হেদায়েতের তৌফিকের জন্যে দোয়া করা পরিণামদর্শী কল্যাণকামী মানুষের একান্ত কর্তব্য।

এ কর্তব্য পালনের তা'লীম দেয়া হয়েছে সূরা ফাতেহায় এবং হেদায়েতের জন্যে দোয়া প্রার্থী হওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে এভাবে-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

"হে প্রতিপালক! আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখাও"।

আর সরল সঠিক পথ বা সীরাতুল মুস্তাকীম হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পথ, কেননা আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

(হে রসূল!) নিশ্চয় আপনি সীরাতুল মুস্তাকীমের উপর রয়েছেন, আরও এরশাদ হয়েছে-

وَاِنَّكَ لَتَهْدِىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

(হে রসূল!) নিশ্চয় আপনি সীরাতুল মুস্তাকীমের দিকে হেদায়েত করেন। অতএব, অন্তরকে হেদায়েতের উপর সুদৃঢ় রাখার একটি মাত্র পথ হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا
أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿١٠﴾ كَدَأْبِ
آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ
اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١١﴾ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٢﴾ قَدْ كَانَ
لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ
كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ۚ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ
مَنْ يَشَاءُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿١٣﴾

তরজমা

(১০) নিশ্চয় যারা কাফের, তাদের ধন-দৌলত এবং সন্তান-সন্ততি আল্লাহ পাকের নিকট কোন বিষয়ই উপকারী হবে না আর তারাই দোযখের ইন্ধন।

(১১) ফেরাউনের দল এবং পূর্ববর্তীদের ন্যায় এরা আমার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করেছিল। ফলে আল্লাহ পাক তাদের পাপের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করেছেন এবং আল্লাহ পাক কঠোর শাস্তি দাতা।

(১২) (হে রসূল!) আপনি কাফেরদেরকে বলে দিন যে অদূর ভবিষ্যতে তোমরা পরাজিত হবে এবং তোমাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে, আর তা অত্যন্ত মন্দ আবাস-স্থল।

(১৩) নিশ্চয় তোমাদের সম্মুখে দুটি পরস্পর সংঘর্ষরত বাহিনীর দৃষ্টান্ত (বদরের রণাঙ্গণে) অতিবাহিত হয়েছে। একটি বাহিনী আল্লাহর রাহে লড়াই করছিল, অপরটি ছিল কাফেরদের। তারা স্পষ্ট দৃষ্টিতে মুসলমানদের দ্বিগুণ দেখছিল। আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করে থাকেন। নিশ্চয় এতে শিক্ষা রয়েছে সে সব লোকদের জন্যে যারা অন্তর-দৃষ্টিসম্পন্ন।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

ইমাম রাজী (রঃ) তাঁর সুবিখ্যাত তফসীরে লিখেছেনঃ পূর্ববর্তী আয়াতে মোমেনদের কথা, আল্লাহ পাকের মহান দরবারে মোমেনদের মিনতি এবং তাদের দোয়ার বিবরণ রয়েছে, আর এ আয়াতে কাফেরদের অবস্থা এবং তাদের জন্যে যে কঠোর শাস্তি অপেক্ষা করছে তার বিবরণ রয়েছে।

শানে নুযুল

এ আয়াত কার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, এ নিয়ে দুটি অভিমত রয়েছে–

(১) নাযরানের খৃষ্টান দলের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে, কেননা এ দলের আবু হারেসা এবনে আল কামা তার ভাইকে বলেছিলঃ আমি জানি, ইনি সত্যিই আল্লাহর রসূল। কিন্তু যদি আমি একথা প্রকাশ করি তবে রোমের বাদশাহ আমাকে যে ধন-সম্পদ এবং পদ মর্যাদা দান করেছেন সবই ছিনিয়ে নেবেন, তারই জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ

নিশ্চয় যারা কাফের, অবাধ্য, বিদ্রোহী, যারা মুতাশাবিহ আয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনা, যারা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাসী হয়না তাদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি পরকালে আদৌ তাদের জন্যে উপকারী হবে না, তাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না আর তারা তো হবে দোযখের ইন্ধন।[১]

যিনি সৃষ্টি করেছেন সমগ্র বিশ্বকে, যিনি মানব জাতিকে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা হওয়ার মর্যাদা দিয়েছেন, যিনি পৃথিবীর সব কিছুকে মানুষের উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন, মানুষ যদি তাঁর অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হয় তখন তার শাস্তি হয় অবধারিত। এ কঠিন কঠোর শাস্তির কথাই ঘোষিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

(২) এ আয়াত সম্পর্কে দ্বিতীয় অভিমত হলো শুধু নাযরানবাসী খৃষ্টানদের সম্পর্কেই এ আয়াত নাযিল হয়নি, বরং বনু কোরায়যা ও বনু নযীর গোত্রের ইহুদীদের উদ্দেশ্যেও এ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) মতে এতে আরবের পৌত্তলিকদের সম্পর্কেও বিশেষ হুশিয়ারী বাণী উচ্চারিত হয়েছে।[২]

পরকালে অর্থ-সম্পদ উপকারী হবে না

সাধারণতঃ পৃথিবীতে মানুষ বিপদগ্রস্ত হলে তার অর্থবল বা জনবল বিশেষভাবে উপকারী হয় কিন্তু আখেরাতে এ দুটি বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। একথা সুস্পষ্টভাবে এ আয়াতে ঘোষিত হয়েছে অতএব, যারা অর্থ সম্পদের লোভে অথবা পদ মর্যাদার মোহে ইসলাম গ্রহণ করেনা, আল্লাহর আয়াত

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৭, পৃষ্ঠা- ১৮৪
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৯৩

সমূহকে অস্বীকার করে, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আহবানে সাড়া দেয় না, তাদের পরিণাম ভয়াবহ, তাদের শাস্তি অবধারিত।

পবিত্র কোরআনের অন্যান্য আয়াতেও এমনি ঘোষণা রয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ

"সেদিনকে ভয় কর যেদিন অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না"।

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

অর্থ সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি শুধু এ ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগীর সৌন্দর্য, আখেরাতে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। আখেরাতে শুধু নেক আমলই হবে সম্পদ।

পবিত্র কোরআনে আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ

"আর অবশ্যই তোমরা একা এসেছ আমার কাছে যেমন একাই তোমাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছিলাম, আর যা কিছু দুনিয়াতে দান করেছিলাম সবই তোমরা পেছনে ফেলে এসেছ"।

কাফেরদের অবস্থা ও পরিণাম

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ

অর্থাৎ যে কাফেরদের সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা হয়েছে তাদের অবস্থা ফেরাউন সম্প্রদায়ের ন্যায়। যেভাবে ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায় হযরত মূসা (আঃ)-এর বিরোধিতা করেছিল, তাঁকে মিথ্যা জ্ঞান করেছিল এভাবে ইহুদী, খৃষ্টান এবং পৌত্তলিকরা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করে। আর যেভাবে ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়কে আল্লাহ পাক ধ্বংস করেছেন এমনিভাবে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দুশমনদেরকেও আল্লাহ পাক ধ্বংস করবেন।

(২) অথবা 'দাবুন' শব্দের অর্থ এখানে আদত বা অভ্যাস অর্থাৎ যেভাবে ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের অভ্যাস ছিল আল্লাহ নবী মূসা (আঃ)-কে কষ্ট দেয়া

ঠিক এমনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগের পৌত্তলিক, খৃষ্টান এবং ইহুদীদের অভ্যাস প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়া। যেভাবে আল্লাহ পাক মূসা (আঃ)-কে ফেরাউনের মোকাবেলায় সাহায্য করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকেও তাঁর দুশমনের মোকাবেলায় সাহায্য করবেন।

(৩) অথবা 'দাবুন' অর্থ কোন অবস্থায় স্থায়ী ভাবে অবস্থান করা অর্থাৎ যেভাবে ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় সত্য ধর্মের বিরোধিতার কারণে চিরকাল দোযখের শাস্তি ভোগ করবে, এমনভিাবে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধীদের পরিণামও চিরকালের শাস্তি অবধারিত।

(৪) অথবা এ আয়াতের ব্যাখ্যা হলো যেভাবে ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়কে কঠোর ও কঠিন শাস্তি দেয়া হচ্ছে, ঠিক তেমনি যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করছে তাদেরকেও কঠিন ও কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে।

(৫) অথবা এর অর্থ হলো যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্যতা অস্বীকার করছে তাদের পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। তাদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি পরকালের শাস্তি থেকে নাজাত পাওয়ার ব্যাপারে আদৌ উপকারী হবে না। যেমন ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের ধনবল ও জনবল তাদের জন্যে উপকারী হয়নি। অতএব হে ইহুদী, খৃষ্টান ও পৌত্তলিকরা! ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের ন্যায় তোমাদেরকেও কঠিন কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।[১]

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا

শানে নুযুল

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন বদরের যুদ্ধে বিজয় লাভের পর মদীনা শরীফ প্রত্যাবর্তন করেন তখন তিনি বণী কিন্‌কার বাজারে ইহুদী সম্প্রদায়কে একত্রিত করে এরশাদ করেনঃ হে ইহুদী সম্প্রদায়! বদর রণাঙ্গনে কোরায়শদের যে পরিণাম হয়েছে সে পরিণাম দেখার পূর্বেই তোমরা ইসলাম কবুল কর। তখন ইহুদীরা জবাব দিল, হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! কয়েকজন কোরায়শীকে হত্যা করে অহংকার করবেন না, কেননা তারা ছিল অনভিজ্ঞ, যুদ্ধ সম্পর্কে অজ্ঞ, যখন আমাদের সঙ্গে

১। তফসীরে কবীর খন্ড- ৭, পৃষ্ঠা- ১৮৬

যুদ্ধ করবেন তখন উপলব্ধি করবেন যে আমরা যুদ্ধে অদ্বিতীয় তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।[১] এরশাদ হয়েছে–

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا

"(হে রসূল!) আপনি কাফেরদের বলুন যে, তোমরা অদূর ভবিষ্যতে পরাজিত হবে"।

প্রিয়নবী (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী

এবনে আবি হাতেমে রয়েছে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মাতা হযরত উম্মে ফজল (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, মক্কা শরীফে এক রাত্রে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দণ্ডায়মান অবস্থায় উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন, হে লোক সকল! আমি কি তোমাদের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছি? হে লোক সকল! আমি কি তোমাদের তবলীগ করেছি? আমি কি তোমাদের নিকট আল্লাহর একত্ববাদের এবং আমার রেসালতের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি? তখন হযরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি অবশ্যই আমাদের নিকট আল্লাহর দ্বীন পৌঁছে দিয়েছেন। পরদিন সকালে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তোমরা সকলেই শ্রবণ কর, একদিন ইসলামের বিজয় হবে, ইসলামের প্রচার হবে অত্যন্ত বেশী, কুফরের অমানিশা কেটে যাবে, অবসান ঘটবে এ অন্ধকার যুগের, মুসলমানগণ ইসলামের পয়গাম নিয়ে সমুদ্রের বুক চিরে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে এবং ইসলামের প্রচার প্রসারে আত্মনিয়োগ করবে।

তবে একথাও মনে রেখ, এমন সময়ও আসবে যখন মানুষ কোরআনে করীম শিক্ষা করবে, পাঠ করবে (অহংকার করে) বলবে আমি ক্বারী, আমি আলেম, আমার থেকে বড় কে? এই লোকদের মধ্যে কি কোন কল্যাণ থাকবে? উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞাসা করলঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এই লোকদের পরিচয় কি? তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ তারা তোমাদের মুসলমানদের মধ্য থেকেই হবে। কিন্তু মনে রেখ এরা হবে দোযখের ইন্ধন। এই হাদীস এবনে মরদবিয়াতেও রয়েছে।[২] আলোচ্য আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে ইমাম রাজী (রঃ) অন্য একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মদীনাবসী ইহুদীরা যখন বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় লক্ষ্য করল তখন তারা বললঃ

وَاللّٰه هو النبى الذى بشرنابه موسى فى التوراة

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা- ১৮৬
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা- ৯৪
তফসীরে কবীর খন্ড- ৭, পৃষ্ঠা- ১৮৭
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা- ৪২

অর্থাৎ আল্লাহর শপথ! ইনিই সেই নবী যাঁর সম্পর্কে হযরত মূসা (আঃ) তৌরাতে সুসংবাদ দিয়েছেন। কিন্তু যখন তারা ওহোদের যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় দেখল তখন তারা বলল না ইনি সেই নবী নন। এভাবে তাদের দুর্ভাগ্য প্রমাণিত হলো এবং তারা ইসলাম কবুল করা থেকে বঞ্চিত হলো। তখন আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযিল করলেন।[১]

আলোচ্য আয়াতে سَتُغْلَبُوْنَ শব্দটির তাৎপর্য হলো মুসলমানদের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী যেমন পারস্য রাজার বিরুদ্ধে রোমক সম্রাটের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছে পবিত্র কোরআন এ আয়াতেঃ

غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِىْ اَدْنَى الْاَرْضِ

এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ হে রসূল! আপনি কাফেরদেরকে জানিয়ে দিন যে অদূর ভবিষ্যতে তোমরা পরাজিত হবে এবং জাহান্নামে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে আর ঠিকানা হিসেবে তা অন্যতম মন্দ। এরপর আল্লাহ্ পাক বদরের যুদ্ধের বিবরণ দিয়ে এরশাদ করেছেনঃ

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ

সত্যের জয় সব সময় হয়

পূর্বের আয়াতে পবিত্র কোরআন যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল তার সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হলো। কেননা অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই আরব উপদ্বীপ থেকে মুশরেক তথা পৌত্তলিকরা নিশ্চিহ্ন হলো। বনু কোরায়যার ইহুদীরা বিশ্বাসঘাতকতার কারণে নিহত হলো। বনু নযীরের ইহুদীদেরকে নির্বাসন দন্ড দেয়া হলো, আর নাযরানের নাসারাদেরকে যিজিয়া আদায়ে বাধ্য হতে হলো শুধু তাই নয়; বরং পৃথিবীর প্রায় সব বড় বড় জাতিগুলোকেই কমপক্ষে এক হাজার বছর যাবত মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব, প্রভাব-প্রতিপত্তি, কর্তৃত্ব বিনীতভাবে মেনে নিতে হলো।

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ

আলোচ্য আয়াতে বদরের যুদ্ধের বিবরণ স্থান পেয়েছে। এ যুদ্ধে কাফেরদের সৈন্য সংখ্যা ছিল এক হাজার। তাদের নিকট ছিল ৭০০ উট এবং ১০০ অশ্ব, অথচ মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৪ জন। মুসলমানদের উট ছিল ৭০টি, অশ্ব ছিল মাত্র দুটি। আর বর্ম ছিল মাত্র ৬টি আর ৩১৩ জন মুজাহেদের জন্যে তরবারি ছিল

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৭, পৃষ্ঠা- ১২৭

তৃতীয়তঃ মুসলমানদের সংখ্যা ছিল কাফেরদের মোকাবেলায় নগণ্য কিন্তু এতদসত্ত্বেও আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেছেন। কাফেরদের জনবল বা অস্ত্রবল তাদের জন্যে উপকারী হয়নি। বস্তুতঃ আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে সাহায্য করেন আর যারা আল্লাহর সাহায্য লাভ করে তাদের বিজয় সুনিশ্চিত। আর এতেই রয়েছে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে নসীহত।

আল্লাহ পাক বদরের যুদ্ধে মুসলমানদেরকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছেন। প্রথমতঃ মুসলমানদের সাহায্যে আল্লাহর ফেরেশতাগণ রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ মুসলমানগণ কাফেরদেরকে এবং কাফেররা মুসলমানদেরকে নিজেদের দ্বিগুণ দেখতে পেয়েছে। মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য দেখে কাফেরদের মন ভীত-সন্ত্রস্ত এবং আতংকিত হয়ে পড়ে, আর একথা সর্বজন বিদিত যে যুদ্ধে বাহুবল ও অস্ত্রবলের চেয়ে মনোবলের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। আল্লাহর বিশেষ রহমতে কাফেররা মুসলমানদের দেখে মনোবল হারিয়ে ফেলেছিল। আর মুসলমানগণ কাফেরদের সংখ্যাধিক্য দেখে আল্লাহর পাকের দরবারে অধিক পরিমাণে কান্নাকাটি করতে থাকেন। শুধু আল্লাহর প্রতি ভরসা করেই স্বল্প সংখ্যক নিরস্ত্র-প্রায় মুসলমান দুশমনের মোকাবেলায় দণ্ডায়মান হন। আর আল্লাহর প্রতি যে যত বেশী ভরসা করবে, আল্লাহ পাকের সাহায্য সে তত বেশী লাভ করবে। বস্তুতঃ বদরের যুদ্ধে আল্লাহর রহমতের এক জীবন্ত নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। আর এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে অবশেষে সত্যেরই জয় হয় আর অসত্য বিদায় নিতে বাধ্য হয়। অবশ্য এর জন্যে চাই আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস এবং ভরসা, কঠোর পরিশ্রম, অক্লান্ত সাধনা, মনের একাগ্রতা এবং সংকল্পের দৃঢ়তা, ধৈর্য ও সহনশীলতা।

زُيِّنَ
لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ ۗ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ
الْمَاٰبِ ﴿١٤﴾ قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ
رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ
مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾
اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾ اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ
وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ﴿١٧﴾

তরজমা

(১৪) মানব জাতির জন্যে স্ত্রী জাতি, সন্তান-সন্ততি ও সঞ্চিত স্বর্ণ-রোপ্য, সুশিক্ষিত অশ্ব ও চতুঃষ্পদ জন্তু এবং ক্ষেত-খামারের মায়া অতি মনোরম ও মন ভোলানো করা হয়েছে। এসব ক্ষণস্থায়ী জীবনের সম্পদ, আর আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে উত্তম আশ্রয়-স্থল।

(১৫) (হে রসূল!) আপনি বলে দিন যে আমি কি তোমাদেরকে এ সমস্ত বস্তু থেকে উত্তম বিষয়ের খবর দেব? যারা আল্লাহ্ পাককে ভয় করে তাদের জন্যে তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে বেহেশত সমূহ যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, তারা ঐ বেহেশত সমূহে সর্বদা বাস করবে, আর তাদের জন্যে রয়েছে সেখানে পবিত্র সহধর্মীনীগণ আর রয়েছে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি আর আল্লাহ্ পাক তাঁর বন্দাদের যাবতীয় কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করেন।

(১৬) যারা বলে হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয় আমরা ঈমান এনেছি অতএব আমাদের গুনাহ্ মাফ কর এবং দোযখের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

(১৭) যারা ধৈর্য ধারণকারী, সত্যবাদী, অনুগত, দাতা এবং রাতের শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।

তফসীরুল কোরআন

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকে রকমারী আনন্দদায়ক বস্তু দ্বারা মানুষের জন্যে আকর্ষণীয় করা হয়েছে। এ বস্তু সমূহের মধ্যে সর্ব প্রথম নারী জাতির উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা তাদের সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

ماتركت بعدى فتنة اضرعلى الرجال من النساء

অর্থাৎ আমার অবর্তমানে পুরুষের জন্যে নারী অপেক্ষা মারাত্মক কোন ফেতনা বা বিপদ অন্য কিছু নাই।

উৎকৃষ্ট সম্পদ

অবশ্য একথা সত্য নারী যদি নিজে পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হয় এবং তাদের মেহনত সন্তান-সন্ততিদের উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে হয় তবে সে নারী আর ফেতনা থাকেনা, বরং সত্যিকার অর্থে সে জীবন-সঙ্গিনী হয় এবং প্রশংসার পাত্রী হয়। এ পর্যায়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অন্য একখানি হাদীস উল্লেখযোগ্য। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এরশাদ হলোঃ নেককার

স্ত্রী যে স্বামীর অবর্তমানে স্বামীর সম্পদ এবং নিজের সতীত্ব রক্ষা করে সে স্ত্রী দুনিয়ার উৎকৃষ্ট সম্পদ। আর একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ স্ত্রী এবং খুশবু আমার পছন্দনীয় আর নামায় আমার নয়ন মনের শান্তি।

যেহেতু স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, স্বর্ণ-রৌপ্য, অশ্ব প্রভৃতির প্রতি মানুষের আকর্ষণ স্বভাবগত এবং মানুষ ভোগ-বিলাসে মগ্ন হয়ে বিস্মৃত হয় স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাককে, অমান্য করে তাঁর বিধানকে, মেতে ওঠে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুখ ও সম্পদ আহরণে অবশেষে মৃত্যুর অলংঘনীয় বিধানের মাধ্যমে যখন জীবনের অবসান ঘটে তখন সে দেখতে পায় তার সমস্ত সঞ্চিত সম্পদ থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে। সারা জীবনের অক্লান্ত সাধনায় যা কিছু অর্জন করেছিল তার সবই রেখে এসেছে সে কিছুই তার সঙ্গে আনেনি।

পবিত্র কোরআনের ভাষায়-

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ

"আর নিশ্চয় তোমরা এসেছ একা, যেমন প্রথমে তোমাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছিলাম এবং যা কিছু দুনিয়াতে দান করেছিলাম তার সবই তোমরা পেছনে ফেলে এসেছ"।

এ জীবনের তিনটি সাথী

এ পর্যায়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একখানি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এরশাদ করেছেনঃ এ পৃথিবীতে মানুষের তিনটি সাথী রয়েছে। মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একটি সাথী বিদায় গ্রহণ করে। দ্বিতীয় সাথী কবর পর্যন্ত তার সাথী থাকে, তৃতীয় সাথী তার চির সাথী হয়। সাহাবায়ে কেরাম এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ প্রথম সাথী হলো অর্থ-সম্পদ যা মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ওয়ারীষানদের হয়ে যায়। দ্বিতীয় সাথী আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব যারা কবর পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির সঙ্গে যায়। আর তৃতীয় সাথী মানুষের আমল তা ভাল হোক কি মন্দ তা মানুষের চির সাথী হয়।

এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ যত আকর্ষণীয় এবং যত মনোহরই হোক না কেন তা দ্বারা মানুষ এ জীবনের সামান্য কয়েক দিনই শুধু উপকৃত হতে পারে। অবশেষে মানুষ মাত্রকেই এ ক্ষণস্থায়ী জগত থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়। এজন্যে হযরত আলী (রাঃ) বলেছেনঃ

الناس نيام فاذا ماتوا انتهبوا

"সমস্ত মানুষ ঘুমন্ত, যখন তাদের মৃত্যু হবে তখন তারা জাগ্রত হবে"।

আর তখন তারা এ সত্য উপলব্ধি করবে যে, এ ক্ষণস্থায়ী জগতের সকল ধন-সম্পদ, যাবতীয় ঐশ্বর্য যা সে সারা জীবনের পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্জন করেছিল তা সবই আজ তার জন্যে শুধু বেকারই নয়; বরং বিপজ্জনক, কেননা জীবনের সব কিছুরই হিসাব দিতে হবে কেয়ামতের কঠিন দিনে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন একজন আদম সন্তানও তার স্থান থেকে নড়তে পারবে না যে পর্যন্ত পাঁচটি প্রশ্নের জবাব সে না দেয়–

عن عمره فيما افناه الحديث

(১) তার জীবন কি কাজে ব্যয় করেছে?

(২) যৌবন কিভাবে অতিবাহিত করেছে?

(৩) অর্থ-সম্পদ কিভাবে অর্জন করেছে?

(৪) কোন্ কোন্ খাতে ব্যয় করেছে?

(৫) এবং যা জানতে পেরেছিল তার উপর কতখানি আমল করেছিল।

আর এ কারণেই কোরআনে করীমে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ

সেদিন, যেদিন মানুষের অর্থ-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। শুধু যে উপকারে আসবে না তা নয়; বরং একে অন্যকে দেখলে কোন প্রকার উপকার করার ভয়ে পলায়ন করবে। পবিত্র কোরআনেই রয়েছে এর ঘোষণা, এরশাদ হয়েছেঃ

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ

"যেদিন মানুষ তার ভাই, মাতা, পিতা, স্ত্রী এবং সন্তানকে দেখলে পলায়ন করবে"।

কেননা তারা ভয় করবে যদি এসব নিকটাত্মীয়কে কোন নেক আমল দ্বারা সাহায্য করতে হয় অথচ সেদিন সকলেই হবে বিপদগ্রস্ত, পরস্পরকে সাহায্য করার অবস্থায় কেউ থাকবে না।

অতএব, আলোচ্য আয়াতে যেসব সম্পদের কথা উল্লেখিত হয়েছে তার সবই এ ক্ষণস্থায়ী জগতের সামগ্রী। পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

এসবই ক্ষণস্থায়ী জীবনের দ্রব্য-সামগ্রী। যখন এ জীবনের অবসান ঘটবে মৃত্যুর মাধ্যমে তখন এসবই হবে অকার্যকর।

وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ

"আর শুভ-পরিণতি তো আল্লাহ্ পাকের নিকটই রয়েছে"।

এ আয়াত দ্বারা আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর চির-শান্তির উপকরণ সংগ্রহের জন্যে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনের দ্রব্য সামগ্রীর প্রতি অনুরাগী হয়ে পরকালকে ভুলে না যাওয়ার তাগিদ করা হয়েছে। কেননা ঈমান ও নেক আমলের শুভ পরিণতিই হলো আখেরাতের চির শান্তি যা আল্লাহ্ পাকের নিকট রয়েছে। আল্লাহ্ পাক যার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন তাকেই দান করবেন আখেরাতের নেয়ামত।

আয়াতের মর্মকথা

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ এ আয়াতের মর্মকথা হলো এ ক্ষণস্থায়ী জগতের সম্পদের প্রতি মানুষের মোহকে দূরীভূত করা, কেননা এখানে সব কিছুই ক্ষণস্থায়ী, আর পরকালীন জিন্দেগীর জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। কেননা প্রকৃত জিন্দেগী হলো আখেরাতের জিন্দেগী এবং যা চিরস্থায়ী জিন্দেগী।[১]

অতএব, পরিণামদর্শী মানুষ মাত্রই ক্ষণস্থায়ী সম্পদের প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীকে বিস্মৃত করেনা।

আর পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর চির শান্তি কিভাবে লাভ করা যায় তার পথ-নির্দেশ করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে।

পূর্ববর্তী আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্! তুমি যখন এত আকর্ষণীয় বস্তু দ্বারা পৃথিবীকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছ, আমরা হয়েছি বিস্ময়-মুগ্ধ এখন কি হবে? তখন পরবর্তী আয়াত নাযিল হলো—

قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি বলে দিন পৃথিবীর যে সম্পদের কথা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে তার চেয়ে উত্তম বস্তু সমূহের কথা আমি তোমাদেরকে বলি আর তা

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১২৫

হলো চির শান্তি নিকেতন জান্নাত, চিরন্তন মুক্তি, আর এ জান্নাত তাদেরই জন্যে যারা পরহেযগারী অবলম্বন করবে, যারা আল্লাহ্ পাককে ভয় করে জীবন-যাপন করবে, আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালন করবে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জীবনের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবে, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করবে তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাতের খোশ খবরী। এমন উদ্যান সমূহে তারা বাস করবে যার নিম্নদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত হয়।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا

মুত্তাকী বা পরহেযগার লোকেরা জান্নাতে চিরদিন থাকবে, এমন নয় যে কিছু দিন জান্নাতের সুখ ভোগ করার পর তারা তা থেকে বের হয়ে আসবে, বরং চিরকাল তারা জান্নাতের সুখ ভোগ করতে থাকবে।

পক্ষান্তরে, দুনিয়ার জিন্দেগী এবং দুনিয়ার ধন-সম্পদ যত আকর্ষণীয় এবং যত মনোরমই হোক না কেন, এর সবই এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের সীমিত এবং সামান্য কয়েক দিনের জন্যে। আর পরকালীন জিন্দেগী চিরস্থায়ী। তার নেয়ামত সমূহ চিরন্তন।

وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ

অর্থাৎ যারা পরহেযগারী অবলম্বন করবে তারা বেহেশতে লাভ করবে পবিত্র সহধর্মিনীগণ, তারা হবে সর্বপ্রকার কলুষতা মুক্ত, সর্বপ্রকার কদর্যতার উর্দ্ধে।

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ

সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত

সবার উপরে পরহেযগার লোকেরা লাভ করবে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি ও রেযামন্দি আর এটি হলো সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ্ পাক জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবেন, হে জান্নাতবাসী! তখন জান্নাতবাসীগণ এভাবে জবাব আরজ করবে- হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমরা তোমার দ্বারে উপস্থিত আর সার্বিক কল্যাণ তোমারই হাতে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেনঃ যা কিছু তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে তার চেয়ে বাড়তি কিছু তোমাদেরকে দান করবো। জান্নাতবাসীগণ আরজ করবে হে আমাদের প্রতিপালক! এর চেয়ে বাড়তি আর কি হতে পারে? তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ আমি তোমাদেরকে আমার সন্তুষ্টি দান করবো, তোমাদের প্রতি কখনও রাগ করবো না।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক দুনিয়ার সকল আকর্ষণীয় বস্তুর মোকাবেলায় বেহেশতের উল্লেখ করেছেন, কেননা বেহেশতে রয়েছে আল্লাহ্ পাকের অগণিত নেয়ামত।

وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ

বেহেশতে রয়েছে এমন নেয়ামত মানুষের মন যা আকাঙ্খা করে এবং যা দেখলে মানুষের নয়ন জুড়ায়। বর্ণিত আছে মানুষ যা চাইবে আল্লাহ্ পাক তাই দান করবেন, যার সঙ্গে সাক্ষাত কামনা করবে তার সঙ্গেই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়, সন্তান-সন্ততি মানুষের নয়ন ও মনের শান্তির কারণ হয় তবে কি জান্নাতীদেরও সন্তান-সন্ততি হবে? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি কোন জান্নাতী সন্তান-সন্ততির আকাঙ্খা করে তবে অনতিবিলম্বে তার এ আকাঙ্খা পূর্ণ করা হবে। এই হাদীস তিরমিজী শরীফে সংকলিত হয়েছে। বায়হাকীতেও এর উল্লেখ রয়েছে। আর হাদীস শরীফে একথারও উল্লেখ রয়েছে যে আল্লাহ্ পাক এমনি একটি জান্নাত তৈরী করেছেন যার একটি ইঁট রোপ্য দ্বারা দ্বিতীয়টি স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত। আর সেই জান্নাত নির্মাণের জন্যে যে গারা নির্মাণ করা হয়েছে তা কস্তরী দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছে।[১] (তিররানী)

হযরত শফী এবনে মানে' (রাঃ) থেকে বণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ জান্নাতের নেয়ামত সমূহের মধ্যে এটিও একটি নেয়ামত যে জান্নাতবাসীগণ পরস্পর সাক্ষাত করবেন উষ্ট্র এবং অশ্বের উপর আরোহণ করে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাবেন বিশেষ করে জুমআর দিন জিন ও লাগামসহ অশ্ব হাযির করা হবে এবং অশ্বগুলো মল মূত্র ত্যাগ করবেনা। জান্নাতবাসীগণ তার উপর আরোহণ করে যেখানে আল্লাহর ইচ্ছা সেখানে যাবে।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জান্নাতে একটি বৃক্ষ রয়েছে যার উচ্চাংশ থেকে পোষাক পরিচ্ছদ বের হবে এবং নিম্নাংশ থেকে স্বর্ণের ধূসর রংয়ের অশ্ব বের হবে। অশ্ব সমূহের জিন এবং লাগাম হবে মুক্তা ও ইয়াকুত পাথরের। এ অশ্বগুলোর ডানা থাকবে যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত। এ অশ্বগুলোর মল-মূত্র থাকবেনা। এগুলোর উপর আল্লাহর ওলীগণ আরোহন করবেন। তারা যেখানে যেতে চাইবেন সেখানে উড়ে চলে যাবেন। উড়ন্ত অবস্থায় নীচ থেকে যারা

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা- ১৯৩-১৯৪

তাদেরকে দেখবে তারা বলবে এরা আমাদের আলোকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছেন। তখন তাদেরকে জবাব দেয়া হবে যে তারা দুনিয়াতে আল্লাহর রাহে দান-খয়রাত করতো আর তোমরা কার্পণ্য করতে, তারা জেহাদ করতো তোমরা বসে থাকতে।[১]

হযরত রাবীয়া হারসী বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমাকে স্বপ্নে বলা হয়েছে যে একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি একটি বিরাট বাড়ী নির্মাণ করেছেন, অতঃপর তাতে দস্তরখান বিছিয়ে দিয়েছেন এবং লোকদেরকে একত্রিত করার জন্যে আহবায়ক প্রেরণ করেছেন, যারা সে আহবায়কের আহবানে সাড়া দিয়েছে এবং দস্তরখানে খাদ্য গ্রহণ করেছে সে মহান ব্যক্তি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। পক্ষান্তরে যে এ দাওয়াত কবুল করেনি এবং সেই ঘরে আসেনি, খাদ্য গ্রহণ করেনি সে ব্যক্তির প্রতি বাড়ীর মালিক নারাজ হয়।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, বাড়ীর মালিক স্বয়ং আল্লাহ্ পাক, আর সে বাড়ীর দিকে আহবায়ক হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, বাড়ী হলো ইসলাম দস্তরখান হলো জান্নাত। (দারমী)

পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফে জান্নাতের অনেক বৈশিষ্ট্য এবং সৌন্দর্য ও নেয়ামতের বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে যা বেহেশতবাসীগণ ভোগ করবে কিন্তু আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে সমস্ত নেয়ামতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ।

وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তাঁর বন্দাদের যাবতীয় আমল, সর্ব প্রকার আচরণ প্রত্যক্ষ করছেন, সবই তাঁর সম্মুখে। যে ব্যক্তি পুরস্কারের যোগ্য হবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে আর যে শাস্তির যোগ্য হবে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। যারা এ ক্ষণস্থায়ী জগতের ভোগ-সম্পদে মুগ্ধ-মত্ত-মাতোয়ারা হয়ে আখেরাতের জিন্দেগীকে বিস্মৃত করে আর যারা আখেরাতের স্মরণ করে এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনের সুখ-সম্পদ আহরণে মত্ত না হয় তাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ যোগ্য স্থানে প্রেরণ করা হবে। এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আখেরাতে দুটি স্থানই রয়েছে। নেককারদের জন্যে জান্নাত আর পাপীষ্ঠদের জন্যে দোযখ।

নেককার বন্দাদের বৈশিষ্ট্য

পরবর্তী আয়াতে নেককার বন্দাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা- ১৯৪

যারা বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক। নিশ্চয় আমরা ঈমান এনেছি, আর এই ঈমানের বরকতে আমাদেরকে মাফ করে দিও আর দোযখের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর"।

الصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ

অর্থাৎ যারা সর্ব প্রকার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেও আল্লাহ্ পাকের পথে অবিচলিত থাকে, কোন প্রকার লোভ-লালসা অথবা দুঃখ-কষ্ট যাদেরকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। যারা তাদের কথায়-কাজে, নিয়তে এবং উদ্দেশ্যে সততার পরিচয় দেয়, যারা আল্লাহর প্রতি সর্বদা অনুগত থাকে, পাপাচার হতে বিরত থাকে, অর্থ-সম্পদ আল্লাহর রাহে ব্যয় করে এবং রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হয় তারাই সত্যিকার অর্থে আল্লাহর প্রিয় বন্দা। রাতের শেষ প্রহরে নিদ্রা ভঙ্গ করা তথা শয্যা ত্যাগ করে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে হাযির হওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ কিন্তু যারা এই সময়ের মর্তবা এবং মাহাত্ম্ম সম্পর্কে ওয়াকেফহাল, যারা কল্যাণকামী, তারা ঐ সময় আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির হয়। যেহেতু সারা জীবন এবাদত করলেও আল্লাহ্ পাকের এবাদতের হক্ব আদায় হয় না তাই সারারাত এবাদত করার পর রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থী হয়। এটি নেককার বন্দাদের বৈশিষ্ট্য।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ প্রত্যেক রাতের যখন শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তখন আল্লাহ্ পাক দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে আত্মপ্রকাশ করেন এবং এরশাদ করেন, আমিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, আছে কি কেউ দানপ্রার্থী আমি যাকে দান করবো? আছে কি কেউ ক্ষমাপ্রার্থী যাকে আমি ক্ষমা করবো?[১] (বোখারী মুসলিম)

হযরত হাতেব (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাতের শেষ প্রহরে আমি শ্রবণ করলাম কোন ব্যক্তি মসজিদের এক কোণ থেকে বলছে হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আদেশ করেছ আমি তা পালন করেছি, আমাকে ক্ষমা কর। আমি দেখলাম তিনি হলেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমাদেরকে আদেশ করা হতো আমরা যখন তাহাজ্জুদের নামায আদায় করি তখন রাতের শেষ প্রহরে যেন সত্তর বার এস্তেগফার করি এবং আল্লাহ্ পাকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হই।[২]

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা- ১৯৮
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা- ৪৬

شَهِدَ اللّٰهُ
اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ؕ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ
الْاِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ
مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ
فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾ فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ
وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ؕ وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ؕ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ
تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾

তরজমা

(১৮) আল্লাহ পাক সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই, ফেরেশতাগণ ও জ্ঞানীগণ সাক্ষী। তিনিই ন্যায় বিচারক, তিনি ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই, তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী, তিনি বিজ্ঞানময়।

(১৯) নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহ্ পাকের নিকট একমাত্র পছন্দনীয় জীবন-ব্যবস্থা, আর আহলে কিতাবরা জেনে-শুনে শুধু নিজের হিংসা-বিদ্বেষের কারণেই মতভেদ করেছে আর যে আল্লাহ্ পাকের নির্দশনকে অবিশ্বাস করে (তার জানা উচিত) যে আল্লাহ পাক অতি সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।

(২০) (হে রসূল!) যদি তারা তবু আপনার সঙ্গে কলহ-দ্বন্দ্ব করে তবে আপনি বলে দিন, আমি ও আমার অনুসারীগণ আল্লাহ্ পাকের নিকট আত্ম-সমর্পণ করেছি আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে এবং যারা মূর্খ তাদেরকেও বলে দিন যে, তোমরাও কি আত্ম-সমর্পণ করেছ? অতঃপর তারা যদি আত্ম-সমর্পণ করে তবে অবশ্যই সুপথ পাবে এবং যদি ফিরে যায় তবে আপনার কর্তব্য ও দায়িত্ব শুধু (আমার কথা) তাদের নিকট পৌঁছে দেয়া এবং আল্লাহ্ পাক তাঁর বন্দাদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ্ পাক দেহ সমূহ সৃষ্টি করার চার হাজার বছর পূর্বে রুহ সমূহকে সৃষ্টি

করেছেন এবং রুহ সমূহ সৃষ্টির চার হাজার বছর পূর্বে তাদের রিযক সৃষ্টি করেছেন এবং সমগ্র সৃষ্টি জগত সৃষ্টির পূর্বে যখন তিনি নিজেই ছিলেন, আসমানও ছিল না যমীনও ছিল না, কি ভাল কি মন্দ কেউ ছিল না তখন তিনি নিজেই তাঁর একত্ববাদের সাক্ষ্য ঘোষণা করে এরশাদ করেছেনঃ

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

"আল্লাহ পাক স্বয়ং তাঁর তওহীদের সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ভিন্ন কোন মা'বুদ নেই"।[১]

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

ইতিপূর্বে নাযরানবাসী খৃষ্টানদের সম্বোধন করে তওহীদে বিশ্বাসের আহবান জানানো হয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে তারা যে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে তার প্রতিবাদ করা হয়েছে। এরপর আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদ বা তওহীদের বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। এরপর যেসব কারণে সত্যকে সত্য জেনেও মানুষ তা মানে না, বুঝেও বোঝে না, অর্থাৎ অর্থ-সম্পদের লোভ অথবা সন্তান-সন্ততির মায়া বা ভোগ-বিলাসের উপকরণ ইত্যাদির বিবরণ রয়েছে। এরপর প্রকৃত মোমেনের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে পুনরায় তওহীদের প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে।

শানে নুযুল

আল্লামা বগবী (রঃ) বলেছেনঃ সিরিয়ার ইহুদী আলেমদের মধ্য থেকে দু'জন আলেম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হওয়ার উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফে আসে। মদীনা শরীফ শহরটির প্রতি দৃষ্টিপাত করে পরস্পর বলতে লাগলোঃ এ শহরটিতো সেই শহরের ন্যায়ই মনে হয় যে শহরে সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমন হবে। অবশেষে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলো এবং তাদের কিতাবে তাঁর যে গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে তাঁর মধ্যে সেই গুণাবলী দেখতে পেলো এবং আরজ করলোঃ আপনিই মোহাম্মদ? (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তিনি এরশাদ করলেন, হ্যাঁ। তারা আবার বললোঃ আপনিই কি আহমদ? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ আমিই মোহাম্মদ এবং আহমদও। তারা বললঃ

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা- ২০০

আমরা দু' একটি প্রশ্ন করবো যদি আপনি সঠিক উত্তর দেন তাহলে আমরা আপনাকে মেনে নেবো। তিনি এরশাদ করলেনঃ তোমরা প্রশ্ন কর। তখন তারা জিজ্ঞাসা করলোঃ আল্লাহর কিতাবে সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য কোন্‌টি? তখন এ আয়াত নাযিল হলো। তখন তারা উভয়ে ইসলাম কবুল করলেন।[১]

এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে অন্য একটি অভিমত হলো, আয়াত নাযিল হয়েছে নাযরানবাসী নাসারাদের ব্যাপারে যখন তারা হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল।

অন্য একটি অভিমত হলো এ আয়াত নাযিল হয়েছে ইহুদী এবং নাসারাদের সম্পর্কে যখন তারা ইসলাম নামটি পরিত্যাগ করে নিজেদের ইহুদী নাসারা বলে নামকরণ করল এবং তারা দাবী করলো যে, আমাদের ধর্ম আপনার ধর্মের চেয়ে উত্তম। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[২]

এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ্ পাক সাক্ষ্য দেন যে তিনি ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই, আর তাঁর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য সাক্ষী আর তাঁর কথা সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য। তিনি এরশাদ করেন সমগ্র বিশ্বজগত তাঁর নিকটই মুখাপেক্ষী, কারো নিকট তাঁর কোন প্রয়োজন নেই, তাঁর ক্ষমতা একচ্ছত্র। তিনি এক, অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই, তিনি ভিন্ন কেউ এবাদতের যোগ্য নয় তিনি এ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, আর সাক্ষ্য দিচ্ছেন তাঁর ফেরেশতাগণ এবং আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের সাক্ষী হলেন জ্ঞানীগণ।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, এ বাক্যটিতে ওলামায়ে কেরামের বিশেষ ফজিলত বর্ণিত হয়েছে বরং এমন একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে, যাতে আর কারো কোন অংশ নেই, তিনি সত্যিকার মা'বুদ। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত, তিনি পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়, তাঁর প্রতিটি কথা এবং কাজ হেকমতপূর্ণ।

মসনদে আহমদে এ বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে যে, বিদায় হজ্জের সময় আরফার ময়দানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তেলাওয়াত করেন এবং বলেন, 'হে পরওয়ারদেগার! আমি এ সত্যের অন্যতম সাক্ষী'।[৩]

জ্ঞান বিজ্ঞানের বিস্ময়কর সাধনা

তেবরানী এ আয়াত সম্পকে একটি অভিনব ঘটনার উল্লেখ করেছেন। আল্লামা এবনে কাসীর ও অন্যান্য তফসীরকারগণ হযরত গালেব কাত্তান থেকে বর্ণনা করেন

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা- ১০৪
তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা- ২০০
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১০৪
৩। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৭

যে, "ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে আমি কূফা শহরে গমন করি এবং বিখ্যাত বুজুর্গ হযরত আ'মাশ (রাঃ)-এর নিকট অবস্থান করি। রাত্রে তিনি তাহাজ্জুদের জন্যে দণ্ডায়মান হলেন এবং পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করতে থাকলেন, আর আলোচ্য আয়াত সমূহ পাঠ করেন, তখন তিনি বললেন– "আমিও সাক্ষ্য দেই সেই সত্যের যার সাক্ষ্য দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্ পাক; আমার এ সাক্ষ্যকে আমি আল্লাহ পাকের দরবারে অর্পণ করি, আর এ সাক্ষ্যটি তাঁর নিকট আমানত হিসেবে থাকবে, এরপর কয়েকবার–

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

এ আয়াত পাঠ করেন"। তখন আমি চিন্তা করলাম হয়তো তিনি এ সম্পর্কে কোন হাদীস শ্রবণ করেছেন, এজন্যে আমি প্রত্যুষে তাঁর খেদমতে হাযির হই এবং আরজ করি– "হে মোহাম্মদ! কি কারণে আপনি এ আয়াত বার বার পাঠ করেছিলেন"? তিনি বললেন, "তুমি কি এ আয়াতের ফজিলত জান না"? আমি বললাম, "জনাব আমি তো বিগত দু' মাস ধরে আপনার খেদমতে রয়েছি, আপনি তো কোন হাদীস বর্ণনা করলেন না"। তিনি বললেন, "আল্লাহর শপথ! আমি তো এক বছর পর্যন্ত এই হাদীস বর্ণনা করব না"। এরপর আমি এ আয়াত সম্পর্কে একখানি হাদীস শ্রবণের জন্য তাঁর দরজায় পড়ে রইলাম। যখন এক বছর পূর্ণ হলো, আমি আরজ করলাম এক বছর পূর্ণ হয়েছে এখন আমি সেই হাদীস শুনতে চাই, তখন তিনি বললেন, আমি আবু ওয়ায়েল থেকে এই হাদীস শ্রবণ করেছি। তিনি হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে শ্রবণ করেছেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ এ আয়াত যে পাঠ করবে তাঁকে কেয়ামতের দিন হাযির করা হবে এবং আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেনঃ আমার এ বন্দা আমার নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে আর আমি সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গীকার রক্ষাকারী, এ বন্দাকে জান্নাতে নিয়ে যাও।[১]

আল্লাহ পাক তওহীদের সাক্ষী

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে বিখ্যাত তফসীরকার ইমাম রাজী (রঃ) বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আল্লাহ পাক তাঁর তৌহীদ বা একত্ববাদের সাক্ষী, কেননা তৌহীদের যে সমস্ত দলিল বিশ্ব সৃষ্টিতে রয়েছে তিনিই তা সৃষ্টি করেছেন ; যখন কিছুই ছিল না তখন তিনিই ছিলেন আর যখন কিছুই থাকবে না তখনও তিনিই থাকবেন। পৃথিবী সৃষ্টি তাঁরই ইচ্ছায় হয়েছে এবং লয়ও তাঁরই ইচ্ছায় হবে। তিনি

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা ৪৭
তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা- ২০১

ফেরেশতাদেরকে তাঁর তৌহীদের কথা বলেছেন আর ফেরেশতাগণ তাঁর প্রেরিত রসূলগণের নিকট তৌহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের পয়গাম পৌছে দিয়েছেন এবং রসূলগণ আলেমদের নিকট তৌহীদের পয়গাম পৌছিয়েছেন। আর আলেমগণ সাধারণ মানুষের নিকট তৌহীদের বাণী পৌছিয়েছেন। তাই এরশাদ হয়েছে, "আল্লাহ পাক সাক্ষ্য দেন তিনি ভিন্ন কোন মা'বুদ নেই। ফেরেশতাগণ ও জ্ঞানীগণ সাক্ষী"।

বস্তুতঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই একথার সর্ব প্রধান ও সর্ব প্রথম এবং সর্ব শ্রেষ্ঠ সাক্ষীতো স্বয়ং আল্লাহ পাকই। কেননা তিনি পৃথিবী ও তার সবকিছু সৃষ্টি করেছেন আর এ বিস্ময়কর সৃষ্টিই তার স্রষ্টার একত্ববাদের প্রমাণ। তিনিই ফেরেশতাদেরকে এ সম্পর্কে অবগত করেছেন এবং তাদের মাধ্যমেই বিশ্ব মানবের নিকট তওহীদের বাণী পৌছিয়েছেন এবং তত্ত্বজ্ঞানী, তথ্য সন্ধানী আলেমদেরকে তওহীদের দলিল প্রমাণ বুঝবার তৌফিক দান করেছেন।[১]

قَآئِمًاۢ بِالْقِسْطِ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক ন্যায় বিচারক, তিনি ন্যায় বিচার সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, যারা তত্ত্বজ্ঞানী আলেম তারা ভাল ভাবেই জানেন যে আল্লাহ পাক সকল বিষয়ে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকারী, তাঁর ব্যাপারে জুলুম অত্যাচার কল্পনাতীত, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং এ ক্ষমতা যখন ইচ্ছা যেখানে এবং যেভাবে ইচ্ছা তিনি প্রয়োগ করেন, যে অনুগত, এবাদত গুজার তাঁকে সওয়াব দেয়া তাঁর কর্তব্য নয় বরং মর্জি, এমনিভাবে যে নাফরমান বা অবাধ্য তাকে শাস্তি দেয়াও তাঁর কর্তব্য নয়, বরং তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে মাফ করে দেবেন আর যাকে ইচ্ছা তাকে শাস্তি দেবেন। বাতিল ফেরকা মুতাজিলার ভ্রান্ত মত হলো নেককারকে সওয়াব দেয়া, বদকারকে আযাব দেয়া তাঁর কর্তব্য। এ আয়াতে এমন ভিত্তিহীন কথার কোন দলিল নেই।[২]

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

"আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই"।

এ বাক্যে পুনরায় তওহীদের ঘোষণা করা হয়েছে যাতে করে এর গুরুত্ব কত বেশী তা উপলব্ধি করা যায়। ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ পুনরায় এ বাক্যটি উল্লেখের মাধ্যমে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যেন প্রত্যেক মুসলমান বারে বারে এ কলেমাটি উচ্চারণ করে এবং এ কলেমার জিকরে মশগুল থাকে এবং এ সত্য

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-২০৪-৫
২। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২০১

উপলব্ধি করে যে আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি ভিন্ন কোন রিযকদাতা নাই। সকল আশা শুধু তাঁর নিকট, ভরসা শুধু এক আল্লাহর প্রতি এ সত্য মুসলমান মাত্রেরই মনে সর্বদা জাগ্রত রাখা একান্ত কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনের তাগিদ উপলব্ধি করার জন্যেই এ আয়াতে আলোচ্য বাক্যটি একাধিকবার উল্লেখিত হয়েছে।[১]

আ'মালুল কোরআন

হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যখন 'আলহামদ লিল্লাহি রব্বিল আলামীন, আয়াতুল কুরসী এবং-

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ...... بِغَيْرِ حِسَابٍ

পর্যন্ত নাযিল হলো, এ আয়াত সমূহ আল্লাহ পাকের আরশ ধরে আরয করলো হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে কি এমন সম্প্রদায়ের নিকট নাযিল করেছেন যারা আপনার নাফরমানী করে, তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ আমার ইজ্জত, শ্রেষ্ঠত্ব এবং উচ্চ মর্তবার শপথ করে বলছি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর যে কেউ তোমাদেরকে তেলাওয়াত করবে তাকে আমি মাফ করে দেব এবং তার প্রতি প্রতিদিন ৭০ বার দৃষ্টিপাত করবো এবং তার ৭০টি হাজত পূর্ণ করব তন্মধ্যে সবচেয়ে কম মর্তবার হাজত হলো মাগফেরাত।[২]

اَلْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

العزيز। পরাক্রমশালী তথা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, الحكيم। বিজ্ঞানময় তথা সর্বজ্ঞাত, সব কিছু সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত, আর একথা ধ্রুব সত্য যে মা'বুদ বা উপাস্য হতে হলে এ দুটি গুণের অধিকারী হওয়া একান্ত জরুরী, কেননা তিনি সর্বত্র ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারীও। আর ন্যায় কায়েম করার জন্যে সকলের প্রয়োজন সম্পর্কে অবগত হওয়া পূর্বশর্ত। শুধু তাই নয়, বরং যা ইচ্ছা তা করার ক্ষমতা তথা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়াও জরুরী।

নাজাতের একমাত্র পন্থা হলো ইসলাম

এ আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন নাজাতের একমাত্র পন্থা হলো ইসলাম। আল্লাহ পাকের নিকট ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম আর ইসলাম ব্যতীত আল্লাহ পাকের নিকট কোন ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়, কোরআনে করীমের অন্য আয়াতেও এরশাদ হয়েছেঃ

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৭, পৃষ্ঠা- ২০৭
২। তফসীরে রূহুল মাআনী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১০৬

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ

অর্থাৎ যারা দ্বীন ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের সন্ধান করে তা তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবেনা যেমন আকবরের যুগে "দ্বীনে এলাহী" তৈরী করা হয়েছিল, ইসলামী আদর্শের প্রভার বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্রেই দ্বীনে এলাহীর ধুয়া তেলা হয়েছিল। হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রহঃ)-এর প্রচণ্ড প্রতিরোধের কারণেই সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়।

ইসলামের পরিপূর্ণ জীবন বিধান

বর্তমান যুগেও একদল লোক ইসলামকে সঠিকভাবে বোঝার চেষ্টা করেনা। তারা মনে করে ধর্ম হলো একটি নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু ইসলাম এমন ধর্ম নয়, ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয় এবং আন্তজার্তিক ক্ষেত্রে ত'র বিধান পেশ করে। মানব জীবনের এমন কোন দিক নেই যা ইসলামের আওতাধীন নয়, কেননা ইসলাম পূর্ণ পরিণত, যুক্তিসঙ্গত, বাস্তবের অগ্নি পরীক্ষায় বারে বারে পরীক্ষিত জীবন বিধান। ইসলামের পরিপূর্ণতা পবিত্র কোরআনে বারে বারে ঘোষিত হয়েছে। অতএব, যারা ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামকে মানতে রাজী অথচ সমাজ ও জাতীয় জীবনে ইসলামের প্রতিফলন দেখতে নারাজ তারা ইসলামের কিছু অংশের প্রতি বিশ্বাস করে আর কিছু অংশের প্রতি অবিশ্বাস করে, আল্লাহ পাকের নিকট খন্ডিত ইসলাম গ্রহণযোগ্য নয়। আধুনিক কালে যারা মুসলমান হয়েও সেকুলারিজম তথা ধর্ম নিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে এবং তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষতার ছত্রচ্ছায়ায় ইসলামের শক্তিকে দুর্বল করার প্রয়াস পায় তাদের ভ্রান্ত ধারণা এ আয়াত দ্বারা বাতিল ঘোষিত হচ্ছে।

ইসলামের মূল শিক্ষা

কেননা ইসলাম শব্দটি "সালমুন" থেকে নিস্পন্ন। এর অর্থ হলো কোন বস্তু কাউকে অর্পণ করা, নিজেকে কারো নিকট সঁপে দিলে তার পূর্ণ অনুগত হতে হয়, যেমন পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে-

وَلَهٗۤ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا

"এবং আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ পাকের অনুগত হয়েছে, তাঁর বিধি-নিষেধ পালনে প্রস্তুত হয়েছে, সন্তুষ্ট চিত্তে অথবা অসন্তুষ্ট চিত্তে"।

এমনিভাবে পবিত্র কোরআনে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে যখন তিনি স্বপ্নযোগে আল্লাহ পাকের আদেশ পেয়ে তাঁর প্রাণাধিক পুত্র

ইসমাঈলকে (আঃ) যবেহ করতে উদ্যত হয়েছিলেন এবং শিশু ইসমাঈল স্বতঃস্ফূর্তভাবে জবেহ হওয়ার জন্যে নিজেকে পেশ করেছিলেন আর এভাবে তাঁরা উভয়ে আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ আত্ম সমর্পণ করেছিলেন, ঐ অবস্থাকে পবিত্র কোরআন একই শব্দে এভাবে বর্ণনা করেছেঃ

فَلَمَّآ اَسۡلَمَا وَتَلَّهٗ لِلۡجَبِيۡنِ

এ আয়াতে اسلما (আসলামা) শব্দের অর্থ হলো হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং উভয়ে আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ আত্ম সমর্পণ করলেন।

মূলতঃ প্রত্যেক বস্তুর মূলমন্ত্র বা তত্ত্ব তাই হতে পারে যা সে বস্তুর নামে বর্তমান থাকে। ইসলামের মূল তত্ত্ব ইসলাম শব্দটিতেই রয়েছে আর "ইসলাম" শব্দটি আদেশ পালন, পরিপূর্ণ অনুসরণ এবং কোন বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। অতএব, ইসলামের মূল তত্ত্ব হলো মানুষের যথাসর্বস্ব আল্লাহ্ পাকের নিকট সোপর্দ করে দেয়া। তার সমস্ত শক্তি, তার যাবতীয় কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্খা, ভাবাবেগ, তার সমস্ত প্রিয় বস্তু এক কথায় মাথার চুল থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত যা কিছু রয়েছে এর সব কিছুকে আল্লাহর নিকট অর্পণ করার নামই ইসলাম। আর এই ইসলাম যে গ্রহণ করবে সে যেন তার সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি নিয়ে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে অবনত মস্তকে উপস্থিত হয় এবং সব দিক থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে শুধু আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে এভাবে সেজদারত হয় যেন আর কখনো তার বিরোধিতা না করে। মানুষ যেন তার কুপ্রবৃত্তির বিদ্রোহী হয়ে আল্লাহ্ পাকের হুকুমের পূর্ণ তাবেদার হয় আর এটিই হলো ইসলামের মূল শিক্ষা।

আলোচ্য আয়াতের এ ঘোষণা ان الدين عند اللّٰه الاسلام অর্থাৎ ইসলামই আল্লাহ্ পাকের নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবন-বিধান তখনই কোন মানুষের জীবনে বাস্তবায়িত হয় যখন সে সম্পূর্ণ এবং পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্ পাকের সমীপে আত্মসমর্পণ করে। এর পাশাপাশি ইসলামের মূল শিক্ষা হিসেবে আরেকটি কথাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর তা হলো প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী একথার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوۡلُ فَخُذُوۡهُ وَمَا نَهٰكُمۡ عَنۡهُ فَانۡتَهُوۡا

(আল্লাহর রসূল তোমাদেরকে যে আদেশ প্রদান করেন তা গ্রহণ কর আর যে কাজ থেকে বিরত রাখেন তা থেকে বিরত থাক।)

আর একথাটি অন্যভাবেও এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِنَّكَ لَتَهْدِىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

(সূরা যুমার)

(হে রসূল!) নিশ্চয় আপনিই বিশ্ববাসীকে সীরাতুল মুস্তাকীম বা সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। কোরআনে করীমে আরও এরশাদ হয়েছেঃ

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ

"তিনিই সেই আল্লাহ যিনি তাঁর রসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়েত এবং সত্য ধর্ম দিয়ে, যাতে করে তিনি দুনিয়ার সমস্ত ধর্মের উপর দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করেন"।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক আরও এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

"(হে রসূল!) আপনি জানিয়ে দিন হে মানব জাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহর রসূল"।

এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'আল্লাহ্র শপথ যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ! এ উম্মতের কোন ব্যক্তি যদি আমার নবুওয়্যতের কথা শ্রবণ করে এবং আমার প্রতি ঈমান না আনে সে ইহুদী হোক বা নাসারা কাফের অবস্থায় তার মৃত্যু হয় তবে সে অবশ্যই দোযখবাসী হবে'। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত এই হাদীস সংকলিত হয়েছে মুসলিম শরীফে। অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'আমি সাদা কালো সকলের নিকট তথা সমগ্র মানব জাতির নিকট নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছি'। আর একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ প্রত্যেক নবী তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরিত হয়েছেন কিন্তু আমি প্রেরিত হয়েছি সমগ্র মানব জাতির নিকট।

মসনদে আহমদে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ এক ইহুদীর পুত্র প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমত করতেন, তাঁর অজুর পানি নিয়ে আসতেন। তাঁর জুতা রাখতেন, সে অসুস্থ হলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে গেলেন। ইহুদী পিতা তার পাশেই ছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছেলেটিকে সম্বোধন করে বললেন- তুমি বল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'। সে তার পিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করলো,

পিতাকে নীরব দেখে সেও নীরব রইলো। তিনি পুনরায় তাকে কলেমায়ে তাইয়্যেবা পাঠের আহবান জানালেন। তখন তার পিতা বললোঃ আবুল কাসেমের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কথা মেনে নাও। তখন ছেলেটি বললো- আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআন্নাক্কা রসূলুল্লাহ' (অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই আর নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রসূল।)

তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথা বলে সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন, 'আল্লাহর শোকর! যিনি তাকে আমার কারণে দোযখ থেকে রক্ষা করলেন'। এই হাদীস বোখারী শরীফেও সংকলিত হয়েছে।[১]

অতএব, আল্লাহ পাকের একত্ববাদ ও তওহীদ এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস হলো ইসলামের মূল শিক্ষা। ইসলাম সার্বজনীন, সকল যুগের উপযোগী, সমুজ্জল, চিরন্তন সত্য। একথা তদানীন্তন ইহুদী ও নাসারারা ভালভাবেই জানতো কিন্তু তারপরও শুধু জেদ ও হিংসার কারণে এবং এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুখ, সম্মান এবং সম্পদের লোভে তারা ইসলামের এই সত্য গ্রহণ করতে রাজী হয়নি, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ

অর্থাৎ- যে ইহুদী ও নাসারার দল ইসলাম তথা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্যতা অস্বীকার করেছিল তারা তা জ্ঞানের দৈন্যের কারণে করছিল না; বরং নিজেদের জেদ ও হিংসার কারণেই করছিল, তারা ভালভাবেই জানতো আল্লাহ্ এক, তাঁর কোন শরীক নেই, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল কিন্তু এতদসত্বেও তারা তাদের জেদ এবং হিংসার কারণে এবং ধন-সম্পদের লালসায় অন্ধ হয়ে ইসলামের বিরোধিতা করেছে।

এবনে জরীর হযরত মোহাম্মদ এবনে জাফরের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেনঃ এ আয়াত নাযরানবাসী খৃষ্টানদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি লিখেছেনঃ এবনে আবি হাতেম রবীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত মূসা (আঃ) তাঁর মৃত্যুর সময় বণী ইসরাঈলের সত্তর জন আলেমকে একত্রিত করে তওরাতের আমানত তাদেরকে অর্পণ করেন এবং ইউশা এবনে নূন নামক ব্যক্তিকে

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৮

তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন, এর কয়েক শতাব্দী পর ইহুদীদের মধ্যে দলাদলি, রেষারেষি, রক্তারক্তি হতে থাকে, আলোচ্য আয়াতে তাদের উদ্দেশ্যেই

الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ

(যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে) বলা হয়েছে।[১]

এরপর কাফেরদের শাস্তি ঘোষণা করে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহ অস্বীকার করবে আল্লাহ্ পাক নিশ্চয় দ্রুত তার হিসাব গ্রহণ করবেন। কেননা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কবরে প্রথম পরীক্ষা এবং আযাব শুরু হবে। অতঃপর শেষ বিচারের দিনে বিস্তারিত হিসাব হবে এবং কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

فَاِنْ حَاجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلّٰهِ

উপরোক্ত আয়াত সমূহ দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে ইসলামই সত্য ধর্ম এবং সুস্পষ্ট, সমুদ্ভাসিত, সমুজ্জল, সুপ্রমাণিত চিরসত্য। এতদসত্ত্বেও যদি তারা (হে রসূল!) আপনার সাথে অহেতুক বিতর্কে লিপ্ত হয় তখন আপনি বিতর্কের জবাবে শুধু এতটুকু বলুন যে, তোমরা বিশ্বাস কর আর নাই কর আমি স্বীয় মুখমণ্ডল আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে সমর্পণ করেছি। আর আমার অনুসারীগণও তাই করেছে। অর্থাৎ আমরা ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেছি, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করেছি, শেরক কুফরের সকল পন্থা বর্জন করেছি, অন্যায়-অনাচার, পাপাচার পরিত্যাগ করেছি। এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জীবন ও জীবনের যথা সর্বস্ব উৎসর্গ করতে প্রস্তুত রয়েছি। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ

وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি ইহুদী, নাসারা ও মুশরেকদেরকে জিজ্ঞাসা করুন তোমরাও কি এভাবে ইসলাম কবুল করবে? যদি তারা নিয়মিতভাবে ইসলাম কবুল করে তবে তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হবে।

وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা- ২০২

আর যদি তারা ইসলাম কবুল করা থেকে বিরত হয় তবে (হে রসূল!) আপনি তাদের জন্যে আদৌ চিন্তিত হবেন না, কেননা আপনার দায়িত্ব শুধু মানুষের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়া।

وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ

"আর আল্লাহ পাক নিজেই তাঁর বন্দাদেরকে দেখছেন, মোমেন-কাফের সকলেই রয়েছে তাঁর নখদর্পণে, প্রত্যেককে তার কর্মফল ভোগ করতে হবে। (হে রসূল!) আপনাকে তাদের কর্মফল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না"।

اِنَّ
الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ يَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ
حَقٍّ ۙ وَّ يَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۙ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۲۱﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ
اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۫ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿۲۲﴾
اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ
اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿۲۳﴾
ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۠ وَّغَرَّهُمْ
فِيْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿۲۴﴾ فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا
رَيْبَ فِيْهِ ۣ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿۲۵﴾

তরজমা

(২১) নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ পাকের নিদর্শন সমূহে অবিশ্বাস করে এবং নবীগণকে হত্যা করে অন্যায়ভাবে এবং মানুষের মধ্যে যারা হক্ব ইনসাফের আদেশ করে তাদেরকেও হত্যা করে (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে কঠোর শাস্তির সংবাদ দিন।

(২২) এরা সে সব লোক, যাদের কার্যাবলী ইহকাল ও পরকালে ব্যর্থ হয়েছে এবং তাদের জন্যে কোন সাহায্যকারীও নেই।

(২৩) (হে রসূল!) আপনি কি লক্ষ্য করছেন না? যে যাদেরকে আসমানী কিতাবের কিছু অংশ দেয়া হয়েছিল তাদেরকে আল্লাহ্ পাকের কিতাবের প্রতি

আহবান জানানো হয় যেন তাদের মধ্যে সে কিতাব মীমাংসা করে। অতঃপর একদল লোক মুখ ফিরিয়ে নেয় আরা তারা অগ্রাহ্যকারী।

(২৪) এর কারণ এই যে, তারা বলে নির্ধারিত কয়েকটি দিন ব্যতীত আমাদেরকে দোযখ স্পর্শ করবে না। বস্তুতঃ ধর্মীয় ব্যাপারে তাদেরকে এসব মনগড়া কথা প্রবঞ্চিত করেছে।

(২৫) অতএব, সেদিন তাদের কি অবস্থা হবে? যেদিন তাদেরকে আমি একত্রিত করবো, সেদিন সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই এবং প্রত্যেককে তার কর্মফল পূর্ণভাবে দেয়া হবে আর তারা অত্যাচারিত হবে না।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে (হে রসূল!) যদি আহলে কেতাব ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় তবে তারা তার শোচনীয় পরিণাম ভোগ করবে, আপনার দায়িত্ব শুধু তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া।

আর এ আয়াতে ইসলাম গ্রহণে যারা রাজী হয়নি তাদের তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহর নাফরমানদের জন্যে কঠোর শাস্তির ঘোষণা

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ

নিশ্চয় যারা আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করে, এ বাক্যটি ইহুদী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়েছে, কেননা তারা পবিত্র কোরআনকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। এমনিভাবে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব ইঞ্জিলকেও অস্বীকার করেছে। এমনকি তওরাতের সেই অংশকেও অস্বীকার করছে যাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে।[১]

وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ

"যারা আম্বিয়ায়ে কেরামকে হত্যা করে"।

কেননা, এই ইহুদীদের পূর্ব পুরুষরা অনেক নবীকে হত্যা করেছে। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগের ইহুদীরা এমন অন্যায় কাজের শুধু যে সমর্থক ছিল তাই নয়, বরং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড- ২; পৃষ্ঠা-২০৪

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করতো, তারাইতো তাঁর খাদ্যে বিষ মিশিয়ে ছিল। তাঁর প্রতি তারা যাদু করেছিল। তাঁর সাথে তারা যুদ্ধ করেছে।

بِغَيْرِ حَقٍّ

এ অমার্জনীয় অপরাধকে তারা নিজেরাও না-হক্ক বা অন্যায় মনে করতো কিন্তু ক্ষমতার লোভ, অর্থ-সম্পদের অদম্য লালসা তাদেরকে এমন অন্যায় করতে প্ররোচিত করতো।

وَيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ

আর যারা হক্ব ও ইনসাফ করার তথা ন্যায় বিচার কায়েম করার আহ্বান জানাতো, তাদেরকেও এ দুর্বৃত্তরা হত্যা করতো অর্থাৎ আল্লাহর নবীদের অনুসারীদেরও তারা হত্যা করেছে। এবনে জোরায়েহ বর্ণনা করেছেন, বণী ইসরাঈলের নবীগণের নিকট আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে ওহী আসতো আর সে অনুসারে তাঁরা মানুষকে হেদায়েত করতেন, তখন পাপীষ্ঠ ইহুদীরা তাঁদেরকে হত্যা করতো।

আল্লামা বগবী (রঃ) হযরত আবু ওবায়দা এবনুল জাররাহ্ (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমি প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরয করলাম ঃ

ইয়া রসূলাল্লাহ! কেয়ামতের দিন সর্বাধিক কঠিন শাস্তি কার হবে? তিনি এরশাদ করেছেনঃ যে কোন নবীকে হত্যা করেছে অথবা যে সৎ কাজের নির্দেশ প্রদানকারী ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধকারীকে হত্যা করেছে। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অতঃপর এরশাদ করেছেন ঃ

বনি ইসরাইল ৪৩ জন নবীকে দিনের প্রথম ভাগে এক ঘন্টার মধ্যে হত্যা করেছে। আম্বিয়ায়ে কেরামের শাহাদাতের পর বণী ইসরাঈলের ১২০ জন পরহেযগার লোক সৎ কাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে সচেষ্ট হয়। ইহুদীররা ঐ একই দিনের শেষ ভাগে এদেরকেও হত্যা করে। তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ পাক এ আয়াতে কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেনঃ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

"(হে রসূল!) আপনি তাদেরকে কঠোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির খবর দিন"।[১]

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-২১৪
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড- ৩, পৃষ্ঠা-১০৯
তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২০৫

এরাই সে সব লোক যাদের কার্যাবলী ব্যর্থ হয়েছে। দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে তাদের ব্যর্থতা অবধারিত। দুনিয়াতে তাদের প্রতি লা'নত এবং আখেরাতে তাদের কঠিন শাস্তি অবধারিত। আর তাদের কোন সাহায্যকারীও থাকবে না যে তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে।

اَلَمۡ تَرَ اِلَى الَّذِيۡنَ اُوۡتُوۡا نَصِيۡبًا مِّنَ الۡكِتٰبِ

শানে নুযুল

এবনুল মুনজের, এবনে এসহাক, এবনে জরীর এবং এবনে আবি হাতেম একরামার বর্ণনা থেকে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইহুদীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গমন করে তাদেরকে ইসলাম কবুল করার জন্যে আহবান জানান। তাদের মধ্য থেকে নায়ীম এবনে আমর এবং হারেস এবনে যায়েদ নামক ব্যক্তিদ্বয় তাঁকে জিজ্ঞাসা করেঃ আপনি কোন্ দ্বীনের উপর রয়েছেন? তিনি এরশাদ করলেনঃ আমি ইব্রাহীম (আঃ)-এর মিল্লাত এবং তাঁর দ্বীনের উপর রয়েছি। তারা বললঃ ইব্রাহীম (আঃ) তো ইহুদী ছিলেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আস তৌরাত দেখো। তৌরাতের বিবরণই আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করবে। কিন্তু তারা তৌরাত দেখতে অস্বীকার করে অথচ তারা তৌরাতের প্রতি বিশ্বাসী হওয়ার দাবীদার ছিল। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) তাঁর তফসীরে কবীরে এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে আরও দুটি বিবরণ সন্নিবেশিত করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে এক ইহুদী ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়, এই ব্যাভিচারী ব্যক্তি এবং ব্যাভিচারিনী অভিজাত বংশীয় ছিল। এ কারণে তৌরাতে বর্ণিত ব্যাভিচারের শাস্তি (প্রস্তর নিক্ষেপের মাধ্যমে হত্যা করা) প্রয়োগ করতে তারা প্রস্তুত হলোনা। তারা মনে করলো হয়তো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক্ষেত্রে লঘু শাস্তির নির্দেশ প্রদান করেন। তাই তারা তাঁর সমীপে হাযির হলো। তিনি আদেশ দিলেনঃ উভয় অপরাধীকে প্রস্তর নিক্ষেপের মাধ্যমে শাস্তি দাও কিন্তু তারা তাতে রাজী হলোনা। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আমার এবং তোমাদের মধ্যে তৌরাতই মীমাংসা করবে, কেননা তৌরাতে ব্যাভিচারের শাস্তি হলো রজম তথা প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্য করা। তোমাদের মধ্যে তৌরাতের সবচেয়ে বড় আলেম কে? তারা বললোঃ আবদুল্লাহ এবনে সুরিয়া আল ফদুকী, তখন তাকে হাযির করলো এবং তৌরাতও আনলো। সে তৌরাত পাঠ করতে

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড- ২, পৃষ্ঠা- ২০৬

লাগলো কিন্তু যখন রজমের আয়াত আসলো তখন সে তার উপর হাত রেখে দিয়ে সম্মুখে পড়তে থাকে। তখন হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) বলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! রজমের আয়াত রয়েছে অথচ সে ঐ আয়াত পাঠ করছেনা। তখন তার হাত সরানো হয় এবং সকলেই রজমের আয়াত দেখতে পায়। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রজমের শাস্তি প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেন। এ কারণে ইহুদীরা খুব রাগান্বিত হয়। সে মুহূর্তে এ আয়াত নাযিল হয়।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছেঃ তৌরাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলীর যে বিবরণ রয়েছে এবং তাঁর নবুওয়্যাতের যে দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে তা দেখার জন্যে তিনি ইহুদীদের প্রতি আহবান জানান কিন্তু তারা এ আহবানে সাড়া দিতে আপত্তি জানায়। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا الآية

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি কি তাদের অবস্থা দেখেননি যাদেরকে আসমানী গ্রন্থের (তৌরাতে) কিছু অংশ প্রদান করা হয়েছিল, যদি হেদায়েত তাদের কাম্য হতো তবে তৌরাতের এ অংশই যথেষ্ট হতো। তাদেরকে তৌরাতের বিধান অনুসরণের জন্যে আহবান জানানো হয় একটি বিশেষ মাসআলা নিয়ে কিন্তু তারা এ আহবানে সাড়া দেয় না। তাদের এ গাফলত এবং জেদের কারণ এই যে, তারা একটি ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে। এরশাদ হয়েছেঃ

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودٰتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ

তারা বলে যে, আমাদেরকে সামান্য কয়েক দিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। এরপর আমাদেরকে মাফ করা হবে। অর্থাৎ যে চল্লিশ দিন তারা বাছুরের পূজা করেছিল সে কয়েক দিনই তাদেরকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

মূলতঃ তারা বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট, প্রতারিত, প্রবঞ্চিত। একটি প্রতারণা হলো শুধু কয়েক দিনই আযাব ভোগ করতে হবে, অতঃপর নাজাত লাভ হবে।

দ্বিতীয় প্রতারণা হলো আমাদের পূর্ব পুরুষের মধ্যে যারা নবী ছিলেন তাঁরা আমাদের পক্ষে সুপারিশ করবেন।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৭,পৃষ্ঠা০২১৬,২১৭
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১১০-১১১
তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২০৬-২০৭

তৃতীয় মিথ্যা এবং প্রতারণা হলো, আল্লাহ পাক হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর সাথে অঙ্গীকার করেছেন যে, তাঁর সন্তানদের শাস্তি হবে না।[১] অথচ এসবই মন ভোলানো কথা, সবই প্রতারণা। প্রকৃত অবস্থা এই যে, পরকালে প্রত্যেকটি মানুষকে অবশ্যই তার কর্মফল ভোগ করতে হবে। এরশাদ হয়েছে ঃ

فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ

অতঃপর তাদের কি অবস্থা হবে? যখন আমি তাদের সকলকে কেয়ামতের দিন একত্রিত করব। যেদিনের ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রত্যেককে তার ভাল কাজের পুরস্কার এবং মন্দ কাজের শাস্তি প্রদান করা হবে। আর তাদের প্রতি আদৌ জুলুম করা হবে না। কেউ সৎ কাজ করলে তার পুরস্কার থেকে সে মাহরুম হবে না এবং যে যতটুকু অন্যায় করবে, তার চেয়ে অধিক শাস্তি তার হবে না, বরং প্রত্যেককে তার আমলের পূর্ণ বিনিময় প্রদান করা হবে।

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ
مِمَّنْ تَشَآءُ ز وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط
اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٦﴾ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ
النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ز وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ
مِنَ الْحَىِّ ز وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

তরজমা

(২৬) (হে রসূল!) আপনি বলুন, হে সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিপতি! তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমতা প্রদান কর এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা ছিনিয়ে লও, যাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর, যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর, সকল কল্যাণ একমাত্র তোমারই হাতে। নিশ্চয় তুমি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

(২৭) তুমিই রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে পরিণত কর, তুমিই মৃত থেকে জীবিতকে বের কর এবং জীবিত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও, আর তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিয্ক দান করে থাক।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা- ২০৮
তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১১১

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হিজরতের এক বছর পরই বদরের যুদ্ধ হলো, এ যুদ্ধে মক্কার পৌত্তলিকরা পরাজিত হলো। এর এক বছর পর ওহুদের যুদ্ধেও তাদের হামলা ব্যর্থ হলো। তখন তারা সংকল্প করলো সারা আরবের সমস্ত ইসলাম বিরোধী শক্তি যুক্তফ্রন্ট করে প্রাণের মদীনা আক্রমণ করবে। পঞ্চম হিজরীতে কাফের মুশরেক ইহুদী খৃষ্টানদের ঐক্যজোট গড়ে ওঠে। সম্মিলিত বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা দাড়ালো ১২ হাজার। পবিত্র কোরআন এ যুদ্ধকে আহযাবের যুদ্ধ বলে নামকরণ করেছে। এ নামে একটি সূরাও আছে। সূরা আহযাবে এ যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

সম্মিলিত বাহিনীর এ হামলার উদ্দেশ্যে ছিল ইসলামের মূলোৎপাটন। যাহোক, শত্রু যখন মদীনা মুনাওয়্যারা আক্রমণের প্রস্তুতি নিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন। হযরত সালমান ফার্সীর (রাঃ) পরামর্শ মোতাবেক মদীনা শরীফের উপকণ্ঠে দুশমনের আগমন পথে পরিখা খননের সিদ্ধান্ত হলো। গভীর এবং প্রশস্ত পরিখা খননের পরিকল্পনা গৃহীত হলো। সঙ্গে সঙ্গে পরিখা খনন আরম্ভ হলো। তিন হাজার সাহাবী খনন কাজে অংশ গ্রহণ করলেন। স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বক্ষণ খনন কার্যে রত রইলেন।

বিস্ময়কর ঘটনা

পরিখা খননকালে এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটলো। এক বিরাট প্রস্তর খণ্ড দেখা দিল যা অপসারণ করা সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে সম্ভব হলোনা। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বয়ং ঐ প্রস্তর খন্ডে কোদাল দ্বারা আঘাত করলেন ফলে তা খণ্ড বিখণ্ড হলো এবং আঘাতের ফলে তা থেকে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বের হলো। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ এ অগ্নি স্ফুলিঙ্গের আলোকে আমাকে পারশ্য সাম্রাজ্যের রাজ প্রাসাদ দেখানো হয়েছে। অতঃপর তিনি দ্বিতীয়বার আঘাত করলে পুনরায় অনুরূপ অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বের হলো। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ এর আলোকে আমাকে রোম সাম্রাজ্যের লাল রংয়ের ইমারত গুলো দেখানো হয়েছে। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পুনরায় আঘাত করলে অনুরূপভাবে আলোক রশ্মি ছড়িয়ে পড়ে। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ এবারে আমাকে ইয়ামনের রাজধানী “সানআ” শহরের উঁচু উঁচু দালান কোঠা দেখানো হয়েছে। তিনি আরও এরশাদ করলেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ زَوٰى لِى فِى الارض مَشَارقها ومغاربها وَسَيَبْلُغُ مُلْكُ اُمَّتِىْ مَازوى لى منها

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক আমাকে পৃথিবীর প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের স্থান সমূহ দেখিয়েছেন। অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মতের ক্ষমতা সে সব এলাকায় বিস্তার লাভ করবে যা আমাকে দেখানো হয়েছে"।

একথা শ্রবণ করে ইসলামের দুশমনরা বলতে লাগলো মদীনাতেই যাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত, যারা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে দিবা-নিশি পরিখা খননে ব্যস্ত। যারা রয়েছে ক্ষুধার্ত, তারা এ অবস্থায় রোম, পারশ্য এবং ইয়ামন বিজয়ের স্বপ্ন দেখছে এর চেয়ে বিস্ময়কর কথা আর কি হতে পারে!

ইসলামের দুশমনদের এ আস্ফালনের জবাবে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত নাযিল করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ হে রসূল! আপনি জানিয়ে দিন যে ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিকানা একমাত্র আল্লাহ পাকের। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে এ ক্ষমতা দান করে থাকেন। আর যাকে ইচ্ছা তাকে এ ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এক আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে সম্মানিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকেই অপমানিত করেন। তাই আজ যারা ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত অবস্থায় পরিখা খননে ব্যস্ত, যারা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সংগ্রাম-রত তাদেরকে আল্লাহ পাকের মর্জি হলে তিনি পারশ্য, ইয়ামন এবং রোমের অধিপতি করতে পারেন অনতিবিলম্বে।[১] বলাবাহুল্য, এর মাত্র কয়েক বছর পরই ঐ সমস্ত দেশ মুসলমানদের করতলগত হয়েছিল। এভাবে পবিত্র কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছিল, কেননা সার্বিক কল্যাণ আল্লাহ পাকেরই হাতে।

اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থাৎ নিশ্চয় তুমি সকল বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। আসমান, যমীন, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত এক কথায় সবকিছুই হে আল্লাহ! তোমার নিয়ন্ত্রাণাধীন এবং কর্তৃত্বাধীন। তুমিই রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে পরিণত কর। শীতকে গ্রীষ্মে এবং গ্রীষ্মকে শীতে পরিবর্তন করা তোমারই কাজ। তুমিই মৃত থেকে জীবিতকে এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের কর। তুমিই বীজ থেকে ফসল এবং ফসল থেকে বীজ বের কর। তুমি খেজুরের দানা থেকে খেজুর বৃক্ষ-উৎপন্ন কর

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা- ২০৮-২০৯
তফসীরে কবীর খন্ড- ৮, পৃষ্ঠা-৪
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১১২-১৩

আর দানাটি বের কর খেজুর থেকে। হে আল্লাহ! তুমিই সৃষ্টি কর কাফেরের গৃহে মোমেনকে আর মোমেনের গৃহে কাফেরকে। হে আল্লাহ! তুমিই সৃষ্টি কর ডিম থেকে মুরগী আর মুরগী থেকে ডিম। সব কিছুই তোমার নিয়ন্ত্রণাধীন। তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে অপরিমিত রিয্‌ক দান কর। আর যাকে ইচ্ছা তাকে মাহরুম কর। হে আল্লাহ! সবই তোমার করতলগত।

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন এরশাদ করেছেনঃ হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনি স্বীয় প্রতিপালকের সমীপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে তাঁর প্রতি আত্ম-সমর্পণ করার উদ্দেশ্যে এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ ভরসা প্রকাশ করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এভাবে বর্ণনা করুনঃ হে আল্লাহ! তুমিই মুলকের মালিক, সর্বময় ক্ষমতার মালিক তুমিই, তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে পৃথিবীতে ক্ষমতা দান কর আর যাকে ইচ্ছা তার নিকট থেকে প্রদত্ত ক্ষমতা ছিনিয়ে নাও। তুমি যা চাও তাই হয় আর যা চাওনা, তা হয়না। এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এবং তাঁর উম্মতকে যে অনন্ত অসীম নেয়ামত দান করেছেন তার জন্যে শোকর-গুজারীর হুকুমও রয়েছে। যেমন নবুওয়্যত বণী ইসরাঈলে ছিল, ইতোপূর্বে দু' হাজার বছরে চার হাজার নবী তাদের মধ্যে এসেছিলেন কিন্তু আল্লাহ পাক বণী ইসরাঈলকে এ নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করে বণী ইসমাঈলকে তা দান করেছেন এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নবী হিসেবে আগমন করেছেন। তিনি শুধু নবীই নন; বরং সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, নবীগণের দলপতি বা সাইয়্যেদুল মুরসালীন। সমগ্র মানব এবং জ্বীন জাতির জন্যে তিনি প্রেরিত, তাঁর মাধ্যমেই নবুওয়্যতের পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে। তাঁর পরে আর কোন নবীর আগমন হবেনা আর কোন নবীর প্রয়োজনও হবে না। পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরামের সকল গুণাবলী ও যাবতীয় মোযেজা বা অলৌকিক ক্ষমতা তাঁকে একা দান করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত তাঁকে এমন ফজিলত, মাহাত্ম এবং বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে যা অন্য কোন নবী লাভ করেননি। আখেরাতের সকল তত্ত্ব সম্পর্কে আল্লাহ পাক তাঁকে অবহিত করেছেন। প্রাচ্য প্রতীচ্যে তাঁর উম্মতকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর প্রচারিত ধর্ম- দ্বীন ইসলামকে সমস্ত ধর্মের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। লক্ষ কোটি দরুদ ও সালাম কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর প্রতি বর্ষিত হোক। এসব কিছু আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং মর্জিতেই হয়েছে।[১] অতএব, আজ যারা ক্ষুধার্ত অবস্থায় আত্মরক্ষার প্রয়োজনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে পরিখা খনন করছেন, অসহায় অবস্থায় রয়েছেন কাল আল্লাহ পাকের দানে ধন্য হয়ে তাঁরাই পারশ্য, রোম এবং ইয়ামনের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবেন। আর আল্লাহ পাকের পক্ষে এ কাজ আদৌ কঠিন নয়। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে অপরিমিত রিয্‌ক দান করে থাকেন।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা-৫০

ইতিহাস-সাক্ষী! বাস্তবেও তাই হয়েছিল, পঞ্চম হিজরীতে অনুষ্ঠিত খন্দকের যুদ্ধে কাফেরদের সম্মিলিত শক্তি সম্পূর্ণ পরাস্ত এবং অপমানিত হয়ে বিদায় নিতে বাধ্য হয়। ষষ্ঠ হিজরীতে তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে মক্কার অদূরে অবস্থিত হোদায়বিয়া নামক স্থানে যুদ্ধ নয় চুক্তি বা শান্তি চুক্তি করে। কিছু দিন পর তারা সে চুক্তি লংঘন করে ফলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অষ্টম হিজরীতে মক্কা অভিযান করেন এবং আল্লাহ পাক মক্কা বিজয় দান করেন। এভাবে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতের ঘোষণাকে ঐতিহাসিক মহাসত্যে পরিণত করেন। এরপর মাত্র দু' বছর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে ছিলেন। তাঁর এন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রাঃ) প্রায় আড়াই বছর যাবত ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর এ দায়িত্ব অর্পিত হয় হযরত ওমর (রাঃ)-এর উপর। তাঁর শাসনামল ছিল প্রায় সাড়ে দশ বছর।

আলোচ্য আয়াত নাযিল হয় পঞ্চম হিজরীতে। এরপর মাত্র এক যুগের মধ্যেই তদানীন্তন পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ মুসলমানদের করতলগত হয়। সর্বত্র ইসলামী পতাকা উড্ডীন হয়। এরই মধ্যে রোমান এবং পারশ্য সাম্রাজ্য মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে আসে। এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাকের যে ঘোষণা রয়েছে তা বাস্তবায়িত হয় ঃ "(হে রসূল!) আপনি বলুনঃ হে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিপতি! যাকে ইচ্ছা তুমি তাকে ক্ষমতা প্রদান কর এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা ছিনিয়ে নাও"।

মূলতঃ ক্ষমতা প্রদান এবং ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করণ-এর জন্যে পবিত্র কোরআন নীতিমালা ঘোষণা করেছে। যারা মানুষের প্রতি জুলুম অত্যাচার করে, মানবতার অবমাননা করে, মানবতার উৎকর্ষ সাধনের পথে অন্তরায় হয়ে দাড়ায়, সুবিচার ও পরোপকারের স্থলে মানুষের প্রতি অবিচার করে তাদেরকে একটি নিদৃষ্ট কাল পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হয়। অতঃপর আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাদেরকে পাকড়াও করা হয়। ফেরআউন, নমরুদ, শাদ্দাদ গংকে এ নীতি মোতাবেকই ধ্বংস করা হয়েছে, পবিত্র কোরআন বিস্তারিতভাবে তাদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে এমনকি, মুসলমানদেরকেও বিশেষভাবে সম্বোধন করে এ সম্পর্কে সর্তক করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে বিষয়টিকে এভাবে পেশ করা হয়েছে ঃ

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ

যদি আল্লাহ পাক ইচ্ছা করেন তবে তিনি তোমাদের বিদায় করে দেবেন এবং তোমাদের স্থলে নতুন সম্প্রদায় আনয়ন করবেন। এটি তাঁর ইচ্ছার ব্যাপার। তাই রোমক সাম্রাজ্য বা পারশ্য সাম্রাজ্যকে বিদায় করে দেয়া কোন কঠিন ব্যাপার নয়।

আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তাঁর যা ইচ্ছা তিনি তাই করে থাকেন, পৃথিবীতে তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমতা দিয়ে থাকেন।

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ
الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ
فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ط
وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ط وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨﴾ قُلْ اِنْ
تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ط وَيَعْلَمُ مَا
فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٩﴾
يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۛ وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ
سُوْٓءٍ ۛ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًا بَعِيْدًا ط وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ
نَفْسَهٗ ط وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾

তরজমা

(২৮) মোমেনগণ যেন মোমেনদের পরিবর্তে কাফেরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করে, যে কেউ এ কাজ করবে তার সাথে আল্লাহ পাকের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের নিকট থেকে আত্মরক্ষার জন্যেই সর্তকতা অবলম্বন কর (এমন ক্ষেত্রে বাধা নেই) আর আল্লাহ পাক তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছেন। আর আল্লাহ পাকের নিকটই তোমাদের প্রত্যাবতন করতে হবে।

(২৯) (হে রসূল!) আপনি বলে দিন যে তোমাদের মনের গহনে যা কিছু আছে তা গোপন কর বা প্রকাশ কর আল্লাহ পাক সব কিছুই জানেন এবং দ্যুলোক-ভূলোকে যা কিছু রয়েছে সবই তিনি জানেন। আর আল্লাহ পাক সকল বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

(৩০) স্মরণ কর সেদিনকে যেদিন তোমাদের প্রত্যেকেই তার ভাল-মন্দ কাজকে চোখের সম্মুখে দেখতে পাবে। সেদিন সে ইচ্ছা করবে যে, যদি তার ও তার কার্যাবলীর মধ্যে দূরত্ব হতো তবে খুবই ভালো হতো এবং আল্লাহ পাক স্বয়ং তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছেন আর আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাগণের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান, অতীব করুণাময়।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

এবনে জরীর সাঈদ এবং একরামার বর্ণনা থেকে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হাজ্জাজ এবনে আমর এবনে আবিল হাকীক এবং কায়েস এবনে যায়েদ নামক ইহুদী কয়েকজন মদীনাবাসী আনসারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে এবং তাদেরকে বিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট করতে সচেষ্ট হয়। তখন রোফাআ এবনে মনযির, আবদুর রহমান এবনে যোবায়ের, সাঈদ এবনে খাইসামা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ মদীনাবাসী মুসলমানদেরকে এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের তাগিদ করেন এবং ইহুদীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরামর্শ দেন। তখন তারা এ সম্পর্ক ছিন্ন করতে রাজী না হলে এ আয়াত নাযিল হয়।

এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে মোকাতেল (রঃ) আরেকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন এ আয়াত নাযিল হয়েছে হাতেব এবনে আবি বলতাআর (রাঃ) ব্যাপারে। তাঁর কয়েকজন নিকটাত্মীয় মক্কা শরীফে ছিল। মক্কার কয়েকজন মুশরেকের সঙ্গে তাঁর সু-সম্পর্ক থাকায় তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মক্কা অভিযান সম্পর্কে মক্কাবাসীকে সংবাদ দিয়েছিলেন তখন এ আয়াত নাযিল হয় এবং কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক না রাখার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে তফসীরকারগণ আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত ওবাদা এবনে সামেত (রাঃ) সম্পর্কে। মদীনা শরীফের ইহুদীদের সাথে তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। পঞ্চম হিজরীতে অনুষ্ঠিত খন্দকের যুদ্ধের সময় ওবাদা এবনে সামেত (রাঃ) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! ইহুদীদের সঙ্গে আমার কিছু সম্পর্ক আছে। পাঁচশত ইহুদী আমার সঙ্গে আসতে চায় এবং আমাদের পক্ষে লড়াই করতে চায়। তখন এ আয়াত নাযিল হলো এবং কাফের-মুশরেক-বে-দ্বীনদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিষিদ্ধ ঘোষণা হলো।[১] পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে আরও বহু আয়াতে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে ঃ

যেমন সূরা মোমতাহেনায় এরশাদ হয়েছেঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ

"হে মোমেনগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহন করোনা"। এমনিভাবে আরও এরশাদ হয়েছে ঃ

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৮, পৃষ্ঠা১০-১১
তফসীরে রুহুল মা'আনী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১২০-২১
তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২১৩

لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰۤى اَوْلِيَآءَ

"হে মোমেনগণ! তোমরা ইহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা"। আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ

"এবং মোমেন পুরুষ ও মহিলাগণ পরস্পর বন্ধু"।

এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে কাফের মুশরেকদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ, কেননা কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্বের মাধ্যমে কুফরী কাজে রাজী থাকা প্রমাণিত হয়। যে কুফরী কাজে রাজী থাকে তার পক্ষে মোমেন থাকা সম্ভব নয়। অতএব, কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা মোমেনের শানের খেলাফ। দ্বিতীয়তঃ কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্বের পরিণাম আল্লাহ পাকের দরবার থেকে দূরত্ব ব্যতীত আর কিছুই নয় তবে নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদে প্রকাশ্যে মেলামেশা, লেনদেন করা নিষিদ্ধ নয়। দুনিয়ার জীবনের কোন প্রয়োজন অথবা ক্ষতির কোন আশংকা থাকলে সেই ভয়ে তাদের সঙ্গে প্রকাশ্যে মেলা মেশা করা বা ব্যবসা-বাণিজ্য করা অবৈধ নয় তবে অন্তরে তাদের কুফর ও নাফরমানীর প্রতি ঘৃণা অবশ্যই থাকতে হবে।[১]

অমুসলিমদের সাথে সদাচরণের শিক্ষা

তবে এখানে উল্লেখ্য কাফের, মুশরেক, ইহুদী, নাসারাদের সঙ্গে প্রীতি বা বন্ধুত্বের সম্পর্ক না রাখার যে নির্দেশ বিভিন্ন আয়াতে রয়েছে এতে কারো মনে এমন সন্দেহের উদ্রেক হওয়ার কোন ন্যায্য কারণ নেই যে অমুসলিমদের সাথে সদাচরণেরও হয়তো কোন সুযোগ নেই, কেননা পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে এবং বিভিন্ন হাদীসে অমুসলিমদের সঙ্গে সদাচরণের তা'লীম রয়েছে। তাদের প্রতি সহানুভূতির নির্দেশ রয়েছে। বদরের যুদ্ধ-বন্দীদের সাথে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সদাচরণের তাগিদ করেছিলেন ফলে সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের খাদ্য বন্দীদেরকে খেতে দিয়েছিলেন এবং নিজেরা ক্ষুধার্ত থেকে রাত অতিবাহিত করেছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। এমনিভাবে মক্কা শরীফে যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীর জন্যে খাদ্য-দ্রব্য প্রেরণ করেছিলেন। এ ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে, অমুসলিমদের সাথে সদাচরণের তাগিদ করে ইসলাম তবে যা অবৈধ তা হলো তাদের সাথে আন্তরিক প্রীতি এবং ভালবাসা যা শুধু মুসলমানদের সাথেই হবে।

১। খোলাসাতুত তাফাসীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৪২

অমুসলমানদের সাথে আন্তরিক ভালবাসার অনুমতি ইসলাম দেয়না তবে এর পাশাপাশি অমুসলিমদের প্রতি শুভেচ্ছা প্রকাশের, তাদের কল্যাণ সাধনের ব্যাপারে ইসলামের নীতি হলো যেসব অমুসলিম মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ রত নয় তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে এবং তাদের উপকার করতে ইসলাম নিষেধ করেনা। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ (সূরা মোমতাহেনা)

"আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে নিষেধ করেন না তাদের সাথে দয়া ও সুবিচারের ব্যবহার করতে যারা তোমাদের সঙ্গে দ্বীনের ব্যাপারে যুদ্ধ রত নয় এবং যারা তোমাদের বহিস্কার করেনি তোমাদের দেশ থেকে"।

এ আয়াত দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, যারা মুসলমানদের প্রতি ইতোপূর্বে জুলুম করেনি আর এখনও যুদ্ধরত নয়, তাদের সাথে দয়া এবং ন্যায় বিচার সুলভ ব্যবহার করতে ইসলাম নিষেধ করেনা।

আর অমুসলিমদের সাথে সৌজন্য মূলক আচরণের ব্যাপারে মূল কথা হলো আগে দেখতে হবে তার উদ্দেশ্যে কি? তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেনঃ উদ্দেশ্য যদি কোন প্রকার দ্বীনি উপকার সাধন করা হয় বা মেহমানের মেহমানদারী করা হয়, অথবা তাদের অনিষ্ট থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করা হয়ে থাকে তবে সর্বপ্রকার অমুসলিমের সাথে সৌজন্য মূলক আচরণের অনুমতি রয়েছে ইসলামে।

এতদ্ব্যতীত, অমুসলিমের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে, চাকুরী করতে, শিল্প কারখানায় সহযোগিতা করতে ইসলাম বাধা দেয় না। যদি এসব কাজের কারণে মুসলিম জনতা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আর এ কারণেই ইসলামী শরীয়তের তত্ত্বজ্ঞানীগণ কাফেরদের নিকট অস্ত্র-শস্ত্র বিক্রয় করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

এখানে আরও একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ

দুনিয়াতে যার সাথে যার ভালবাসা রয়েছে পরকালে তার সাথেই হবে তার হাশর। হযরত এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত এই হাদীসের মর্মানুযায়ী কাফেরদের সাথে আন্তরিক প্রীতির সম্পর্ক রাখা যে অত্যন্ত বিপজ্জনক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এতদ্ব্যতীত শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা করা ঈমানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

নেককার সাথীর দৃষ্টান্ত

হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ নেককার সাথীর দৃষ্টান্ত হলো সে ব্যক্তির ন্যায় যে কস্তরী সঙ্গে রাখে আর মন্দ সাথীর দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির ন্যায় যে অগ্নিকুণ্ডে জ্বালানী সরবরাহ করে। কস্তরী বহনকারী ব্যক্তির সঙ্গী হলে সে হয়তো তোমাকে বিনামূল্যে একটু কস্তরী দান করবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে ক্রয় করবে, যদি তাও না হয় তবে অন্তত কস্তরীর খুশবুতো তোমার নিকট পৌঁছবে। আর যে অগ্নিকুণ্ডে জ্বালানী সরবরাহ করে তার সাথী হলে হয়তো সে অগ্নির কারণে তোমার পোশাক জ্বলবে অথবা সেদিক থেকে তোমার নিকট দুর্গন্ধ আসবে।

ঈমান অর্জনের পন্থা

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবু যর (রাঃ)-কে বলেছেনঃ হে আবু যর! ঈমান অর্জনের কোন্ পন্থাটি সর্বাধিক দৃঢ়তর? হযরত আবু যর (রাঃ) আরজ করলেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব করা আর এ উদ্দেশ্যেই শত্রুতা করা।[১]

মূলত এক আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জীবনের যাবতীয় কাজ করা প্রকৃত মোমেনের বৈশিষ্ট্য।

উপরোল্লিখিত হাদীস সমূহের আলোকে একথা প্রমাণিত হয় যে, কাফেরদের সাথে আন্তরিক মহব্বত বা হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক রাখা কোন মুসলমানের জন্যে বৈধ নয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যদি কেউ এমন কাজ করে তবে তার সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِىْ شَىْءٍ

আর যে এমন কাজ করবে আল্লাহ্ পাকের সাথে তার মহব্বতের কোন সম্পর্ক থাকবে না, আর আল্লাহ্ পাকের সাথে মহব্বতের সম্পর্ক যার না থাকবে তার চেয়ে বড় হতভাগা আর কে হতে পারে?

اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰةً

কিন্তু কাফেরদের তরফ থেকে যদি কোন প্রকার অনিষ্টের আশংকা থাকে তবে তাদের সাথে বাহ্যিক বন্ধুত্ব বজায় রাখার অনুমতি রয়েছে এমন অবস্থায় আল্লাহ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২১৪

পাকের মহব্বত থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা থাকবে না। এ পর্যায়ে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন যখন কোন মুসলমান কাফেরদের মাঝে থাকে এবং তার জান মালের ক্ষতির আশংকা করে এমন অবস্থায় তাদের সাথে বন্ধুত্বের ভাব প্রকাশ করে জীবন যাপন করার অনুমতি রয়েছে। তবে শর্ত হলো অন্তর তাদের ভালোবাসা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং পবিত্র থাকতে হবে।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) তফসীরে কবীরে এবং আল্লামা আলুসী (রঃ) তফসীরে রুহুল মা'আনীতে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। হাসান বর্ণনা করেনঃ মোসায়লামাতুল কায্যাব (এ ব্যক্তি মিথ্যা নবুওয়তের দাবী করেছিল) দু'জন সাহাবীকে আটক করেছিল। সে তাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিল তুমি কি সাক্ষ্য দাও হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। পুনরায় মিথ্যুক মোসায়লামাতুল কায্যাব জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কি সাক্ষ্য দাও আমি আল্লাহর রসূল? (নাউজুবিল্লাহ) তিনি বললেনঃ হ্যাঁ (অর্থাৎ প্রাণ রক্ষার প্রয়োজনে তিনি একথাটি উচ্চারণ করলেন, অথচ তাঁর অন্তরে আদৌ একথাটি ছিল না, এটি ছিল নিতান্ত মৌখিক প্রাণ রক্ষার একটি উপায় মাত্র)। যাহোক একথায় নবুওয়্যতের মিথ্যা দাবীদার মোসায়লামা তাঁকে ছেড়ে দিল। এরপর সে দ্বিতীয় সাহাবীকে ডাকলো এবং প্রশ্ন করলোঃ তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। অভিশপ্ত মোসায়লামা পুনরায় প্রশ্ন করলো, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে আমি আল্লাহর রসূল? (নাউজুবিল্লাহ) তিনি বললেনঃ আমি শ্রবণ করি না। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তখন সে তাঁকে শহীদ করলো। এ ঘটনার সংবাদ পৌঁছলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট তখন তিনি বললেনঃ যাকে মোসায়লামা শহীদ করেছে সে আল্লাহর প্রতি একীন এবং সত্যবাদীতার জন্যে জীবন দিয়েছে। অতএব, তাঁর জন্যে রয়েছে খোশ খবরী আর যে প্রাণ রক্ষার প্রয়োজনে অন্য কথা বলেছে আল্লাহ পাক তাঁর প্রাণ রক্ষার এ উপায় অবলম্বনের অনুমতি দিয়েছেন। অতএব, এজন্যে তাঁর শাস্তি হবে না।[২]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) বোখারী শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে আমরা কোন কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গে খুব হাসি মুখে মেলা মেশা করি। কিন্তু আমাদের অন্তর তাদেরকে লা'নত দেয় আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস বলেছেনঃ কাফেরদের প্রতি শুধু মৌখিক ভাল ভাব প্রকাশের অনুমতি রয়েছে কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তাদের থেকে দূরে থাকা কর্তব্য।[৩]

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৮, পৃষ্ঠা- ১৩
২। তফসীরে কবীর খন্ড- ৮, পৃষ্ঠা-১৩
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১২২
৩। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫১

আল্লামা শিব্বীর আহমদ ওসমানী (রঃ) আলোচ্য বিষয়টির ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ কাফেরদের তরফ থেকে গুরুতর ক্ষতির আশংকা দেখা দিলে আত্মরক্ষার নিতান্ত প্রয়োজনে যুক্তি সঙ্গত ভাবে শরীয়ত সমর্থিত ব্যবস্থা স্বরূপ তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে আপত্তি নাই। তিনি বলেছেনঃ এটি মূলতঃ তাদের প্রতি আন্তরিকতা বা বন্ধুত্ব নয়, বরং সদাচরণ তার একটি দৃষ্টান্ত হলো যুদ্ধ ক্ষেত্রে কৌশল হিসেবে পশ্চাদ্ধাবনের অনুমতি রয়েছে।

একথা সকলেরই জানা যে, পশ্চাদ্ধাবন পরাজয় বরণ নয়; বরং জয়লাভের একটি কৌশল মাত্র। ঠিক এমনিভাবে কাফেরদের সঙ্গে বাহ্যিক বন্ধুত্বের কথা প্রকাশ করে আত্মরক্ষা করার একটি কৌশল গ্রহণের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ

যেহেতু ইতোপূর্বেই সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে কাফেরদের সঙ্গে আন্তরিক বন্ধুত্ব স্থাপনের শোচনীয় পরিণাম স্বরূপ আল্লাহ পাকের নৈকট্য থেকে বঞ্চিত হতে হবে। তাই একথার তাগিদ করে পুনরায় এরশাদ হয়েছে যে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তাঁর অসন্তুষ্টির পরিণাম সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করেন। যে কেউ মুসলমানদের দল পরিত্যাগ করে কাফেরদের দলে প্রবেশ করবে তাদের সাথে গোপনে বা প্রকাশ্যে সম্পর্ক গড়ে তুলবে এবং শরীয়তের উপরোল্লিখিত অনুমতির সুযোগের অপব্যবহার করবে তাদের জানা উচিত যে অবশেষে এক দিন আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হতেই হবে এবং জীবনের যাবতীয় কর্মের হিসাব অবশ্যই দিতে হবে। এতদ্ব্যতীত, একথাও সর্বজন বিদিত যে আল্লাহ পাকের নিকট কোন কিছুই গোপন থাকেনা। কে কাফেরদের সঙ্গে সম্পর্ক করে আর কে ঈমান রক্ষার জন্যে সচেষ্ট থাকে আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল তাই এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِىْ صُدُوْرِكُمْ

(হে রসূল!) আপনি জানিয়ে দিন যে যা কিছুই তোমরা তোমাদের অন্তরে গোপন কর অথবা প্রকাশ কর, সবই আল্লাহ পাক জানেন। শুধু তাই নয়; বরং আসমান যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ পাকের নখদর্পণে।

অতএব, কেউ যদি অন্তরের কথা গোপন করে এবং আল্লাহকে ধোকা দিতে পারবে বলে মনে করে তবে তা হবে নিতান্ত বাতুলতা মাত্র। কেননা আল্লাহ পাক সব কিছু জানেন, তাঁর জ্ঞান সর্ব ব্যাপী এবং তাঁর ক্ষমতা সর্বত্র বিরাজমান, তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই। সেদিনকে ভয় কর যেদিন কর্মফল প্রদান করা হবে–

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ

অর্থাৎ সেদিনকে স্মরণ কর যেদিন প্রত্যেকটি মানুষ তার ভাল-মন্দ আমল সচক্ষে দেখতে পাবে, সেদিন পাপীষ্ঠ লোকেরা এ আকাঙ্খা করবে যদি আমাদের নিন্দনীয় কার্যকলাপের বিবরণ আমাদের থেকে দূরে থাকতো, আমরা যদি এর সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতাম"!

আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে কথাটিকে এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُوْلُ الْكَافِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا

"সেদিনকে স্মরণ কর যেদিন প্রত্যেকটি মানুষ তার কৃতকর্ম দেখতে পাবে। আর কাফেররা সেদিন বলবে- হায় আফসোস! আমরা যদি মাটি হয়ে যেতে পারতাম"।

অন্য আয়াতে আরো এরশাদ হয়েছেঃ

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَّائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ

"সেদিনকে স্মরণ কর যেদিন সকল গোপন রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে সেদিন কোন শক্তি থাকবেনা এবং কোন সাহায্যকারীও থাকবেনা"।

এমনিভাবে আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

"আর স্মরণ কর সেদিনকে যেদিন তোমরা আল্লাহ পাকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে তৎপর প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বিনিময় প্রদান করা হবে, আর তারা অত্যাচারিত হবে না"।

কেয়ামতের সেই কঠিন দিনের ব্যাপারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বহু হাদীসে বিশেষভাবে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

হযরত আদী এবনে হাতেম (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের প্রত্যেকেই তার পালনকর্তার সঙ্গে এভাবে কথা বলবে যে তাঁর মধ্যে আর তোমাদের মধ্যে কোন ভাষ্যকার থাকবে না, থাকবেনা কোন আবরণ, সে ব্যক্তি যখন ডান দিকে দেখবে তখন শুধু তার আমল দেখবে যা সে করেছিল, বাম দিকেও সে তার কৃতকর্মই দেখবে, যখন সম্মুখে

দৃষ্টিপাত করবে তখন অগ্নিই দেখবে। অতএব, তোমরা সে অগ্নি থেকে আত্মরক্ষার জন্যে চেষ্টা কর এমনকি, যদি এ উদ্দেশ্যে একটি খেজুরের টুকরা দিতে পার তবে তাও দাও"।

অর্থাৎ সদকা খয়রাতের মাধ্যমে তথা যাবতীয় নেক আমলের মাধ্যমে আখেরাতের চির শান্তি চির-মুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ কর।

وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ

আর আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছেন তাঁর নিজের তরফ থেকে যেন তোমরা পাপাচারে লিপ্ত না হও, কেননা পাপাচারের শাস্তি অবধারিত।

وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ

"আর আল্লাহ্ পাক তাঁর মোমেন বন্দাগণের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান"।

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের পরিণাম উল্লেখিত হয়েছে আর এ আয়াতে মোমেনদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকের দয়া-মায়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক মোমেন বন্দাকে তাঁর নিকট ডেকে গোপনে এরশাদ করবেন, তোমার সেই গুনাহটির কথা কি মনে আছে? বন্দা তখন স্বীকার করবে। আল্লাহ্ পাক যখন তার নিকট থেকে গুনাহ্র কথা স্বীকার করিয়ে নেবেন তখন বন্দা মনে করবে আমার ধ্বংস অনিবার্য। তখন দয়াবান আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেন, আমি দুনিয়াতে তোমার এই পাপের কথাটি গোপন রেখেছিলাম। এরপর তাকে নেক আমল সম্বলিত আমলনামা প্রদান করা হবে। আর কাফের এবং মুনাফেকদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হবে।

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ
يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۱﴾ قُلْ
اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۳۲﴾

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী পৃষ্ঠা-৭০
তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২১৭

তরজমা

(৩১) (হে নবী!) আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহ্ পাককে ভালবাস তাহলে আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ্ সমূহ মাফ করবেন। এবং আল্লাহ্ পাকের অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

(৩২) (হে রসূল!) আপনি বলে দিন, তোমরা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর কিন্তু তবু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে (তাদের জানা উচিত) যে আল্লাহ্ পাক কাফের'দের পছন্দ করেন না।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

এবনে জরীর এবং এবনুল মুনজের হাসান বসরীর (রঃ) বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে কিছু লোক বলেছিল হে (হযরত) মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি যে আমরা আমাদের প্রভুকে ভালবাসি, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। এর মর্ম হচ্ছে যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ভালবাসার দাবি কর তবে আল্লাহর প্রিয় রসূল হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণের কষ্টি পাথরে এ দাবীর যথার্থতার প্রমাণ উপস্থাপন কর। কেননা যে যত বেশী তাঁর অনুসরণ করবে সে তত বেশী আল্লাহ পাকের প্রতি তার প্রেম ভালবাসার প্রমাণ দেবে।

এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে এবনে এসহাক, এবনে জরীর মোহাম্মদ এবনে জাফর এবনে যোবায়েরের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, নাযরানের খৃষ্টান প্রতিনিধি দল যখন বলছিল যে আমরা আল্লাহর প্রতি ভালবাসার কারণেই ঈসা (আঃ)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করি। তখন এ আয়াত নাযিল হয় অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি প্রেম ভালবাসা যদি সত্যিই তোমাদের অন্তরে থাকে তবে তোমরা আল্লাহর প্রিয়নবী এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ কর। এতদ্বারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি তোমাদের ভালবাসা প্রমাণিত হবে। আর এমন অবস্থায় আল্লাহ্ পাকও তোমাদেরকে ভালবাসবেন।

আল্লামা বগবী (রঃ) এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে লিখেছেন যে, এ আয়াত ইহুদী এবং নাসারাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, কেননা তারা বলেছিল আমরা আল্লাহর সন্তান এবং তাঁর প্রিয় (নাউজুবিল্লাহ)। এ আয়াতের মর্ম হলো, আল্লাহর প্রিয় হওয়ার একমাত্র মানদণ্ড হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের

অনুসরণ করা। অতএব, তোমরা তাঁর অনুসরণ করে তোমাদের দাবীর সত্যতা প্রমাণ কর যে তোমরা আল্লাহর প্রিয়।

যাহ্যাক হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে মক্কার পৌত্তলিকরা কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে মূর্তি স্থাপন করেছিল। আর বন্য মুরগীর ডিম তার ভেতর ঝুলন্ত অবস্থায় রেখেছিল এবং সেগুলোর কানে বালি পরিয়ে রেখে সেগুলোকে সেজদা করছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেখানে গমন করলেন, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন এবং বললেন, হে কোরায়েশ! তোমরা তোমাদের পিতামহ ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (রাঃ)-এর তরীকার বিরোধিতা করছো। তখন কোরায়শরা বলেছিল, আমরা তো আল্লাহর মহব্বতে মূর্তি পূজা করি, যাতে করে এতদ্বারা আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

আয়াতের মর্মবাণী

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের মহব্বতের দাবীদার হবে তাকে তার কথায়–কাজে, চিন্তা-চর্চায় এক কথায় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে প্রতি স্তরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হবে। জীবনের কোন কাজই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের পরিপন্থী হতে পারবে না। কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যা আমি আদেশ দেই তা মেনে চল আর যে সম্পর্কে আমি নিষেধ করি তা থেকে বিরত থাক। যারা এভাবে জীবন যাপন করবে তাদের জন্যে এ আয়াতে দুটি খোশ-খবরী রয়েছেঃ

(১) স্বয়ং আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ভালবাসবেন, কেননা তারা আল্লাহর মহব্বত ও ভালবাসার দাবীতে সত্যতার প্রমাণ দিয়েছে তথা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করেছে। দ্বিতীয়তঃ যাকে আল্লাহ পাক ভালবাসেন তাঁর অনুসরণ করে তারা আল্লাহর ভালবাসা লাভে ধন্য হয়েছে।

(২) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণের কারণে আল্লাহ পাক তাদের গুনাহ সমূহ মাফ করবেন।

এ আয়াতের আলোকে বিচার করলে মানুষকে কয়েক প্রকারে ভাগ করা যায়ঃ

(১) যাদের অন্তরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহব্বত নেই এবং তাঁর অনুসরণও তারা করেনা, আল্লাহ পাকের দরবারে তারা অভিশপ্ত।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২১০-১৯
তফসীরে কবীর (খন্ড-৮) পৃষ্ঠা-১৭
তফসীরে রুহুল মাআনী, (খন্ড-৩) পৃষ্ঠা-১৩০

(২) যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহব্বতের দাবী করে অথচ তাঁর অনুসরণ করেনা তারা মহব্বতের সত্যতা প্রমাণ করেনা।

(৩) যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে আন্তরিক মহব্বত রাখে এবং তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণের সর্বাত্মক চেষ্টা করে। যেমন হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রঃ)-কে তাঁর একজন মুরীদ একটি "খরবুজা" (এক প্রকার ফল) হাদীয়া পেশ করলেন কিন্তু তিনি একথা বলে হাদীয়া ফেরত দিলেন যে, আমি জানি না প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ ফলটি খেয়েছেন কি-না, আর খেয়ে থাকলে কিভাবে খেয়েছিলেন? যেহেতু এ হাদীয়া গ্রহণ করলে এবং খেতে ইচ্ছুক হলে এর মাধ্যমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সুন্নতের উপর আমল করতে পারব না তাই এ হাদীয়া আমি কবুল করব না। কবি বলেছেনঃ

کامل بسطامی در تقلید کرد
اجتناب ازخور دن خربوزه کرد

"বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণের পূর্ণ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন, কেননা তিনি সুন্নতে রসূলের অনুসরণ ব্যতীত কোন কাজই করতেন না, এজন্যে তিনি খরবুজার হাদীয়া গ্রহণে বিরত রয়েছেন"।

মূলতঃ এটিই প্রকৃত মোমেনের বৈশিষ্ট্য। একজন মরমী কবি একথাটিকে এভাবে বলেছেনঃ

بمصطفی برسان خوایش راکه دین همین اوست اگر باونرسیدی تمام بولهبی است

"তুমি নিজেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের আলোকে গড়ে তোল, কেননা এটিই হলো সঠিক দ্বীন ইসলাম যদি তুমি তা করতে না পার তবে তোমার যাবতীয় কাযক্রমে আবু লাহাবের অনুসরণ হয় বলে বিবেচিত হবে"।

আলোচ্য আয়াতে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা হলো قل (অর্থাৎ হে রসূল! আপনি বলুন) এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উছিলা ব্যতীত আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে কারো কোন কথা গ্রহণযাগ্য হয়না, কেউ তাঁর খেতাবের উপযুক্ত হয় না এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ ব্যতীত আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কারো কোন আমল গ্রহণযোগ্য হয়না। এ আয়াতে যেন একথা বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর মহব্বতের দাবী করে (হে রসূল!) আপনি তাকে পরীক্ষা করে

নিন, যদি তার কার্যক্রম আপনার আদর্শ মোতাবেক হয় তাহলেই সে আল্লাহর মহব্বত লাভ করবে এবং মাগফেরাত হাসিল করবে।

এখানে উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে সর্বপ্রথম এরশাদ হয়েছে ঃ "তোমরা যদি আল্লাহ পাকের সাথে মহব্বত রাখ"-এর তাৎপর্য হলো যদি কারো অন্তরে আল্লাহর মহব্বত সৃষ্টি হয় তবে সে সর্বদা আল্লাহর জিকরে মশগুল থাকবে শুধু তাই নয়, বরং তার অন্তর থেকে আল্লাহ পাক ব্যতীত আর সব কিছু বিদায় গ্রহণ করবে। পৃথিবীতে যা কিছু দেখবে সব কিছুর মধ্যেই সে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত দেখতে পাবে এবং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকবে। আল্লাহ ব্যতীত আর সব কিছু তার নিকট তুচ্ছ মনে হবে। আল্লাহ পাক যা কিছু অপছন্দ করেন সে সব কিছু তার কাছে অপছন্দ হবে। শুধু তাই নয়; বরং সে আল্লাহ পাকের বন্দেগীর মধ্যে তার মনের শান্তি লাভ করবে। যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের সবচেয়ে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ পাকের সবচেয়ে প্রিয় রসূল, তাই পৃথিবীতে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি হবেন তার নিকট প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণকে তার প্রিয় কাজ মনে হবে, তাঁর মহব্বত জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে বিবেচনা করবে এবং তাঁর অনুকরণকে একমাত্র কর্মপন্থা হিসেবে গ্রহণ করবে, জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণের মধ্যেই সাফল্য দেখতে পাবে। মুসলিম শরীফে সংকলিত, হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলো এবং জিজ্ঞাসা করলো কেয়ামত কবে আসবে? তিনি এরশাদ করলেন, তুমি কেয়ামতের জন্যে কি সঞ্চয় করেছ? সে আরয করলো আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহব্বত। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ

فَاِنَّكَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ

তাহলে যাঁর সঙ্গে দুনিয়াতে তোমার মহব্বত রয়েছে হাশরের দিন তুমি তাঁর সঙ্গেই থাকবে। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে ইসলাম গ্রহণ করার পর আমি এত খুশী আর কোন দিন হইনি যত খুশি সেদিন এ খোশখবরী লাভের পর হয়েছি। আমি আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূলকে ভালবাসি, আমি মহব্বত রাখি হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত ওমরের (রাঃ) সঙ্গে যেন তাদের সঙ্গে আমার হাশর হয়। যদিও আমার আমল তাঁদের ন্যায় নয়। আর এর চেয়ে বড় খোশখবরী আর কি হতে পারে যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের মহব্বত লাভে ধন্য হওয়া যাবে।

মুসলিম শরীফে সংকলিত, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক যখন কোন বন্দাকে পছন্দ করেন তখন তিনি জিব্রাঈল (আঃ)-কে ডেকে বলেন আমি অমুক বন্দাকে পছন্দ করি তুমিও তাকে পছন্দ কর। অতঃপর হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এ ঘোষণা করেনঃ অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন অতএব, তোমরা তাকে পছন্দ কর। তখন আসমানবাসী তার সঙ্গে মহব্বত করে এবং জমিনবাসীও তাকে ভালবাসে।[১] আর এ সাফল্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণের বরকতেই অর্জিত হয়।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) সহ অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম থেকে একখানি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যার অর্থ হলো আল্লাহ পাকের একশটি রহমত রয়েছে তন্মধ্যে একটি রহমত সমগ্র সৃষ্টি জগতে বিতরণ করেছেন যে কারণে সৃষ্টির মধ্যে পরস্পরই একে অন্যকে ভালবাসে। আর ৯৯টি রহমত আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় বন্দাদের জন্যে সংরক্ষণ করেছেন যা কেয়ামতের দিন প্রকাশিত হবে।

আল্লাহর মহব্বতের তাৎপর্য

আল্লামা বগবী লিখেছেনঃ আল্লাহর সাথে বন্দার মহব্বতের তাৎপর্য হলো আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা এবং তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করা। আর বন্দার সাথে আল্লাহর মহব্বতের তাৎপর্য হলো আল্লাহ পাক বন্দার প্রতি খুশি হয়ে তার প্রশংসা করা, তাকে সওয়াব দান করা এবং তাকে ক্ষমা করা। যদি কোন বন্দা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করে তবে আল্লাহ পাকের মহব্বত লাভে সে ধন্য হয় এবং আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করেন।

ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেনঃ বন্দার প্রতি আল্লাহর মহব্বতের তাৎপর্য হলো বন্দাকে আল্লাহর তরফ থেকে সওয়াব দান করা। আর তাকে মাগফেরাত দান করার তাৎপর্য হলো তাকে আযাব থেকে নাজাত দেয়া।[২]

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ

আলোচ্য আয়াত যখন নাযিল হয় তখন মদীনা শরীফের মুনাফেক সরদার আবদুল্লাহ এবনে উবাই বললো- মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) নিজের প্রতি আনুগত্যেকে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের সমান বলে ঘোষণা করেছেন। তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করেছেনঃ

১। খোলাসাতুত তাফাসীর খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৪৪
২। তফসীরে কবীর খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৮

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ

এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছেঃ (হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর। আর আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি আনুগত্য একই কথা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমেই আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশিত হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার উম্মতের সকলেই জান্নাতে যাবে তবে যে অস্বীকার করবে, সে জান্নাতে যেতে পারবে না। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে কে অস্বীকার করতে পারে? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ যে আমার কথা মেনে চলবে তথা আমার অনুসরণ করবে, সে বেহেশতে যাবে। আর যে আমার কথা মানবে না সে-ই অস্বীকার করবে তথা বেহেশতে যাবে না।

এই হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, জান্নাতে প্রবেশের জন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ পূর্বশর্ত। অন্য একখানি হাদীসে রয়েছেঃ যে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে তাঁর অনুসরণ করেছে সে মূলত আল্লাহ পাকেরই প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে। পক্ষান্তরে যে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নাফরমানী করেছে সে আল্লাহ পাকেরই অবাধ্য হয়েছে। (বোখারী শরীফ)

فَاِنْ تَوَلَّوْا

অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অস্বীকৃতি জানাও তবে জেনে রেখো, আল্লাহ পাক কাফেরদেরকে আদৌ পছন্দ করেন না। অতএব, তোমরা যারা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা কর তিনি তোমাদেরকেও পছন্দ করেন না।

إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى
الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٣﴾ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْۢ بَعْضٍ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٤﴾
اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِىْ بَطْنِىْ
مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا
قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ وَضَعْتُهَآ اُنْثٰى ۗ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ۗ وَ
لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ۚ وَاِنِّىْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّىْٓ اُعِيْذُهَا
بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿٣٦﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ
حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۚ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا
زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ۗ
قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾

তরজমা

(৩৩) নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক আদম (আঃ) এবং নূহ (আঃ) এবং ইব্রাহীমের (আঃ) সন্তানগণ এবং এমরানের সন্তানগণকে সমগ্র বিশ্ব জগতের মধ্যে মনোনীত করেছেন।

(৩৪) তারা একে অন্যের সন্তান-সন্ততি আর আল্লাহ্ পাক সব কিছু শোনেন, সব কিছু জানেন।

(৩৫) স্মরণ কর সে সময়কে যখন এমরানের স্ত্রী বললঃ হে আমার পালনকর্তা! আমার গর্ভে যা কিছু রয়েছে তা শুধু তোমার জন্যে মানত করলাম। তুমি আমার নিকট থেকে তা কবুল কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

(৩৬) অতঃপর যখন সে তাকে প্রসব করল, সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! নিশ্চয় আমি কন্যা প্রসব করেছি। অথচ আল্লাহ্ পাক খুব ভালভাবেই জানেন যা সে প্রসব করেছে। আর পুত্র তো কন্যার ন্যায় নয়। নিশ্চয় আমি তার নাম রেখেছি মরয়ম এবং নিশ্চয় আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে অভিশপ্ত শয়তানের হাত থেকে তোমার আশ্রয় দিতেছি।

(৩৭) অতঃপর তাঁর পালনকর্তা সেই কন্যাকে উত্তমরূপে বর্ধিত করলেন এবং জাকারিয়াকে (আঃ) তাঁর দায়িত্ব অর্পণ করলেন। যখনই জাকারিয়া (আঃ) তাঁর কক্ষে প্রবেশ করতেন তখনই তাঁর নিকট খাদ্য সম্ভার প্রস্তুত দেখতে পেতেন, জাকারিয়া (আঃ) তাঁকে সম্বোধন করে বলতেন, "হে মরয়ম! এসব কোথা থেকে পেলে"? তখন সে জবাব দিয়েছিল- "এসব কিছু আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে"। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে অগণিত রিয্ক দান করে থাকেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে আল্লাহর মহব্বত পরিপূর্ণ হয় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণের মাধ্যমে। এ পর্যায়ে অন্যান্য নারীদের উচ্চ মর্যাদার কথা আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। তফসীরকারগণ একথাও বলেছেন ইহুদী খৃষ্টানরা একথা বলে বেড়াতো যে আমরা আল্লাহর পুত্র (নাউজুবিল্লাহ্ মিন যালিক) এবং বন্ধু, তারই প্রতিবাদে আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হচ্ছে, যারা কাফের যারা অবাধ্য তারা কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্ পাকের বন্ধু হতে পারে না। আল্লাহ্ পাক মানব সমাজের মধ্যে যাদেরকে বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন তারা হলেন যেমন আদম (আঃ), নূহ (আঃ), ইব্রাহীম (আঃ) এবং আল এমরান। তোমরা যদি সত্যিই আল্লাহ্ পাকের প্রিয় হতে চাও তবে আল্লাহ্ পাকের হুকুম মেনে চল। আল্লাহ্ পাকের নবীদের অনুগামী হও এবং আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ কর। নাযরান থেকে আগত খৃষ্টান প্রতিনিধিদের এ বক্তব্য যে, "আমরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর তা'যীম, সম্মান এবং উপাসনা আল্লাহর এবাদত ও তা'যীমের উদ্দেশ্যেই করে থাকি, একথার জবাবেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।

কোন কোন তফসীরকার এ আয়াত সম্পর্কে একথাও বলেছেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতে যারা সন্দেহ করে স্বাভাবিক ভাবেই তারা তাঁর অনুসরণ করেনা তথা তাঁর অনুগত হয় না এজন্যে আলোচ্য আয়াতে পূর্বকালের কয়েকজন নবীর উল্লেখ করা হয়েছে হযরত আদম (আঃ), নূহ (আঃ), আল ইব্রাহীম (আঃ) আল এমরান প্রমুখ যাঁদেরকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধীরাও মানত। এরপর অত্যন্ত বিস্তারিত ভাবে হযরহ ঈসা (আঃ)-এর কথা কয়েকটি আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ইহুদীরা যখন বলেছিল আমরা হযরত ইব্রাহীম (আঃ), এসহাক (আঃ) এবং ইয়াকুব (আঃ)-এর বংশধর এবং আমরা তাঁদেরই ধর্মে বিশ্বাসী, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যেহেতু খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি

করে এমনকি, তাঁকে আল্লাহর পুত্র পর্যন্ত বলে (নাউজুবিল্লাহ)। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

আম্বিয়ায়ে কেরাম আল্লাহ্ পাকের পছন্দনীয় এবং মনোনীত বন্দা

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন যে তিনি সমগ্র বিশ্ব মানব থেকে আদম (আঃ), নূহ (আঃ), আল ইব্রাহীম এবং আল এমরানকে নবুওয়্যতের জন্যে মনোনীত করেছেন। হযরত আদম (আঃ)-কে স্বহস্তে তৈরী করেছেন। বিশ্ব সৃষ্টির সব কিছুর নাম পরিচয় তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন এবং জান্নাতে বসবাসের অনুমতি দিয়েছেন। এরপর তাঁকে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

যখন বিশ্ববাসী আল্লাহর অবাধ্য হয় তখন তাদের হেদায়েতের জন্যে নূহ (আঃ)-কে আল্লাহর রসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর তবলীগ করার পরও যখন তাঁর সম্প্রদায় আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অস্বীকৃতি জানায় তখন আল্লাহ্ পাক বন্যার আযাব দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করেন। যারা হযরত নূহ (আঃ)-এর তরীতে আরোহণ করে তারা ঐ ধ্বংসাত্মক বন্যার আযাব থেকে রক্ষা পায়।

এমনিভাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কেও আল্লাহ্ পাক মনোনীত করেন, তাঁর বংশে জন্ম গ্রহণ করেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

আলে এমরান

এমরান নামের দু' ব্যক্তিত্ব ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করেছে। হযরত মূসা (আঃ)-এর পিতার নাম ছিল এমরান আর হযরত মরয়ম (আঃ)-এর পিতার নাম ছিল এমরান অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ)-এর নানা।

বিখ্যাত তাবেয়ী হাসান এবং ওয়াহাব (রহঃ)-এর মতে আলোচ্য আয়াতে আলে এমরান শব্দ দ্বারা ঈসা (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আনুগত্যকে অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছেন এবং তাঁর আনুগত্যকে আল্লাহর মহব্বত লাভের কারণ বলে ঘোষণা করেছেন আর এ আয়াতে আম্বিয়ায়ে কেরামের ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে যাতে মানুষ তাঁদের অনুকরণ করতে অনুপ্রাণিত হয়। এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম হযরত আদম (আঃ)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা আল্লাহ্ পাক তাঁকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন, ফেরেশতাদেরকে হুকুম দিয়েছেন

১। তফসীরে রুহুল মা'আনী, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা- ১৩০
তফসীরে মাজহারা, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২২৪

তাঁকে সম্মান সূচক সেজদা দিতে এবং তাঁর দুশমন ইবলিসের প্রতি আল্লাহ পাক লা'নত দিয়েছেন। এরপর হযরত নূহ (আঃ)-এর উল্লেখ করেছেন, কেননা আল্লাহ পাক তাঁকেও বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং তাঁর বদদোয়ার কারণে তদানীন্তন পৃথিবীর সমস্ত কাফেরকে আল্লাহ পাক ধ্বংস করেছিলেন। এরপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর উল্লেখ রয়েছে, কেননা সারা পৃথিবীর মানুষ যখন কাফের ছিল তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে আল্লাহ্ পাক নবী হিসেবে মনোনীত করেছিলেন এবং এরপর আলে এমরান তথা হযরত ঈসা (আঃ)-এর উল্লেখ রয়েছে।

উপরোক্ত আম্বিয়ায়ে কেরামকে যেভাবে আল্লাহ্ পাক সম্মানিত করেছেন এবং তাঁদের দুশমনকে অপমানিত ও ধ্বংস করেছেন ঠিক তেমনি যারা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করে তাদের পরিণামও অনুরূপভাবে শোচনীয় হবে।

اِذْ قَالَتِ امْرَاَةُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِىْ بَطْنِىْ

তফসীরকারগণ লিখেছেন এমরানের স্ত্রী হান্না বিনতে ফাখোসের কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না। একদিন তিনি একটি পাখীকে দেখলেন সে তার বাচ্চাদের মুখে আহার পৌঁছাচ্ছে। তখন তাঁর অন্তরে সন্তানের জন্যে আক্ষেপ হলো। তাই তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে দু' হাত তুলে মুনাজাত করলেন। যখন তাঁর অন্তরে এ বিশ্বাস এবং আস্থা সুদৃঢ় হলো যে আল্লাহ্ পাক তাঁর দোয়া কবুল করেছেন তখন তিনি এই মানত করলেন যে আল্লাহ পাক আমাকে যে সন্তান দান করেছেন আমি তাকে বায়তুল মোকাদ্দাসের খেদমতের জন্যে আজাদ করবো। এরপর তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে মুনাজাত করলেন ঃ হে আল্লাহ! আমার আন্তরিক নজরানা কবুল কর। তুমি আমার কথা শ্রবণকারী এবং আমার নিয়ত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

এমরান তাঁর স্ত্রীর দোয়া শ্রবণ করে বললঃ তুমি যা বলেছ তার কি অবস্থা হবে, যদি তোমার ঘরে কোন কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করে? তখন তারা উভয়ে চিন্তিত হলো। এর কিছুদিন পরই অর্থাৎ মরয়মের জন্ম গ্রহণের পূর্বেই এমরানের এন্তেকাল হলো এবং হান্না বিধবা হলেন।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন হযরত হাসান বসরী (রাঃ) বলেছেন যে হান্না তাঁর ভবিষ্যত সন্তান সম্পর্কে আল্লাহ পাকের দরবারে নজরানা পেশ করার যে ফরিয়াদ

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-২৫
তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২২৫
তফসীরে এবনে কাসীর খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৩-৫৪
তফসীরে রুহুল মা'আনী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-২৫

করেছেন তা আল্লাহ পাকের দরবারে থেকে এলহামের মাধ্যমে ইঙ্গিত পেয়েই করেছেন। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বপ্নে তাঁর প্রাণাধিক পুত্র ইসমাঈলকে জবেহ্ করতে দেখে উপলব্ধি করেছেন যে এটি আল্লাহ পাকেরই নির্দেশ। আর এজন্যেই তিনি সে নির্দেশ পালনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এমনিভাবে হযরত মূসা (আঃ)-এর মাতা আল্লাহ্ পাকের দরবার থেকে এলহামের মাধ্যমে ইঙ্গিত পেয়েই মূসা (আঃ)-কে নীল নদে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন আর ঠিক এভাবেই মরয়ম মাতা হান্না আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে এলহামের মাধ্যমে ইঙ্গিত পেয়েই জন্মের পূর্বে মরয়মকে বায়তুল মোকাদ্দাসের খেমতে নিয়োজিত করার জন্যে মানত করেছিলেন।[১]

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى

অর্থাৎ যখন মরয়ম ভূমিষ্ঠ হলেন অথচ তার মাতা অত্যন্ত আক্ষেপ করে আল্লাহ পাকের দরবারে ফরিয়াদ করলেন, হে আল্লাহ! এ-তো কন্যা জন্ম গ্রহণ করলো আর আল্লাহ পাক খুব্ ভাল ভাবেই জানেন যে তার ঘরে কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়েছে। আর কন্যা কিভাবে বায়তুল মোকাদ্দাসের খেদমত করবে? কেননা

لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى

পুত্র কন্যার ন্যায় নয়। মূলতঃ ছেলেদেরকেই বায়তুল মোকাদ্দাসের খেদমতে ওয়াকফ করা হতো মেয়েদেরকে নয়।

দ্বিতীয়তঃ পুরুষ সর্বদা আল্লাহর এবাদত করতে পারে কিন্তু মেয়েরা তাদের শারীরিক অসুবিধার কারণে তা পারেনা।

তৃতীয়ত ঃ পুরুষ তাদের প্রকৃতিগত শক্তির কারণে যে সেবা করতে পারে, মেয়েরা তাদের সৃষ্টিগত দুর্বলতার কারণে তা পারে না। এতদ্ব্যতীত, পুরুষরা অন্য লোকদের সাথে মিলে মিশে যে কাজ করতে পারে মেয়েদের পক্ষে তা সম্ভব হয় না, তাই মরয়ম মাতা আক্ষেপ করে উপরোক্ত মন্তব্য করেন।[২]

وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ

"আর আমি তার নামকরণ করলাম মরয়ম"। এর অর্থ আবেদা। আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন এতে একথা প্রমাণিত হয় যে যেদিন শিশু জন্ম গ্রহণ করে সেদিনই তার নাম রাখা যায় যেমন হযরত রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহে

১। তফসীরে কবীর খন্ড- ৮, পৃষ্ঠা- ২৫
২। তফসীরে কবীর খন্ড- ৮, পৃষ্ঠা- ২৭
তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা- ২৮৭

ওয়াসাল্লাম তাঁর পুত্র ইব্রাহীমের ব্যাপারেও তাই করেছিলেন। অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে এক ব্যক্তি এসে আরয করলো ইয়া রসূলাল্লাহ! রাতে আমার ঘরে একটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে, কি নাম রাখবো? তিনি এরশাদ করলেনঃ আবদুর রহমান রাখ।[১]

এরপর মরয়ম মাতা বললেন, নিশ্চয় আমি মরয়ম এবং তার বংশধরকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করি।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন শিশু ভূমিষ্ঠ হয় তখন শয়তান তাকে স্পর্শ করে সেজন্যে শিশু মাত্রই চিৎকার করে কিন্তু মরয়ম এবং তাঁর সন্তানকে (ঈসা (আঃ) হান্নার এ দোয়ার কারণে শয়তানের স্পর্শ থেকে আল্লাহ পাক হেফাজত করেছেন।

হাদীস শরীফে রয়েছে যখন হযরত আলী (রাঃ)-এর সঙ্গে হযরত ফাতেমার বিবাহ সুসম্পন্ন হয় তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ দোয়া করেছিলেনঃ

হে আল্লাহ! আমি তাকে এবং তার সন্তান-সন্ততিকে অভিশপ্ত শয়তানের স্পর্শ থেকে তোমার আশ্রয় দিতেছি আর এই একই দোয়া তিনি হযরত আলীর (রাঃ)-এর জন্যে করেছিলেন। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দোয়ার বরকতে আল্লাহ পাক হযরত ফাতেমার (রাঃ) সন্তানদেরকে শয়তানের স্পর্শ থেকে রক্ষা করেছেন।[২]

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ

অতঃপর আল্লাহ পাক হযরত মরয়মকে উত্তম রূপে কবুল করেছেন। তিনি মেয়ে হয়েও ছেলেদের অপেক্ষা অধিক মর্যাদা পেয়েছেন। বায়তুল মোকাদ্দাসের খাদেমদের মধ্যে তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব ভার গ্রহণের জন্যে অতি উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

وَّاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا

আর তিনি (অসাধারণ ভাবে) বর্ধিত হতে থাকেন। সাধারণত শিশুরা এক বছরে যতদূর বর্ধিত হয় তিনি একদিনে ততখানি বর্ধিত হতেন। এটি ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য।[৩]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা- ৫৪
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-,২ পৃষ্ঠা- ২৮৭-৮৮
৩। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা- ২২৮

এবনে জরীর, একরামা, কাতাদা প্রমুখ তফসীরকারগণ লিখেছেনঃ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মাতা হান্না বস্ত্রাবৃত করে মরয়মকে বায়তুল মোকাদ্দাসে নিয়ে আসেন। বায়তুল মোকাদ্দাসের সেবায়েতদের মধ্যে তাঁর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব লাভের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। তখন হযরত জাকারিয়া (আঃ) বলেন, আমি তার লালন পালনের অধিকতর হক্বদার, কেননা আমার স্ত্রী আসিয়া বিনতে ফাকুদা তার আপন খালা। কিন্তু বায়তুল মোকাদ্দাসের অন্য খাদেমগণ তাতে রাজী না হওয়ায় অবশেষে কোরআ' বা টসের ব্যবস্থা করা হয়। যেহেতু তারা তৌরাত লিপিবদ্ধ করতেন প্রত্যেকের হাতেই ছিল কলম। সিদ্ধান্ত হলো প্রত্যেকেই তার কলম নদীতে ফেলবে যার কলম ভেসে উঠবে সে-ই পাবে মরয়মের লালন পালনের দায়িত্ব। বায়তুল মোকাদ্দাসের খাদেমের সংখ্যা ছিল তখন ২৭। তারা সকলেই স্বীয় কলম নদীতে নিক্ষেপ করলেন। সকলের কলম ডুবে গেল শুধু হযরত জাকারিয়া (আঃ)-এর কলম পানির উপর দণ্ডায়মান রইল। তখন সর্ব সম্মতিক্রমে তিনি মরয়মের লালন-পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন।[১]

তাই এরশাদ হয়েছে-

وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا

আর আল্লাহ পাক জাকারিয়াকে মরয়মের অভিভাবকত্বের দায়িত্বভার অর্পণ করলেন। হযরত জাকারিয়া (আঃ) মরয়মের জন্যে একটি কক্ষ নির্মাণ করলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে তাঁর দেখা-শুনার দায়িত্ব অর্পণ করলেন এবং তাঁর দুগ্ধ পানের জন্যে একজন স্ত্রীলোক নিয়োগ করলেন। যখন তিনি সাবালিকা হলেন তখন তিনি মসজিদ সংলগ্ন একটি ঘর তাঁর জন্যে তৈরী করলেন। হযরত মরয়ম সারাদিন তাতে এবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন। রাত্রিকালে খালার নিকট গমন করতেন। হযরত মরয়মের কক্ষে শুধু হযরত জাকারিয়াই (আঃ) গমন করতেন।

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ

যখনই জাকারিয়া (আঃ) তাঁর ঘরে গমন করতেন তখন

وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا

তাঁর নিকট অসময়ের ফল দেখতে পেতেন অর্থাৎ শীত কালে গরম কালের ফল, আর গরম কালে শীত কালের ফল। তখন জাকারিয়া (আঃ) আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করতেন ঃ

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-২৮
তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা- ২২১

يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ

অর্থাৎ হে মরয়ম! এই ফল কোথা থেকে তুমি পাও? মরয়ম বলতেনঃ আল্লাহ পাকের তরফ থেকে।

এবনে জরীর হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে মরয়মের নিকট জান্নাত থেকে রিয্ক আসত। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেনঃ মরয়মের নিকট জান্নাত থেকে রিয্ক আসত। তিনিও হযরত ঈসা (আঃ)-এর ন্যায় অতি শৈশবে কথা বলেছিলেন।

اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

নিশ্চয় আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে অগণিত রিয্ক দান করেন। এত রিয্ক দান করেন যা কল্পনাতীত। অথবা এর অর্থ অকল্পনীয় স্থান থেকেও আল্লাহ্ পাক রিয্ক দান করেন। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন কোন তফসীরকার হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একবার কয়েকদিন যাবত অভুক্ত ছিলেন। ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাঁর কোন স্ত্রীর ঘরে কোন প্রকার খাবার ছিল না। তিনি হযরত ফাতেমার নিকট আসলেন। তাঁর কাছেও কিছু ছিল না। তিনি তখন বের হয়ে পড়লেন, এমন সময় হযরত ফাতেমার বাঁদী তাঁর নিকট দুটি রুটি এবং এক টুকরো গোশ্‌ত প্রেরণ করলেন। তিনি তা সঙ্গে সঙ্গে ঘরে রেখে দিলেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে খবর দিলেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন।

হযরত ফাতেমা (রাঃ) পাত্রটি খুলে দেখলেন পাত্রটি খাবারে পরিপূর্ণ হয়ে আছে! তখন তিনি উপলব্ধি করলেন যে আল্লাহ্ পাক খাবারে বরকত দান করেছেন! তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ এ খাবার তোমার জন্যে কোথা থেকে এসেছে? তিনি বললেন আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্যে যিনি তোমাকে বণী ইসরাঈলের নারী সমাজের সরদার মরয়মের মত করেছেন। এরপর তিনি হযরত আলী (রাঃ) এবং হাসান (রাঃ), হযরত হোসাইন (রাঃ) সহ সকলকে একত্রিত হয়ে আহার গ্রহণের আদেশ দেন। সকলে খেয়ে তৃপ্তি লাভ করেন। তবু খাবার অবশিষ্ট থাকে। তখন হযরত ফাতেমা (রাঃ) প্রতিবেশীদের মধ্যে সে খাবার বিতরণ করেন।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা- ২৩০-৩১
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা- ৫৫

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে আল্লাহ্ পাক অচিন্তনীয় স্থান থেকে মানুষকে রিয্ক প্রদান করে থাকেন।

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً
طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ﴿٣٨﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ
يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا ۢ بِكَلِمَةٍ
مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٣٩﴾ قَالَ رَبِّ
اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ؕ قَالَ
كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿٤٠﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْۤ اٰيَةً ؕ قَالَ
اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ؕ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ
كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ﴿٤١﴾

তরজমা

(৩৮) সেখানেই জাকারিয়া তাঁর পালনকর্তার দরবারে দোয়া করে বলেছিলেনঃ হে আমার পালনকর্তা! আমাকে তোমার নিকট থেকে পবিত্র সন্তান দান কর। নিশ্চয় তুমি দোয়া শ্রবণকারী।

(৩৯) অতঃপর যখন তিনি মেহরাবে দণ্ডায়মান হয়ে নামাজ আদায় করছিলেন তখন ফেরেশতাগণ তাঁকে সম্বোধন করে বললো, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তোমার (পুত্র সন্তান) ইয়াহয়া সম্বন্ধে সুখবর দান করছেন, সে একটি কথার সত্যতা প্রকাশক, নেতা, চরিত্রবান, নারী-বিরাগী, নবী এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(৪০) জাকারিয়া বললোঃ হে আমার পালনকর্তা! আমার পুত্র হবে কিভাবে? কারণ আমি বয়োবৃদ্ধ হয়ে পড়েছি এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ এভাবেই আল্লাহ্ পাক যা ইচ্ছা তা করেন।

(৪১) তখন সে বলেছিলঃ আমার জন্যে কোন নিদর্শন নির্ধারিত কর। তিনি এরশাদ করলেনঃ তোমার নিদর্শন এই যে তুমি একাধারে তিনদিন ইশারা ভিন্ন কোন কথা বলতে পারবে না এবং স্বীয় প্রতিপালককে স্মরণ কর অধিক পরিমাণে সন্ধ্যায় ও সকালে আল্লাহ্ পাকের তসবীহ্ পাঠ কর।

তফসীরুল কোরআন

হযরত জাকারিয়া (আঃ) যখন দেখলেন মরয়মের নিকট আল্লাহ পাকের করুণা–বৃষ্টির ফলশ্রুতি স্বরূপ শীলকালীন ফল-গ্রীষ্মকালে এবং গ্রীষ্মকালীন ফল শীতকালে পরিবশেন করা হয় তখন তাঁর মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে একটি আকাঙ্খা সৃষ্টি হলো যে, যেভাবে আল্লাহ পাক অকালে রকমারী ফল দান করেছেন সেভাবে আমাকে আমার এ বৃদ্ধ বয়সেও সন্তান দান করতে পারেন। যদিও আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, তাঁর ব্যাপারে সন্তান-সম্ভাবনা কল্পনাতীত কিন্তু আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কোন কিছুই যে অসম্ভব নয়। তাই হযরত জাকারিয়া (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে একটি সুসন্তানের আরযী পেশ করলেন এবং অত্যন্ত গোপনে এ আরযী পেশ করলেন এবং বললেনঃ হে আল্লাহ! আমাকে তোমার তরফ থেকে সুসন্তান দান কর। আল্লাহ পাক হযরত জাকারিয়া (আঃ)-এর দোয়া কবুল করলেন এবং ফেরেশতাগণ তাঁকে সম্বোধন করে এ সুসংবাদ দিলেন যে আপনার একটি পুত্র সন্তান হবে, আপনি তার নাম রাখবেন ইয়াহয়া।

তফসীরকারগণ এ নামকরণের কারণ বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে যে, যেহেতু তাঁর মাতা বন্ধ্যা ছিলেন, আল্লাহ পাক তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর মাতার বন্ধ্যাত্ব দূর করে দিয়েছেন দান করেছেন তাঁকে জীবন-প্রবাহ তাই তাঁর নাম রাখা হয়েছে ইয়াহয়া। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) একথাই বলেছেন। কাতাদা (রঃ) এ নামকরণের কারণ বলেছেন আল্লাহ পাক তাঁর অন্তরে ঈমান ও আনুগত্য এভাবে দান করেছেন যেন তিনি তা দ্বারা জীবন্ত হয়ে উঠেছেন। কেননা ইয়াহয়া (আঃ) কোনদিন কোন পাপ করেননি, এমনকি কোনদিন পাপ কার্যের ইচ্ছাও তিনি করেননি।[১]

এ প্রসঙ্গে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর এবনে আসের বর্ণিত হাদীসে তিনি এরশাদ করেছেনঃ সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে শুধু হযরত ইয়াহয়া (আঃ)-ই নিঃপ্পাপ অবস্থায় আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হবেন।

مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ

হযরত ইয়াহয়া (আঃ) হযরত ঈসা (আঃ)-এর সত্যতা বর্ণনাকারী ছিলেন। হযরত ঈসা (আঃ)-কে কলেমাতুল্লাহ বলা হয়। কেননা তিনি শুধু আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমে চিরাচরিত নিয়মের বরখেলাফ পিতার মাধ্যম ব্যতীতই জন্ম গ্রহণ করেছেন।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৩২

কোন কোন তফসীরকার হযরত ঈসা (আঃ)-কে কলেমাতুল্লাহ বলার আরেকটি কারণ বলেছেন যেভাবে আল্লাহর কালাম দ্বারা মানুষের হেদায়েত হয় ঠিক এমনিভাবে হযরত ঈসা (আঃ)-এর দ্বারাও মানুষের হেদায়েত হতো। তাই তাঁকে কলেমাতুল্লাহ বলা হয়েছে। হযরত ইয়াহয়া (আঃ)-এর বয়স হযরত ঈসা (আঃ) থেকে দু' মাস বেশী ছিল। তাঁরা উভয়ে খালাত ভাই ছিলেন।

وَسَيِّدًا

অর্থাৎ হযরত ইয়াহয়া (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের নেতা হবেন। এলম, আমল, এবাদত বন্দেগী, পরহেযগারী এক কথায় চরিত্র-মাধুর্যে তিনি সকলের মধ্যে শীর্ষ স্থানীয় হবেন।

মুজাহেদ (রঃ) এ বাক্যটির ব্যাখ্যা করেছেন তিনি হবেন আল্লাহ পাকের নিকট সম্মানিত। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন তিনি এত ধৈর্যশীল হবেন যে কোন কারণেই তাঁর ক্রোধ আসবে না। সুফিয়ান বলেছেন এ শব্দটির অর্থ হলো তিনি হিংসা-প্রবণ হবেন না। কারো কারো মতে এর অর্থ হলো তিনি অল্পে তুষ্ট হবেন এবং দানশীল হবেন। হযরত জুনায়েদ বোগদাদী (রঃ) বলেছেন এ শব্দটির তাৎপর্য হলো, যে ব্যক্তি দুনিয়া আখেরাত দু' জাহানকে পরিত্যাগ করে বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয় তাকেই "সৈয়দ" বলা যাবে।

وَحَصُورًا

অর্থাৎ তিনি ইন্দ্রিয় ভোগ থেকে সংযত স্বভাবের অধিকারী। আল্লাহর এবাদত বন্দেগীতে সর্বক্ষণ-মুগ্ধ মাতোয়ারা থাকার কারণে নারী সান্নিধ্যের কোন সম্ভাবনাই ছিল না তাঁর জীবনে, এটি তাঁর বৈশিষ্ট্য অন্যদের জন্যে তা আদর্শ নয়।

প্রিয়নবী (সঃ) সমগ্র মানব জাতির জন্যে একমাত্র আদর্শ

সমগ্র মানব জাতির জন্যে আদর্শ হলেন একমাত্র প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তিনি নির্লিপ্ত জীবনের শিক্ষা দেননি; বরং এবাদত বন্দেগীর মধ্যে মশগুল থাকার পাশাপাশি জীবন যাপনের যাবতীয় দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালনের নির্দেশ দিয়েছেন আমাদের নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

আবদুর রাজ্জাক তাঁর তফসীরে কাতাদার কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং এবনে আসাকের হযরত মা'আয এবনে জাবাল (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে হযরত ইয়াহয়া (আঃ) শৈশবে শিশুদের সঙ্গে গমন করার সময় তারা তাঁকে খেলার জন্যে বললে তিনি বলেছিলেন আমি খেলার জন্যে পৃথিবীতে আসিনি।

وَنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ

তিনি নবুওয়্যতের উচ্চ মর্যাদায় আসীন ছিলেন। তিনি ছিলেন নেককারদের অন্তর্ভুক্ত, সততা, সাধুতার মূর্ত প্রতীক। তিনি পরহেযগারী এবং সংযম চর্চার পূর্ণ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন, তিনি ছিলেন নিঃস্পাপ, নিষ্কলংক।

হযরত জাকারিয়া (আঃ) পুত্র সন্তান লাভের খোশখবরী পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর দরবারে মোনাজত করলেনঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র হবে কোথা থেকে? আমি বার্ধক্যে উপনীত এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা।

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ

হযরত জাকারিয়া (আঃ) পুত্র সন্তান লাভের সুসংবাদে বিস্ময়-মুগ্ধ এবং হতবাক হয়ে নিতান্ত মানবিক স্বভাবের তাগিদেই এ প্রশ্ন করেছেন। কেননা আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি সর্ব শক্তিমান, তাঁর নিকট অসম্ভব বলে কিছুই নেই, কোন কাজ হওয়ার জন্যে শুধু তাঁর ইচ্ছা এবং মর্জিই যথেষ্ট এ বিশ্বাস হযরত জাকারিয়া (আঃ)-এর অবশ্যই ছিল কিন্তু তবু তিনি উপরোক্ত প্রশ্ন করেছেন। তফসীরকারগণ বলেছেন হযরত জাকারিয়া (আঃ) সন্তান লাভের ব্যাপারে সুসংবাদ পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। কিন্তু কিভাবে তাঁর বার্ধক্যের সময় এবং তাঁর স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব সত্ত্বেও পুত্র সন্তান লাভ হবে একথা বুঝতে পারছিলেন না বলেই এ প্রশ্ন করেছিলেন।

হয়তো তাঁর যৌবন ফিরিয়ে দেয়া হবে, এরপর সন্তান প্রদান করা হবে অথবা আর কি পন্থা হবে তা জানতেই হযরত জাকারিয়া (আঃ) উপরোক্ত মুনাজাত করেছিলেন।

একরামা এবং সাদী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, ফেরেশতাগণ যখন হযরত জাকারিয়া (আঃ)-কে ডাক দিয়ে তাঁর পুত্র সন্তান লাভের সুসংবাদ দেয় তখন অনতিবিলম্বে ইবলিস শয়তান সেখানে হাযির হয় এবং বলে যে এ সুসংবাদ আল্লাহর তরফ থেকে নয়; বরং শয়তানে তরফ থেকে, যদি আল্লাহর তরফ থেকে এ সুসংবাদ হতো তবে তিনি নিজেই আপনার নিকট ওহী প্রেরণ করতেন। শয়তানের এ ওয়াস ওয়াসা দূর করতেই হযরত জাকারিয়া (আঃ) উপরোক্ত প্রশ্ন করেন।

হযরত হানাস বসরী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, পুত্র কিভাবে জন্ম গ্রহণ করবে তার পন্থা কি হবে তা জানার জন্যেই হযরত জাকারিয়া (আঃ) উপরোক্ত মুনাজাত করেছেন। এর সম্ভাব্য পন্থা হলো–

(১) হযরত জাকারিয়া (আঃ) এবং তাঁর স্ত্রীকে যৌবন ফিরিয়ে দেয়া,

(২) তাঁর স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব দূর করা,

(৩) অন্য কোন স্ত্রীর তরফ থেকে পুত্র সন্তান লাভ করা,

(৪) অথবা বর্তমান অবস্থায়ই আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরতে পুত্র সন্তান লাভ করা-এর কোন্টি হবে? তা জানার জন্যেই উপরোক্ত প্রশ্ন।[১]

আল্লাহ পাক তার জবাবে এরশাদ করেছে-

قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক এমনিভাবেই যা ইচ্ছা তা করেন, তোমার বার্ধক্যে উপনীত হওয়া এবং তোমার স্ত্রী বন্ধ্যা হওয়া সত্বেও আল্লাহ পাকের কুদরতে পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করবে। কেননা যদিও স্বাভাবিক নিয়ম মোতাবেক আল্লাহ পাকের বিশাল বিস্তৃত বিশ্ব সৃষ্টি চলে থাকে কিন্তু এর ব্যতিক্রম হওয়া অসম্ভব নয়। কোন নিয়ম পালন করা আল্লাহ পাকের জন্যে জরুরী নয়, বরং তিনি যা করেন তাই নিয়ম হওয়া জরুরী।

হযরত মরয়ম (আঃ)-এর নিকট অস্বাভাবিক ভাবে খাদ্য দ্রব্যের আগমন এবং অকালের ফল পরিবেশন যেভাবে হয়েছে ঠিক তেমনি বার্ধক্য কালে তোমাকে পুত্র সন্তান প্রদান করা হবে। হযরত জাকারিয়া (আঃ) এ সুসংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আরেকটি আরযী পেশ করলেন-

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْٓ اٰيَةً

হে রব! পুত্র সন্তানের জন্মের যখন ব্যবস্থা হবে তথা গর্ভ সঞ্চার সুনিশ্চিত হবে এবং প্রসবকাল যখন ঘনিয়ে আসবে তখনকার জন্যে আমাকে একটি নিদর্শন জানিয়ে দিন যাতে করে অধিক পরিমাণে আমরা শোকর আদায় করতে এবং অধিক পরিমাণে আপনার বন্দেগী করতে পারি। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন-

قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا

তোমার জন্যে নির্দশন হলো এই, তিন দিন যাবত ইঙ্গিত করা ব্যতীত কারো সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। তোমার রসনা শুধু আল্লাহ পাকের জিকরে মশগুল থাকবে। আল্লাহ পাকের বন্দেগী এবং শোকর গুজারীতে তখন তুমি মুগ্ধ মত্ত থাকবে তথা সৃষ্টির সাথে তোমার সম্পর্ক ক্ষীণ হবে এবং স্রষ্টার সাথে তোমার সম্পর্ক হবে সুদৃঢ় এবং ঘনিষ্ঠতর।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-২, পৃষ্ঠা- ২৩৪
তফসীরে কবীর খন্ড-৮, পৃষ্ঠা- ৩৯

আতা (রঃ) বর্ণনা করেছেন তিন দিন যাবত কথা না বলার তাৎপর্য হলো তিন দিন যাবত রোজা রাখ। কেননা সে আমলে তারা রোজাদার অবস্থায় কথা বলতেন না। যখন এ অবস্থা হবে তখন গর্ভ সঞ্চার হয়েছে বলে মনে করবে। আর সে সময় কর্তব্য হলো-

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ

অধিক পরিমাণে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর এবং নামায আদায় কর, দিনের শেষে তথা জোহর, আসর, মাগরিব, এশা এবং দিনের প্রথমাংশে তথা ফরজ থেকে চাশ্‌ত পর্যন্ত। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের এ নেয়ামতের জন্যে তাঁর মহান দরবারে অধিক পরিমাণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। মূলতঃ আল্লাহর শোকরের মাধ্যমে আল্লাহ পাক তাঁর নেয়ামত বৃদ্ধি করার কথা ঘোষণা করেছেন কোরআনে করীমে। আর কৃতজ্ঞ বন্দা মাত্রেরই বৈশিষ্ট্য হলো সর্বক্ষণ আল্লাহ্ পাকের জিকরে মশগুল থাকা।

وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ
يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰىكِ عَلٰى
نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٢﴾ يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ
مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾ ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ؕ وَمَا
كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۪ وَمَا
كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٤٤﴾ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ
اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ
مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٤٥﴾
وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٤٦﴾

তরজমা

(৪২) এবং যখন ফেরেশতাগণ বললো হে মরয়ম! আল্লাহ্ পাক তোমাকে মনোনীত করেছেন এবং তোমাকে পবিত্র করেছেন এবং সারা বিশ্বের নারীদের মধ্যে তোমাকে নির্বাচিত করেছেন।

(৪৩) হে মরয়ম! তোমার প্রতিপালকের বন্দেগী কর, সেজদা কর এবং যারা রুকু করে তাদের সঙ্গে রুকু কর।

(৪৪) এ সমস্ত গায়বী খবর যা আমি আপনাকে (হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে) ঐশী বাণী দ্বারা অবগত করছি এবং যখন তারা কলম সমূহ নিক্ষেপ করছিল যে কে মরয়মের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে (হে রসূল!) তখন আপনি তাদের নিকট ছিলেন না এবং তারা যখন কলহ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিল তখনও আপনি তাদের নিকট ছিলেন না।

(৪৫) স্মরণ কর সে সময়কে যখন ফেরেশতাগণ বলেছিল, হে মরয়ম! নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাকে তাঁর একটি হুকুমের শুভ সংবাদ দিতেছেন যার নাম হবে মরয়ম পুত্র ঈসা মসীহ (আঃ)। সে ইহকাল এবং পরকালে সম্মানিত হবে এবং যারা আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভে ধন্য হয় তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(৪৬) এবং সে দোলনায় থাকা অবস্থায় (শৈশবে) ও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবে আর সে নেককার লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

তফসীরুল কোরআন

হযরত মরয়মের বৈশিষ্ট্য

এ আয়াতে মরয়ম (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ পাকের নির্দেশ-ক্রমে ফেরেশতাগণ মরয়ম (আঃ)-কে এ সংবাদ দিয়েছেন, হে মরয়ম! আল্লাহ পাক তোমাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, মসজিদের খেদমতের জন্যে মনোনীত করেছেন, তোমাকে সকল পাপাচারে থেকে পবিত্র রেখেছেন, তোমাকে বহু গুণ দ্বারা মহিমান্বিত করেছেন, বাহ্যিক ও আন্তরিক পরিচ্ছন্নতা, চরিত্র-মাধুর্য, সতীত্ব ও পবিত্রতার অনেক গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং নারী সমাজের উপর তোমাকে ফজিলত ও মর্যাদা দান করেছেন, তোমাকে অনেক অলৌকিক মহিমায় সম্মানিত করেছেন, পুরুষ না হওয়া সত্ত্বেও মসজিদের সেবার জন্যে মনোনীত করেছেন। পুরুষ নৈকট্য ব্যতীত আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরতে তোমাকে সন্তান দান করেছেন, আর সে সন্তানও সাধারণ মানুষ নয়; বরং আল্লাহর পাকের নবী হযরত ঈসা (আঃ)। অতএব, হে মরয়ম! তুমি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে অত্যন্ত বিনয় এবং আযিজীর সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমার উচ্চ মর্যাদার জন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তাঁর হুজুরে সেজদারত হও এবং অত্যন্ত এখলাস ও আন্তরিকতার সঙ্গে তন্ময় হয়ে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে বিনয় প্রকাশ কর।

বস্তুতঃ মরয়ম (আঃ)-কে আল্লাহ পাক বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমার জন্যে পৃথিবীর নারী সমাজের মধ্যে মরয়ম বিনতে

এমরান, খাদীযা বিনতে খোয়াইলেদ, ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া যথেষ্ট (অর্থাৎ এ চার জন মহিলা সকলের চেয়ে উত্তম।) তিরমিযী শরীফ

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ পুরুষদের মধ্যে তো অনেক কামেল রয়েছে কিন্তু স্ত্রীলোকদের মধ্যে কামেল হলো শুধু মরয়ম বিনতে এমরান এবং ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া আর মহিলা সমাজের মধ্যে আয়েশার (রাঃ) ফজিলত এমন যেমন খাবারের মধ্যে সরীত নামক খাবারের ফজিলত রয়েছে (সরীত হলো সুরবায় ভেজানো এবং ঘিয়ে মেশানো রুটি)।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন এই হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যে নির্দেশনা রয়েছে তার তাৎপর্য হলো পূর্ববর্তী জাতি সমূহের মধ্যে মহিলা সমাজে কামেল হলেন মরয়ম বিনতে এমরান এবং ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া। কেননা এই হাদীসেরই শেষাংশে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ফজিলত বর্ণনা করেছেন। এতে একথা প্রমাণিত হয় হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ফজিলত হযরত মরয়ম ও হযরত আসিয়া থেকে অধিকতর।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- হে ফাতেমা! তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে তুমি জান্নাতবাসী স্ত্রীলোকদের সরদার।

আবু দাউদ, নেসায়ী এবং হাকেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জান্নাতী মহিলাদের মধ্যে সর্বাধিক ফজিলত হলো খাদীযা বিনতে খালেদ এবং ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের। হযরত হোযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আসমান থেকে একজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হলো এবং আল্লাহর পাকের দরবার থেকে অনুমতি নিয়ে আমাকে সালাম দিল এবং এই সুসংবাদ দিল যে ফাতেমা (রাঃ) জান্নাতী স্ত্রীলোকদের সরদার।[১]

আলোচ্য আয়াতে "আল মালায়েকা" (ফেরেশতাগণ) শব্দটির তাৎপর্য হলো শুধু জিব্রাইল (আঃ) আর কেউ নন। এখানে একথাও উল্লেখ্য মরয়ম (আঃ) নবী ছিলেন না, অথচ জিব্রাইল (আঃ) তাঁর নিকট গমন করেছেন। আর তা হলো তাঁর কারামত স্বরূপ যেমন হযরত মূসা (আঃ)-এর মাতা সম্পর্কেও এরশাদ হয়েছেঃ

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৩৬
তফসীর এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৭
তফসীরে কবীর খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪৩

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى اُمِّ مُوْسٰى

অতএব, হযরত মরয়মের নিকট জিব্রাঈল (আঃ)-এর গমন এমনিভাবে কারামত এবং বৈশিষ্ট্য যেমন মূসা (আঃ) সম্পর্কে তাঁর মাতার নিকট যে খবর প্রেরিত হয়েছিল তা ছিল তাঁরই বৈশিষ্ট্য।

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ الاية

এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন, (হে রসূল!) এই সমস্ত গায়বী খবর যা এ পর্যন্ত আলোচিত হলো জাকারিয়া, ইয়াহয়া এবং ঈসা এবনে মরয়ম সম্পর্কে, এ গায়বী খবর সমূহ (হে রসূল!) আপনার নিকট আমি ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করছি, কেননা আপনি আমার সত্য রসূল। মরয়মের অভিভাবক কে হবে? এ প্রশ্নের মীমাংসায় যখন তৌরাত লেখকগণ তাদের কলম সমূহ নদীতে ফেলেছিল তখন তো আপনি তাদের নিকট ছিলেন না আর তারা এ বিষয়ে বাদানুবাদ করছিল তখনও আপনি তাদের নিকট ছিলেন না। অথচ এ সমস্ত বিষয় নিখুঁতভাবে আপনি বর্ণনা করছেন। এসব কি একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ নয়? যে আপনি আমার প্রিয় রসূল এবং আমিই আপনার নিকট ওহীর মাধ্যমে এই সমস্ত গায়বী খবর প্রেরণ করে থাকি। অতএব, সকলের কর্তব্য হলো আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ

এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, স্মরণ কর সে সময়কে যখন ফেরেশতাগণ হযরত মরয়ম (আঃ)-কে এই সুসংবাদ দিল হে মরয়ম! আল্লাহ পাক তোমাকে একটি কলেমা বা বাক্যের সুসংবাদ দেন, যা তাঁর পক্ষ থেকে হবে অর্থাৎ একটি শিশুর খোশখবরী দেন যা পিতার মাধ্যমে হবে না; বরং আল্লাহ পাকের বাণী "কুন" বাক্যের ফলশ্রুতিতে হবে, আর যেহেতু এ শিশুটি পিতা ব্যতীত শুধু আল্লাহ পাকের হুকুমে তাঁর "কুন" বাক্যের ফলে হবে তাই তাঁকে "কলেমাতুল্লাহ" বলা হয়েছে। তাঁর নাম হবে মসীহ ঈসা ইবনে মরিয়ম, মসীহ শব্দটি হিব্রু ভাষায় মসীহ বা মশীহা যার অর্থ হলো মোবারক, বরকতময়। হযরত ঈসা (আঃ) মোবারক বা বরকতমতয় বলেই তাঁকে মসীহ বলা হয়। যেহেতু হযরত ঈসা (আঃ)-কে সমস্ত অপবিত্রতা থেকে পবিত্র রাখা হয় তাই তাঁকে মসীহ বলা হয়। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) মসীহ নামকরণের কারণ বর্ণনা করেছেন যে, যেহেতু হযরত ঈসা (আঃ) যে কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে স্পর্শ করতেন সে সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়ে যেত, তাই তাঁকে মসীহ বলা হয়েছে।

'মাসহুন' শব্দের অর্থ হলো, স্পর্শ করা বা পরিচ্ছন্ন করা। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, যেহেতু হযরত ঈসা (আঃ) সর্বদা ভ্রমণরত থাকতেন, কোন এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতেন না এজন্যে তাঁকে 'মসীহ' বলা হতো। আরবী ভাষার বিখ্যাত অভিধাণ গ্রন্থ কামুসে 'মসীহ' শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে অধিক ভ্রমণকারী।[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন কোন তফসীরকার একথাও লিখেছেন, হযরত মরয়ম (আঃ) যখন ১৩ বা ১৫ বছর বয়স্কা ছিলেন তখন জনৈক ব্যক্তি তাঁর নিকট আসে, তিনি ছিলেন মূলত হযরত জিব্রাঈল (আঃ) যিনি মানব রূপ ধারণ করে হাযির হয়েছিলেন। জিব্রাইল (আঃ) বললেনঃ আমাকে আল্লাহ পাক প্রেরণ করেছেন, আমি তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি, ঈসা মসীহ "কলেমাতুল্লাহ" তোমার ঘরে জন্ম গ্রহণ করবেন যিনি দুনিয়াতে সম্মানিত ব্যক্তি হবেন, তাঁর মোযেজা হবে অসংখ্য, তিনি আখেরাতে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভে ধন্য হবেন।[২]

ঈসা শব্দটি হিব্রু ভাষা ইশুর রূপান্তর। এর অর্থ হলো সর্দার, নেতা। এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে হযরত ঈসা (আঃ)-কে পবিত্র কোরআনে এবনে মরয়ম বা মরয়ম পুত্র বলা হয়েছে। এতদ্বারা একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) পিতা ব্যতীত আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরতে অলৌকিক ঘটনারূপে জন্ম গ্রহণ করেছেন। এবনে মরয়ম বাক্যটি ব্যবহার করে পবিত্র কোরআন বিশ্ববাসীর সম্মুখে এক মহাসত্য তুলে ধরেছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) একজন মানুষ ছিলেন, তিনি মাতৃ-গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। অতএব, তাঁর সম্পর্কে খৃষ্টানরা যে আপত্তিকর মন্তব্য করে এবং তাঁকে মানুষের উর্দ্ধে অনেক কিছু মনে করে তা আদৌ সঠিক নয়। হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে খৃষ্টানরা যে বাড়াবাড়ি করে তার প্রতিবাদ রয়েছে এবনে মরয়ম শব্দটির মধ্যে, এর পাশাপাশি ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর শানে অপমানজনক কথা বলে বেআদবী করত তার প্রতিবাদ করেছে কোরআনে করীম পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

وَجِيهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

অর্থাৎ ঈসা (আঃ) দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে সম্মানিত হবেন। অতএব, ইহুদীরা তাঁর সম্পর্কে যে ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলে তা সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য, কেননা তিনি আল্লাহর প্রেরিত নবী। পৃথিবীর ১৩০ কোটি মুসলমান তাঁকে আল্লাহর নবী হিসেবে সম্মান করে। আর খৃষ্টানরা যদিও তাঁকে মানুষের মর্যাদার উর্দ্ধে বলে ভুল করে তবু তাদের কোটি কোটি মানুষ তাঁকে সম্মান করে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা ২৩৮
২। খোলাসাতুত তাফাসীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৫১

وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ

অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ) যেমন দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে সম্মানিত হবেন, ঠিক তেমনি তিনি আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভকারীদের অন্যতম হবেন। এ বাক্যটি দ্বারা পবিত্র কোরআনের অলৌকিকত্ব এবং বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয়, কেননা তিনি আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করবেন একথা বলার মাধ্যমে ইহুদীদের সেসব অপবাদের প্রতিবাদ করা হয়েছে যা তারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি আরোপ করে। এর পাশাপাশি এ বাক্যটি দ্বারাই খৃষ্টানদের সেসব অশোভন মন্তব্যের প্রতিবাদ করা হয়েছে যা তারা হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে করেছে, কেননা তারা ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে (নাউজুবিল্লাহ্) অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ করেছে। আলোচ্য বাক্যে ঘোষণা করা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) শুধু একাই আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী ব্যক্তি নন; বরং তিনি আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্যতম। অতএব তাঁকে আল্লাহর বন্দা ও রসূল হিসেবে অবশ্যই মেনে নিতে হবে। ইহুদীদের ন্যায় তাঁর শানে বেআদবী করার অনুমতি দেয়া যাবে না, এমনিভাবে খৃষ্টানদের ন্যায় তাঁকে অতি মানব বা অন্য কোন আপত্তিকর মন্তব্য করার অনুমতিও দেয়া যাবে না। তিনি আল্লাহর বন্দা ও রসূল, এটিই মানুষের জন্যে উচ্চতম মর্যাদা, এ সত্য উপলব্ধি করতে হবে।[১]

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ

অর্থাৎ হযরত ঈসার (আঃ) একটি মোযেজা হবে এই যে, তিনি অতি শৈশবে যখন সাধারণতঃ শিশুরা কথা বলেনা হযরত ঈসা (আঃ) তখন কথা বলবেন, তফসীরকাগণ বলেছেনঃ তিনি দোলনা থেকে জ্ঞানী ব্যক্তিদের ন্যায় কথা বলবেন, এখানে একথাও বিশেষভাবে উল্লেখ, হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে যখন মরয়ম (আঃ) সন্তান লাভের সুসংবাদ পেলেন, তখন তাঁর মনে স্বাভাবিক ভাবেই এ দুঃশ্চিন্তা সৃষ্টি হলো যে, এ অবস্থায় আমি যখন সন্তান লাভ করব, মানুষ যে আমার সম্পর্কে খারাপ ধারণা করবে এবং আমার প্রতি অপবাদ আরোপ করবে, তখন আমি কিভাবে মানুষকে মুখ দেখাব, আল্লাহ পাক মরয়ম (আঃ)-এর দুশ্চিন্তা দূর করার জন্যেই বলেছেনঃ

وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا

অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র বাণীর মাধ্যমে যে সন্তান লাভ করবে, সেতো চির সম্মানিত হবে, অতএব তাঁর দ্বারা তুমি অপমানিত হবে না, বরং সম্মানিত ও

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা- ১৩৩-৩৪

গৌরবান্বিত হবে শুধু তাই নয়; বরং ঈসা (আঃ) অতি শৈশবে দোলনায় থেকে মানুষের সঙ্গে কথা বলে বিশ্ববাসীকে বিস্ময়াভিভূত করবেন।

وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ

অর্থাৎ ঈসা (আঃ) শুধু শৈশবেই কথা বলবেন না; বরং প্রৌঢ় বয়সেও কথা বলবেন। এখানে এ প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে যে, শৈশবে তিনি কথা বলবেন, বিশেষ করে দোলনায় থাকা অবস্থায় কথা বলবেন এ বিষয়টি বিস্ময়কর, অস্বাভাবিক এবং অভাবনীয় তাই উল্লেখযোগ্য কিন্তু প্রৌঢ় অবস্থায় তিনি কথা বলবেন, একথা উল্লেখ করার কি প্রয়োজন? কেননা এ বয়সে তো সবাই কথা বলে।

তফসীরকারগণ এর জবাব দিয়েছেন যে, মূলতঃ এ বাক্যটিতে একথার সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মতভুক্ত হবেন এবং তখন হবে তাঁর প্রৌঢ় অবস্থা, কেননা যখন তাঁকে আসমানে উত্তোলন করা হয় তখন তাঁর বয়স ছিল ৩০-৩৫ এর মাঝামাঝি আর শেষ যমানায় পৌঢ় বয়সে তিনি প্রত্যাবর্তন করে মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন এটিই হবে তাঁর মোযেজা আর তিনি হবেন নেককারদের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, হযরত ঈসা (আঃ)-কে যে সব হতভাগ্য লোকেরা আল্লাহর পুত্র বলে আখ্যা দেয় তারা যেমন জঘন্য অপরাধী তেমনি যারা তাঁর প্রতি কোন দোষ আরোপ করে তারাও অত্যন্ত বড় অন্যায়কারী, তিনি নির্দোষ, নিষ্কলংক তিনি আল্লাহর বন্দা ও রসূল, তিনি চির সম্মানিত।

وَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ পাকের বাণীর মাধ্যমে তাঁর বিশেষ কুদরতে জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং তিনি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে সম্মানিত ব্যক্তি বলে ঘোষিত হয়েছেন এবং আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভে ধন্য হয়েছেন এবং তিনি অতি শৈশবে বুদ্ধিমান মানুষের ন্যায় কথা বলেছেন তাঁর এসব গুণাবলীই তাঁর বৈশিষ্ট্য আর এ বৈশিষ্ট্য সমূহ নিঃসন্দেহে তাঁকে অতি উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেছেন। কিন্তু এই সমস্ত উচ্চ মর্যাদার উল্লেখের পর তাঁর সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে তিনি ছিলেন নেককার লোকদের অন্তর্ভুক্ত। অথচ এর চেয়ে অনেক বড় বৈশিষ্ট্যের কথা ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। এ গুণটির উল্লেখ সবশেষে কেন করা হলো?

ইমাম রাজী (রঃ) এ প্রশ্নের জবাবে বলেছেন মূলতঃ কোন মানুষের নেককার হওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। কেননা একজন মানুষের যত গুণই থাকুক না কেন যদি সে নেককার না হয় তবে তার সমস্ত গুণ নিরর্থক বলে বিবেচিত হয়। আর নেককার

হওয়া খুব সহজ ব্যপার নয়। নেককার হতে হলে মানুষের জীবন ও জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড যথাযথ ভাবে সঠিক নিয়মে সম্পাদন করতে হয়, জীবনের প্রতিটি কথা ও কাজ আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ মোতাবেক হতে হয়। সকল অবস্থায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হয়। সর্বক্ষণ আল্লাহর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। আর এটি অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। এ কারণেই এ গুণটির উল্লেখ সবশেষেই করেছেন।

قَالَتْ
رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ
يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٤٧﴾
وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ﴿٤٨﴾ وَرَسُوْلًا اِلٰى
بَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ ۙ اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّىْۤ اَخْلُقُ
لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا ۢ بِاِذْنِ
اللّٰهِ ۚ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْىِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَ
اُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِىْ بُيُوْتِكُمْ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ
لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٤٩﴾ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ
التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ
بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۫ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿٥٠﴾

তরজমা

(৪৭) (তখন) মরয়ম বলেছিল হে আমার প্রভূ! কি করে আমার পুত্র হবে অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি। আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ এভাবে আল্লাহ পাক যা ইচ্ছা তা সৃষ্টি করেন, যখন তিনি কোন কাজের ইচ্ছা করেন তখন তিনি শুধু বলেন হও! বস্তুতঃ (সে কাজ) হয়ে যায়।

(৪৮) এবং আল্লাহ্ পাক তাঁকে কিতাব, হেকমত, তৌরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দেন।

(৪৯) এবং আল্লাহ্ পাক তাঁকে (ঈসা (আঃ)-কে) বণী ইসরাঈলের নিকট রসূল হিসেবে প্রেরণ করবেন, (যে তাদের নিকট বলবে) নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে তোমাদের নিকট নির্দশন নিয়ে এসেছি। নিশ্চয় আমি মাটি দ্বারা পক্ষী সদৃশ আকৃতি বানাবো এবং তাতে ফুঁক দেব এবং আল্লাহ্ পাকের হুকুমে তা (জীবন্ত) পাখী হয়ে যাবে। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য করব এবং আল্লাহ্ পাকের হুকুমে মৃতকে জীবিত করব। আর তোমরা তোমাদের গৃহে যা আহার কর আর যা বাড়ীতে মওজুদ রাখ তা তোমাদেরকে বলে দেব, নিশ্চয় এতে রয়েছে তোমাদের জন্যে নির্দশন যদি তোমরা প্রকৃত মোমেন হও (তোমরা এতদ্বারা সহজেই অনুমান করতে পার যে আমি সত্যিই আল্লাহ্ পাকের প্রেরিত রসূল)।

(৫০) এবং আমার পূর্ববর্তী কিতাব তৌরাতের আমি সত্যতা প্রমাণ কারী এবং কতিপয় বস্তু যা তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ ছিল তা আমি বৈধ বা হালাল করব। আর আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। অতএব, তোমরা আল্লাহ্ পাককে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে জিব্রাইল (আঃ) হযরত মরয়মকে (আঃ) সুসংবাদ দিয়েছেন যে তাঁর একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে এবং সে অনেক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে। তাই মরয়ম (আঃ) এ সুসংবাদে বিস্ময়-মুগ্ধ হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে এই আবেদন করেছেন যে, হে আমার প্রতিপালক! আমার সন্তান কিভাবে হবে? আমারতো বিবাহ হয়নি। ফলে আমাকে তো কোন মানুষ স্পর্শও করেনি। আল্লাহ্ পাক এর জবাবে এরশাদ করেছেনঃ হে মরয়ম! এভাবেই তোমার সন্তান হবে, এখন যে অবস্থায় আছ এ অবস্থায়ই তোমার সন্তান হবে। আল্লাহ্ পাকের মহা কুদরতে সব কিছুই সম্ভব, পিতার মাধ্যম ব্যতীত আল্লাহর নির্দেশক্রমে সন্তানের জন্ম গ্রহণ আদৌ অসম্ভব বা কঠিন কিছুই নয়। আল্লাহ পাক এভাবেই সৃষ্টি করেন, তাঁর নিয়ম হলো যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন তিনি শুধু বলেনঃ 'হও' সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়।

তাৎপর্যপূর্ণ বাক্য

আলোচ্য আয়াতে– اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ। এ বাক্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ, কেননা এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক যখন যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যেহেতু কথাটি হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে তাই এতে একথা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র মখলুক বা সৃষ্টি। যারা তাঁর সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করে তারা যে অবাস্তব ও অসত্য কথা বলে তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই।

তফসীরকারগণ এ সম্পর্কে একথাও বলেছেন যে, কয়েক আয়াত পূর্বে হযরত জাকারিয়া (আঃ)-এর বিবরণে এমনি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেখানে এরশাদ হয়েছেঃ

يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক যা ইচ্ছা তা করে থাকেন। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ "যা ইচ্ছা তা সৃষ্টি করেন"। এটি পবিত্র কোরআনের বৈশিষ্ট্য এবং অলৌকিকত্ব যে, কোরআন যুগোপযুগী, কেননা পরবর্তীকালে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে পথভ্রষ্ট লোকেরা অনেক আপত্তিকর মন্তব্য করবে, তাই আল্লাহ পাক এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে ঈসা (আঃ) আল্লাহর সৃষ্টি। তিনি আল্লাহর বন্দা ও রসূল।[১]

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ

মরয়ম (আঃ) যখন জানতে পারলেন যে পিতা ব্যতীতই তাঁর গৃহে সন্তান হবে তখন অত্যন্ত চিন্তিত হলেন এজন্যে যে মানুষ এ অবস্থায় তাঁর সমালোচনা করবে। তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ফেরেশতা তাঁকে এই সুসংবাদ দেয় যে আপনার ঘরে আল্লাহ পাকের বিশেষ হুকুম এবং হেকমতে যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে সে হবে অনন্য-সাধারণ। আল্লাহ পাক তাঁকে শিক্ষা দেবেন লেখাপড়া এবং অনেক সূক্ষ্ম রহস্য সম্পর্কে তাঁকে অবগত করবেন। যেহেতু ছহীহ হাদীসে রয়েছে হযরত ঈসা (আঃ) কেয়ামতের পূর্বে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন এবং উম্মতে মোহাম্মদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হবেন, এ প্রেক্ষিতে কোন কোন তফসীরকারের মতে আলোচ্য আয়াতে "কিতাব" শব্দের তাৎপর্য হবে কোরআন ও সুন্নত অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ) তখন কোরআন ও সুন্নতের জ্ঞান অর্জন করবেন, কেননা তখন তাঁর প্রতি যে দায়িত্ব অর্পিত হবে তা পালনের জন্য কোরআন ও সুন্নতের জ্ঞান অত্যন্ত জরুরী হবে।

এমনিভাবে আল্লাহ পাক তাঁকে অন্যান্য আসমানী কিতাব সমূহের এলম দান করবেন যেমন তৌরাত যা মূসা (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল এবং ইঞ্জিল যা ঈসা (আঃ)-এর প্রতি নাযিল হয়েছিল।

তফসীরকারগণ লিখেছেন যে তৌরাত এবং ইঞ্জিল হযরত ঈসা (আঃ)-এর মুখস্ত ছিল।[২]

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা- ১৩৪
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৯
২। তফসীরে এবনে কাসীর খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা- ৫৩-৫৪

এতদ্ব্যতীত, আল্লাহ পাক মরয়ম পুত্র ঈসা (আঃ)-কে বণী ইসরাঈলের নিকট তাঁর রসূল হিসেবে প্রেরণ করবেন এবং তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বলবেন, "নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট রসূল হিসেবে এসেছি এবং নিয়ে এসেছি আল্লাহ্র তরফ থেকে নির্দশন। এবং একটি নির্দশন হলো এই যে আমি তোমাদের জন্যে মাটি দ্বারা পাখির আকৃতি তৈরী করবো এবং তাতে ফুঁক দিলে তা আল্লাহ্ পাকের আদেশক্রমে জীবন্ত পাখি হয়ে যাবে আর জন্মান্ধকে আমি চক্ষুষ্মান করবো এবং শ্বেত রোগী স্বাস্থ্য-সুখ লাভ করবে এবং আল্লাহর আদেশ-ক্রমে মৃতকে আমি জীবিত করবো"।

মৃতকে জীবিত করা মানুষের অসাধ্য, এটি একমাত্র আল্লাহ পাকের কাজ। আর যেহেতু হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্ পাক মৃতকে জীবিত করার অলৌকিক শক্তি দান করেছেন তাই হয়তো তাঁর সম্পর্কে মানুষ ভুল ধারণা করবে, এজন্যে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন-

وَأُحْيِ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ

অর্থাৎ আমি মৃতকে জীবিত করবো তবে নিজের শক্তিতে নয়, বরং আল্লাহ পাকের আদেশ-ক্রমে। মানুষের ভুল ধারণার নিরসন-কল্পেই তিনি "বিইজনিল্লাহ" শব্দটি সংযোজন করেছেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত ঈসা (আঃ) চারজন মানুষকে জীবিত করেছিলেন (১) আজর (২) এক বৃদ্ধার পুত্র (৩) আশেরের কন্যা (৪) সাম এবনে নূহ। আজর তাঁর বন্ধু ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সময় ঘণিয়ে এলে হযরত ঈসা (আঃ)-কে আজরের ভগ্নি এ সংবাদ দেয় যে আপনার বন্ধু মৃত্যু মুখে পতিত হতে যাচ্ছেন। হযরত ঈসা (আঃ)-কে আজরের বাড়ী পর্যন্ত পৌছাতে তিন দিন সময়ের প্রয়োজন ছিল। তবু তিনি সংবাদ পেয়ে তাঁর ভক্তদের নিয়ে রওয়ানা হলেন। তিন দিন পর পৌঁছে জানলেন যে তাঁর বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে। তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছে। তিনি তাঁর বোনকে বললেন তুমি আমাকে তাঁর কবরে নিয়ে চল। তিনি তাঁর কবরের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হয়ে আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আজর জীবিত হয়ে কবর থেকে বের হয়ে আসেন এবং পরবর্তীতে অনেক দিন তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁর সন্তান-সন্ততিও হয়।

এক বৃদ্ধার পুত্রের জানাজা খাটিয়ায় করে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সম্মুখ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। হযরত ঈসা (আঃ) তার জন্যে আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করলেন। আল্লাহ্ পাক তাকে পুনর্জীবন দান করলেন। সে খাট থেকে নিজেই অবতরণ করল এবং পোষাক পরিধান করে খাটটি স্বস্কন্ধে নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করল। পরে সে অনেকদিন জীবিত ছিল এবং তারও সন্তান-সন্ততি হয়েছিল।

এক ব্যক্তি সে সরকারী কর আদায় করত। তার এক কন্যার মৃত্যু হয়। হযরত ঈসা (আঃ) মৃত্যুর একদিন পর আল্লাহ্ পাকের দরবারে তার জন্যে দোয়া করলেন। আল্লাহ্ পাক তাকেও পুনর্জীবন দান করলেন এবং সে অনেক দিন জীবিত ছিল, তারও সন্তান-সন্ততি হয়।

সা'ম এবনে নূহের কবরে হযরত ঈসা (আঃ) স্বয়ং গমন করলেন এবং আল্লাহ্ পাকের এসমে আযম ব্যবহার করে নূহ্ (আঃ)-এর পুত্রকে ডাকলেন, সে কবর থেকে বের হয়ে আসল। কেয়ামত হয়ে গেছে মনে করে তার মাথার অর্ধেক চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল। অথচ তখনকার লোকদের চুল সাদা হতো না। সাম জীবিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো কেয়ামতের সময় কি হয়ে গেছে? হযরত ঈসা (আঃ) বললেনঃ না। আমি তোমাকে আল্লাহ্ পাকের এসমে আযম দ্বারা ডাক দিয়েছি। এরপর তিনি বললেন এখন পুনরায় তুমি মৃত্যু মুখে পতিত হও। সে বলল, মৃত্যু কালে যে যন্ত্রণা হয়েছিল তা যেন পুনরায় না হয়। হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্ পাকের দরবারে তার জন্যে দোয়া করলেন, আল্লাহ্ পাক তাকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর দোয়ার বরকতে পুনরায় মৃত্যুর কষ্ট থেকে রেহাই দিলেন।

وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِىْ بُيُوْتِكُمْ

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে জানাবো যে তোমরা বাড়ী থেকে কি খেয়ে এসেছ এবং আগামী দিনের জন্যে কি রেখে এসেছ, সবই আমি তোমাদেরকে বলবো।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাঁকে এই মোযেজাও দান করেছিলেন যে তাঁর নিকট যারা আসতো, তারা বাড়ীতে কি খাদ্য গ্রহণ করেছে আর কি রেখে এসেছে তা তিনি বলতে পারতেন। নিশ্চয় এতে রয়েছে তোমাদের জন্যে নিদর্শন, যদি তোমরা প্রকৃত মোমেন হও। এখানে উল্লেখ্য অতি শৈশবে হযরত ঈসা (আঃ) এসব অলৌকিক কীর্তি উপস্থাপন করেন এবং যারা হযরত মরয়ম (আঃ)-এর প্রতি অপবাদ দিয়েছে তাদের জন্যে রয়েছে এতে দাঁত ভাঙ্গা জবাব, কেননা হযরত ঈসা (আঃ)-এর ফুঁকে যখন আল্লাহ পাক মাটির কাঠামোকে জীবন্ত প্রাণবন্ত করেন তিনি যদি মানুষের স্পর্শ ব্যতীত শুধু জিব্রাঈল (আঃ)-এর ফুঁকে একজন মহিয়সী নারীর গর্ভে ঈসা (আঃ)-কে সৃষ্টি করে থাকেন তবে তাতে বিস্মিত হওয়ার কি আছে? তফসীরকারগণ লিখেছেন হযরত ঈসা (আঃ) এর এই বরকতময় ফুঁকের সূত্র হলো হযরত জিব্রাইল (আঃ)-এর ফুঁকের বরকতে আল্লাহ পাকের আদেশ ক্রমে হযরত ঈসা (আঃ) জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, আর তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ তাঁর ফুঁকে মাটির কাঠামোতে প্রাণ সঞ্চারিত হতো।

আল্লাহ পাক মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে যুগে যুগে নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং নবুওয়্যতের প্রমাণ স্বরূপ তাঁদেরকে আলৌকিক ক্ষমতা দান

করেছেন। যে যুগে যে বিষয়ের গুরুত্ব থাকতো, আল্লাহ্ পাক সে যুগের নবীকে সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অলৌকিক ক্ষমতা দান করতেন। যেমন হযরত মূসা (আঃ)- এর যুগে যাদুকরীর গুরুত্ব ছিল অনেক বেশী তাই মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ্ পাক এমন মোযেজা দান করেন যে যাদুকরদের যাদু বিদ্যা ব্যর্থ হয়ে যায় এবং তারা এ সত্য উপলব্ধি করে যে যাদু রিদ্যার চূড়ান্ত জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তারা মূসা (আঃ)-এর নিকট পরাজিত হয়েছে অতএব, মুসা (আঃ)-এর নিকট রয়েছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের দান। আর যাদুকরী বিদ্যা দ্বারা আল্লাহর দানের মোকাবেলা করা যায় না, তখন যাদুকররা হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট তওবা করে আল্লাহ্ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। এমনিভাবে যে যুগে হযরত ঈসা (আঃ) আগমন করেছিলেন সে যুগ ছিল চিকিৎসা বিজ্ঞানের যুগ। তাই আল্লাহ্ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-কে এমন মোযেজা দান করেছেন যা চিকিৎসা বিজ্ঞানের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েও তার মোকাবেলা করা যায় না, কেননা জন্মান্ধকে চক্ষুদান করা এবং মৃতকে জীবিত করা আদৌ সম্ভব নয়। এসব অলৌকিক ঘটনা সম্ভব হয়েছে শুধু আল্লাহ্ পাকের বিশেষ কুদরত ও হেকমতে। অতএব, এই সমস্ত অলৌকিক ঘটনা দেখে হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস করাই ছিল পরিণামদর্শী মানুষের কর্তব্য।

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰةِ

অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ) পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত কথা-বার্তার পর একথাও বললেন যে আমি ইতোপূর্বে অবতীর্ণ আসমানী কিতাব তৌরাতের সত্যতা বর্ণনাকারী এবং ইতোপূর্বে তোমাদের প্রতি কোন কোন জিনিস হারাম করা হয়েছিল তা আমি হালাল বলে ঘোষণা করবো। পূর্বের কোন কোন কঠিন নির্দেশ আমি রহিত করবো।

অতএব, তোমরা এক আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুকরণ কর।

إِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ
فَاعْبُدُوْهُ ۭ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝٥١ فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ
الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ
اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۝٥٢ رَبَّنَآ اٰمَنَّا
بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ۝٥٣
وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ۭ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ۝٥٤

তরজমা

(৫১) নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক অতএব তোমরা তাঁর বন্দেগী কর, এটিই সরল সঠিক পথ।

(৫২) অতঃপর যখন ঈসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাস লক্ষ্য করলেন তখন তিনি বললেন আল্লাহ্ পাকের পথে কে হবে আমার সাহায্যকারী? তখন তাঁর ভক্ত সহচরগণ বলেছিল আমরাই আল্লাহ পাকের পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহ্ পাকের উপর ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং তুমি সাক্ষী থাক যে নিশ্চয় আমরা অনুগত, আমরা মুসলমান।

(৫৩) হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি যা নাযিল করেছ তার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি এবং এই রসূলের অনুসরণ করেছি। অতএব আমাদেরকে সাক্ষীগণের তালিকাভুক্ত কর।

(৫৪) এবং কাফেররা চক্রান্ত করল আর আল্লাহ পাকও কৌশল অবলম্বন করলেন, আর আল্লাহ পাক সর্বোত্তম কৌশলী।

তফসীরুল কোরআন

إِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ

হযরত ঈসা (আঃ) অতঃপর তওহীদ বা আল্লাহ্র একত্ববাদের কথা ঘোষণা করলেন– নিশ্চয় আল্লাহ পাক আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। অতএব, তোমরা শুধু তাঁর বন্দেগী কর। এটিই সরল সঠিক পথ। যেভাবে তোমাদের এবং তাঁর মধ্যে তথা সৃষ্টি এবং স্রষ্টার সম্পর্ক আদৌ পিতা-পুত্রের সম্পর্ক নয়, ঠিক তেমনি আমার এবং তাঁর মধ্যেও পিতা-পুত্রের সম্পর্কের কথা চিন্তা করা যায় না। অতএব, এক আল্লাহ্ পাককে আমার ও তোমাদের প্রভূ বলে বিশ্বাস কর। একমাত্র তাঁরই বন্দেগী কর এবং শুধু তাঁর নিকটই আত্মসমর্পণ কর। আর এটিই সরল সঠিক পথ। অতএব, তওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করা, তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করা এবং আল্লাহ্র রসূলের অনুসরণ করা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের একমাত্র সহজ ও সঠিক পন্থা। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এই আরয করলো যে আমাকে আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি কথা শিক্ষা দিন যা আপনার পর আর কারো নিকট জিজ্ঞাসা করতে না হয়। তখন প্রিয় নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তওহীদ সম্পর্কীয় আলোচ্য বাক্যটি তাঁকে শুনিয়ে দিলেন।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা ২৪৫

আলোচ্য আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন হযরত ঈসা (রাঃ)-এর এ বাক্যটির উদ্দেশ্যে হলো আল্লাহ পাকের দরবারে নিজের বিনয় প্রকাশ করা এবং তিনি যে আল্লাহর একজন বন্দা মাত্র একথা স্বীকার করা যাতে করে কেউ তাঁর সম্পর্কে কোন ভিত্তিহীন কথা না বলে। যেমন মূর্খ খৃষ্টানরা তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলে দাবী করে (নাউজুবিল্লাহ)। এরপর তিনি বলেছেন ঃ

فَاعْبُدُوهُ

অর্থাৎ তোমরা সকলে এক আল্লাহর বন্দেগী কর, কেননা তিনিই আমাদের সকলের প্রভু। তিনিই আমাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তা, তওহীদের এ আহবানের প্রতি আরও বেশী তাগিদ করে এরপর বলেছেনঃ

هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

অর্থাৎ এটিই সরল সঠিক পথ।[১]

এখানে উল্লেখ্য পবিত্র কোরআনে কোথাও এতাআতের আদেশ হয়েছে যার অর্থ হলো আনুগত্য প্রকাশ করা আত্ম-সমর্পণ করা আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে– فَاعْبُدُوهُ এ শব্দটি এবাদত থেকে নিষ্পন্ন। এর অর্থ বন্দেগী কর, আর বন্দেগী আল্লাহ ব্যতীত আর কারো করা যায় না। অথচ এতাআত বা আনুগত্য অন্যের প্রতিও প্রকাশ করা যায় কিন্তু এবাদত শুধু আল্লাহরই করতে হয় আর কারো নয়। এতে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে এক আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা, তাঁর প্রতি পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা এবং শুধু তাঁরই বন্দেগী করা হলো সঠিক পথ বা "সীরাতুল মুসতাকীম"।

আলোচ্য বাক্যটি দ্বারা তওহীদের চিরন্তন সত্য অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে।[২]

فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِىْٓ اِلَى اللّٰهِ

ইতোপূর্বে আল্লাহ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মের বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তাঁর বিশেষ গুণাবলীর উল্লেখও করেছেন, তাঁকে আল্লাহ পাক যেসব মোযেজা বা অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করেছেন সেগুলোর উল্লেখও করেছেন এবং ঈসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে তওহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানিয়েছেন এবং আল্লাহ পাক তাঁকে যে মোযেজা সমূহ প্রদান করেছেন সেসব মোযেজাও তারা দেখেছে কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা তাঁরা প্রতি ঈমান আনেনি এবং তারা শুধু যে তাঁর

১। তফসীরে কবীর খন্ড- ৮, পৃষ্ঠা-৬০
১। খোলাসাতুত তাফাসীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৫৩

অবাধ্য হয়েছে তাই, বরং তাঁর প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রেও তারা লিপ্ত হয়েছে। তখনকার অবস্থা আলোচ্য আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে তওহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানাবার পর যখন তিনি এ উপলব্ধি করলেন যে আমার সম্প্রদায় আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না, আল্লাহ পাকের একত্ববাদে আস্থা জ্ঞাপন করবে না এমনকি, আমার প্রতি জুলুম অত্যাচার করবে সে সময় তিনি একথা বলে ডাক দিলেন তোমাদের মধ্যে কে আছ যে আমাকে সাহায্য করবে এবং আল্লাহর দ্বীনের প্রচার করবে? তখন হাওয়ারীগণ বলল, আমরা আল্লাহর দ্বীনের প্রচারে আপনাকে সাহায্য করবো। এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যা ইতোপূর্বে আমরা সংক্ষিপ্ত ভাবে উপস্থাপন করেছি, আল্লাহ্ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-কে মৃতকে জীবিত করার যে মোযেজা দিয়েছিলেন তার প্রমাণ স্বরূপ হযরত ঈসা (আঃ) নূহ (আঃ)-এর পুত্রকে জীবিত করেছিলেন। সে যখন কবর থেকে বেরিয়ে এসেছিল তখন তার মাথার চুল সাদা ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন তোমার মাথার চুল সাদা কেন হলো? সে জবাব দিয়েছিল কেয়ামতের দিনের ভয়ে আমার মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে। হযরত ঈসা (আঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তুমি কি দুনিয়াতে আরও কিছুদিন জীবিত থাকতে চাও? সে বলেছিল মৃত্যুর কষ্ট কি পুনরায় হবে? হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, জীবিত থাকলে মৃত্যুর কষ্ট অবশ্যই পুনরায় হবে। তখন সে বলেছিল তবে আমাকে এভাবেই কবরে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করে দিন। অবশেষে তাই করা হয়েছিল।[১]

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা আলুসী (রহঃ) তফসীরে রুহুল মাআনীতে লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে ইহুদীরা ঈসা (আঃ)-এর বিরোধিতায় ছিল তৎপর। তারা তাদের মজলিসে তাঁর প্রতি বিদ্রুপ করতো, তাঁকে মন্দ বলতো। আর হযরত ঈসা (আঃ)-এর অবস্থানের কোন নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। তিনি সর্বদা ভ্রমণরত থাকতেন। একবার তিনি দেখলেন একজন মহিলা একটি কবরের পার্শ্বে ক্রন্দন-রত রয়েছে। তিনি তাকে তার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল আমার কন্যা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে এবং আমার আর কোন সন্তান-সন্ততি নেই। তখন হযরত ঈসা (আঃ) দু' রাকাআত নামায আদায় করলেন। এরপর মেয়েটির নাম ধরে ডাক দিলেন এবং বললেন তুমি আল্লাহর হুকুমে দণ্ডায়মান হও। তখন কবরটি নড়ে উঠলো। এরপর তিনি পুনরায় ডাকলেন। তখন কবরটি ফেটে গেল। হযরত ঈসা (আঃ) তৃতীয়বার ডাক দিলেন।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৬০

তখন মৃত মেয়েটি কবর থেকে বের হয়ে আসল। সে তার মাথার উপর থেকে বালু পরিষ্কার করতে লাগল, তখন সে বললঃ কি কারণে আমাকে দ্বিতীয়বার মৃত্যুর কষ্ট ভোগ করতে বাধ্য করলেন? হে আমার মা! আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এবং দুনিয়াতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। অতএব, হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি দয়া করে আল্লাহর দরবারে দরখাস্ত করুন যেন তিনি আমাকে আখেরাতে ফিরিয়ে নেন এবং মৃত্যুর কষ্ট দূর করে মৃত্যুকে আমার জন্যে সহজ করে দেন। তখন ঈসা (আঃ) সে মেয়েটির জন্যে দোয়া করলেন। ফলে আল্লাহ পাক তাকে কবরে প্রত্যাবর্তন করালেন।

এ ঘটনা শ্রবণ করে ইহুদীরা আরো বেশী তাঁর প্রতি রাগান্বিত হলো এবং তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো।[১]

তখন তিনি সাহায্যের আহবান জানালে হাওয়ারীগণ বললোঃ আমরা আপনাকে সাহায্য করবো। হাওয়ারী অর্থ সাহায্যকারী, প্রকৃত বন্ধু এবং ধোপা।

হাওয়ারী'র ব্যাখ্যা

হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদেরকে হাওয়ারী এজন্যে বলা হয় যে তাদের মধ্যে আন্তরিকতা ছিল, তারা সাহায্যকারী ছিল। এ মত প্রকাশ করেছেন হাসান এবং সুফিয়ান (রহঃ)। কোন কোন তফসীরকারের মতে ইহুদীদের মধ্যে কয়েকজন রাজপুত্র হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাহায্যকারী হয়েছিলেন। তারা সাদা রংয়ের পোষাক পরিধান করতেন। এজন্যে তাদেরকে হাওয়ারী বলা হতো।

এবনে জরীর একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে তারা ছিল ধোপা, মানুষের পোষাক অত্যন্ত সুন্দরভাবে ধৌত করতো। তাই তাদেরকে হাওয়ারী বলা হতো।

যাহ্যাক (রঃ) এ মত প্রকাশ করেছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাহায্যকারীদের অন্তর পাপমুক্ত ছিল তাই তাদেরকে হাওয়ারী বলা হতো। এবনে মোবারক (রঃ) বলেছেন তাদের চেহারার মধ্যে এবাদত বন্দেগীর কারণে তার চিহ্ন প্রকাশিত হতো, তাদের চেহারা থেকে নূর বিচ্ছুরিত হতো। তাই তাদেরকে হাওয়ারী বলা হতো। 'হাওর' শব্দটির আভিধাণিক অর্থ হলো অত্যন্ত সাদা।

কালবী এবং একরামা বলেছেন হাওয়ারীদের সংখ্যা ছিল ১২। তারা অত্যন্ত বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। এবনে কাসেম বর্ণনা করেন আমি ইমাম কাতাদাকে হাওয়ারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি তিনি বলেছেন হাওয়ারীগণ আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্য ছিলেন। মুজাহেদ এবং সাদী বলেছেন হাওয়ারীগণ ছিল মৎস্য-শিকারী।[২]

২। তফসীরে রুহুল মাআনী, (খন্ড-৩) পৃষ্ঠা-১৭৪
১। তফসীরে মাজহারী-খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৪৬

نَحۡنُ اَنۡصَارُ اللّٰهِ

হাওয়ারীগণ বললো, আমরা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারী, আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। হে আল্লাহর নবী ঈসা (আঃ)! যেদিন নবীগণকে তাদের উম্মতদের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে হবে সেদিন আপনি আমাদের ব্যাপারে এই সাক্ষ্য দিন যে আমরা ছিলাম মুসলমান।

رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنۡزَلۡتَ

হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি তোমার অবতীর্ণ গ্রন্থ সমূহের প্রতি যথা তৌরাত, ইঞ্জিল এবং তোমার প্রেরিত নবী ঈসা (আঃ)-এর প্রতিও আমরা আনুগত্য প্রকাশ করেছি। তাঁর অনুসরণ করেছি। অতএব আমাদেরকে সেসব লোকদের দলভুক্ত কর যারা তোমার একত্ববাদের এবং তোমার প্রেরিত নবীগণের সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে এখানে "শাহেদীন" বলে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর উম্মতকে বোঝানো হয়েছে, কেননা কেয়ামতের দিন উম্মতে মোহাম্মদীয়া পূর্ববর্তী নবীগণ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।

وَمَكَرُوۡا

যাদের সম্পর্কে হযরত ঈসা (আঃ)-এর আশঙ্কা ছিল যে তারা অবাধ্য, তারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো, তাঁকে গোপনে হত্যা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলো।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে একবার ইহুদীদের একটি দল হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট এসে বললোঃ যাদুকর এবং যাদুকরনীর পুত্র এসেছে। তারা হযরত ঈসা (আঃ) এবং তাঁর মাতাকে গালি দিল। হযরত ঈসা (আঃ) তাদেরকে লা'নত দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক তাদেরকে শুকরে পরিণত করলেন। ইহুদীদের সর্দার ইহুদা এ দৃশ্য দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হলো এবং হযরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো এবং তাঁকে হত্যা করতে তারা অগ্রসর হলো।

কিন্তু আল্লাহ পাক জিব্রাঈল (আঃ)-কে প্রেরণ করে তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নিলেন এবং তাঁর স্থলে ইহুদীদের প্রেরিত ব্যক্তি তাইতিয়ানুযকে তাঁর আকৃতি দিলেন এবং তারা ঈসা (আঃ) মনে করে তাকেই হত্যা করলো।

وَمَكَرَ اللّٰهُ

অর্থাৎ তারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল তাই আল্লাহ পাক তাঁকে রক্ষা করার কৌশল গ্রহণ করেছেন। আর একথা সর্বজন-বিদিত ও স্বীকৃত যে আল্লাহ পাক সর্বোত্তম কৌশলী। তাঁর কৌশলকে বাতিল করার শক্তি কারো নেই।

এ পর্যায়ে আল্লাহ পাকের কৌশল হলো, তিনি হযরত ঈসা (আঃ)-এর হত্যার ষড়যন্ত্রকারীদের অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছেন এবং হযরত ঈসা (আঃ)-কে আসমানে তুলে নিয়েছেন।

إِذْ قَالَ اللَّهُ
يَٰعِيسَىٰٓ إِنِّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَىٰ
يَوْمِ الْقِيَٰمَةِ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝٥٥ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا
شَدِيدًا فِى الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّٰصِرِينَ ۝٥٦ وَأَمَّا
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَ
اللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّٰلِمِينَ ۝٥٧ ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْءَايَٰتِ وَ
الذِّكْرِ الْحَكِيمِ ۝٥٨

তরজমা

(৫৫) এবং যখন আল্লাহ পাক (হযরত ঈসা (আঃ)-কে) বলেছিলেন, হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমাকে ওফাত প্রদান করব এবং আমার নিকট তোমাকে তুলে নেব এবং কাফেরদের নিকট থেকে তোমাকে মুক্ত করব এবং তোমার অনুসারীগণকে কেয়ামত পর্যন্ত কাফেরদের উপর ক্ষমতাসীন করব, আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতএব, তোমাদের যেসব বিষয়ে মতভেদ ছিল তৎ সমূহের মীমাংসা করব।

(৫৬) যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তথা কাফের হয়েছে তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে কঠিন শাস্তি প্রদান করব এবং তাদের কোন সহায়ক নেই।

(৫৭) আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে আল্লাহ পাক তাদের পুরোপুরি ভাবে প্রতিফল প্রদান করবেন আর আল্লাহ পাক অত্যাচারীদেরকে আদৌ পছন্দ করেন না।

(৫৮) (হে রসূল!) আমি আপনার নিকট নিদর্শন সমূহ এবং বিজ্ঞানসম্মত নসীহত বর্ণনা করছি।

তফসীরুল কোরআন

হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের ঘোষণা

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রহঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন যে, এর অর্থ হলো আল্লাহ্ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-কে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ হে ঈসা! আমি তোমাকে আমার নিকট উঠিয়ে আনব। হাসান, কালবী এবং এবনে জরীর এ আয়াতের এ অর্থ বলেছেন যে, আমি তোমাকে মৃত্যু ব্যতীত নিজের কাছে নিয়ে আসব। আল্লামা বগবী এ আয়াতের দু'টি অর্থ লিখেছেন (১) আমি তোমাকে পুরোপুরি নিজের কাছে ডেকে আনব। দুশমন তোমার কোন ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হবে না। (২) আমি তোমাকে নিজের দায়িত্বে নিয়ে নেব।

এবনে জরীর রবি এবনে আনাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে مُتَوَفِّيكَ শব্দের অর্থ হলো আমি তোমাকে নিদ্রামগ্ন করব যেমন কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহার করেছেনঃ

هُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ بِالَّيْلِ

(অর্থাৎ তিনিই সেই আল্লাহ্ যিনি তোমাদেরকে রাত্রিকালে নিদ্রামগ্ন করেন।) এর তাৎপর্য হবে এই যে, হযরত ঈসা (আঃ) নিদ্রিত হয়েছিলেন, আল্লাহ্ পাক নিদ্রামগ্ন অবস্থায় তাঁকে আসমানে তুলে নিয়েছিলেন। অতএব,

اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ

এর অর্থ হবে হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমাকে নিদ্রামগ্ন করবো এবং নিদ্রামগ্ন অবস্থায় তোমাকে আমার নিকট নিয়ে আসব।

কোন কোন আলেমের মতে এ শব্দটির অর্থ মৃত্যু। হযরত আলী (রাঃ)-এর বর্ণনা মোতাবেক হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাসের একটি অভিমত হলো এই যে اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ অর্থ হলো নিশ্চয় আমি তোমাকে মৃত্যুমুখে পতিত করব। আল্লামা বগবী লিখেছেন তবে আয়াতের অর্থ দুভাবে হবে। ওয়াহাব এবনে মোনাব্বাহর বক্তব্য মোতাবেক হযরত ঈসা (আঃ)-কে তিন ঘন্টার জন্যে আল্লাহ্ পাক মৃত্যু মুখে পতিত করেছিলেন। অতঃপর নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। মোহাম্মদ এবনে এছহাক বর্ণনা করেছেন আল্লাহর পাক ঈসা (আঃ)-কে সাত ঘন্টা মৃত রেখে অতঃপর জীবিত করেন ও নিজের কাছে উঠিয়ে নেন। এবনে জরীর ওয়াহাব এবনে

মোনাব্বাহর একথাটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ আসমান থেকে অবতীর্ণ করার পর ইহুদীদের হাত থেকে রক্ষা করে জীবনের পূর্ণ সময় অতিবাহিত করার পর আমি তোমাকে মৃত্যু দেব। আর এর পূর্বে তোমাকে আমার নিজের কাছে উঠিয়ে নেব।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ শপথ সেই আল্লাহর যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, অদূর ভবিষ্যতে মরয়ম পুত্র সুবিচারক হিসেবে তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন। ক্রুশ চিহ্নকে ছিঁড়ে ফেলবেন, শুকর হত্যা করবেন এবং জিযিয়া বা অমুসলিম কর তুলে দেবেন এবং অর্থ সম্পদ বিতরণ করবেন কিন্তু কেউ গ্রহণকারী হবে না। অবস্থা এত চরম পর্যায়ে পৌছবে যে, আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে একটি সেজদা দেয়া পৃথিবী এবং পৃথিবীর সব কিছু থেকে উত্তম মনে করা হবে। এই হাদীস বর্ণনা করার পর হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, যদি তোমরা একথার সত্যতার প্রমাণ পেতে চাও তবে এ আয়াত পাঠ কর-

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ الاية

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত অন্য একখানি হাদীসে এই বিবরণ রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে যখন তোমাদের মাঝে ময়রম পুত্র অবতরণ করবেন? এবং তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য থেকেই হবে। মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এতটুকু সংযোজিত হয়েছে যে, উষ্ট্রীগুলো ছেড়ে দেয়া হবে এবং যখন উষ্ট্রীগুলোর উপর আরোহণ করে কেউ দ্রুত গমন করবে না। পরস্পরের শত্রুতা এবং হিংসা থাকবে না। মানুষকে অর্থ সম্পদ গ্রহণের জন্যে ডাকা হবে কিন্তু কেউ গ্রহণ করতে রাজী হবে না।

আল্লামা বগবী (রহঃ) হযরত আবু হোরায়রার (রাঃ) বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত ঈসা (আঃ)-এর অবতীর্ণ হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন যে সেই আমলে ইসলাম ব্যতীত আর সব ধর্ম বিলুপ্ত হবে এবং দজ্জালকেও ধ্বংস করা হবে। ঈসা (আঃ) চল্লিশ বছর পৃথিবীতে অবস্থান করবেন। এরপর তাঁর মৃত্যু হবে এবং মুসলমানগণ তাঁর নামাযে জানাযা আদায় করবেন।

আল্লামা এবনে জওজী (রঃ) কেতাবুল ওফায় হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে ওমরের (রাঃ) একটি বর্ণনার উল্লেখ করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ মরয়ম পুত্র ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। বিবাহ

করবেন। তাঁর সন্তান-সন্ততি হবে। তিনি ৪৫ বছর পৃথিবীতে অবস্থান করবেন। এরপর তাঁর মৃত্যু হবে এবং আমার সাথে আমার কবরেই তাঁকে দাফন করা হবে। আমি এবং মরয়ম পুত্র ঈসা (আঃ) একই কবরে আবু বকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ)-এর মধ্যে থাকব।

হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা হক্বের উপর থাকবে এবং জেহাদ করতে থাকবে আর কেয়ামত পর্যন্ত তারা জয়ী থাকবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেছেন, অবশেষে মরয়ম পুত্র ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন তখন মুসলমানদের আমীর তাঁকে বলবে আমাদের নামাযে ইমামতি করুন। তিনি বলবেনঃ "না, তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের ইমাম হবে"। হযরত ঈসা (আঃ) একথা এজন্যে বলবেন যে, আল্লাহ পাক এ উম্মতকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। (মুসলিম শরীফ)

মে'রাজের বিবরণে রয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মে'রাজের সফরে ঈসা (আঃ)-কে দ্বিতীয় আসমানে দেখেছিলেন। (বোখারী ও মুসলিম)

وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

অর্থাৎ হে ঈসা! আমি তোমাকে কাফেরদের সংসর্গ থেকে পবিত্র রাখবো অর্থাৎ তাদের থেকে তোমাকে দূরে রাখবো।

وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ

অর্থাৎ (হে ঈসা!) যারা তোমার অনুসরণ করবে আমি তাদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী করে রাখবো। সর্বদা তাদের প্রভাব অব্যাহত থাকবে।

ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ

অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ) এবং তাঁর অনুসারীগণ এবং তোমাদের সকলকে আল্লাহ পাকের দরবারে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

অতএব,

فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ

দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে যে মতভেদ রয়েছে তার মীমাংসা করবো। আর সে মীমাংসা কি হবে তার বিবরণ রয়েছে পরবর্তী আয়াতে। এরশাদ হয়েছে ঃ

فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا الاية

অর্থাৎ যারা কাফের হবে, যারা অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হবে তাদেরকে কঠিন ও কঠোর শাস্তি দেব দুনিয়া ও আখেরাতে। দুনিয়াতে নিহত হওয়া, বন্দী হওয়া, জিযিয়া আদায় করা এবং এমনি অপমানজনক শাস্তি আর আখেরাতে দোযখের শাস্তি।

وَمَا لَهُمْ مِنْ نّٰصِرِيْنَ

আর এ শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে এমন কোন সাহায্যকারী তারা পাবে না। অতএব শাস্তি তাদের অবধারিত।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

আর যারা আল্লাহর রসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং সেই ঈমান অনুযায়ী নেক আমল করবে আল্লাহ পাক তাদের নেক আমলের বিনিময় পুরোপুরি দান করবেন। তাদের জীবনের যাবতীয় সৎ কর্মের পূর্ণ বিনিময় লাভে তারা ধন্য হবে।

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ

আর আল্লাহ পাক জালেমদেরকে পছন্দ করেন না। জালেম তথা কাফেরদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না অর্থাৎ তাদের প্রতি দয়া করেন না। আর যখন দয়া থেকে তারা বঞ্চিত হয় তখন শাস্তি তাদের অবধারিত হয়। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে মরয়ম (আঃ) ১৩ বছর বয়সে ঈসা (আঃ)-কে গর্ভে ধারণ করেন। তাঁর নিকট ওহী আসা যখন আরম্ভ হয় তখন তার বয়স ছিল ৩০ বছর। তাঁর বয়স যখন ৩৩ বছর তখন পবিত্র মাহে রমজানে শবে কদরে আল্লাহ পাক তাঁকে বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে আসমানে তুলে নেন।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, তিনি শুধু তিন বছরই নবুওয়্যতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁকে আসমানে তুলে নেয়ার পরও তাঁর মাতা হযরত মরয়ম (আঃ) ছয় বছর জীবিত ছিলেন।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে ইহুদীরা যখন হযরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করলো তখন আল্লাহ পাক তাঁকে রক্ষা করলেন, তাঁর আকৃতির একজন মানুষকে তাঁর স্থলে রেখে দেয়া হলো, তারা তাকেই হত্যা করলো এবং ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখলো, তখন তাঁর মাতা মরয়ম (আঃ) এবং একজন মহিলা যে হযরত ঈসা (আঃ)-এর দোয়ার বরকতে আরোগ্য লাভ করেছিল তারা ক্রন্দন করতে লাগলো। তখন হঠাৎ ঈসা (আঃ) স্বশরীরে সেখানে আত্মপ্রকাশ করলেন এবং বললেন তোমরা কেন ক্রন্দন করছো? আল্লাহ পাক তো আমাকে এখান থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং আমি কোন দুঃখ পাইনি। আর যে ব্যক্তিকে আমার স্থলে

ফাঁসি দেয়া হয়েছে আল্লাহ্ পাক তাকে আমার আকৃতি দিয়েছেন। এরপর তিনি অদৃশ্য হয়ে যান। এর সাত দিন পর আল্লাহ্ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-কে আদেশ দেন তুমি মরয়মের নিকট গমন করে তাকে সান্ত্বনা প্রদান কর, সে শোকে মুহ্যমান রয়েছে। সেখানে তোমার সাহায্যকারীদেরকে একত্রিত কর এবং মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবানের জন্যে তাদের প্রতি দায়িত্ব অর্পণ কর। আল্লাহর হুকুমে হযরত ঈসা (আঃ) পাহাড়ের উপর অবতরণ করেন। তখন পাহাড়টি নূরে পরিপূর্ণ হয়েছিল। হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীগণ তাঁর নিকট একত্রিত হয়েছিল এবং তিনি তাদেরকে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ দেন। তাঁর যে অনুসারীকে যে এলাকার হেদায়েতের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন পরদিন সকালে সে ব্যক্তি ঐ এলাকার ভাষায় কথা বলতে সক্ষম হয়।[১]

ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ

অর্থাৎ (হে রসূল!) এ পর্যন্ত আপনার নিকট ঈসা (আঃ), জাকারিয়া (আঃ) এবং মরয়ম (আঃ) সহ সকলের ঘটনাবলী বর্ণনা করেছি। কেননা আপনি আমার রসূল। আপনার নবুওয়্যতের প্রমাণ স্বরূপই পূর্বকালের এ সমস্ত সত্য ঘটনা আপনাকে জানানো হয়েছে। অথচ ইতোপূর্বে আপনি এ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। বণী ইসরাঈলের তত্ত্বজ্ঞানী আলেমগণ খুব ভাল ভাবেই জানতো যে এই সমস্ত ঘটনা অন্য কারো জানার কথা নয়; বরং শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকে যার নিকট ওহী নাযিল হয় তিনিই শুধু এসব কথা জানতে পারেন। যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, তাই আল্লাহ পাক পৃথিবীর অন্য জাতি সমূহের এবং তাদের নিকট প্রেরিত নবীগণের ঘটনাবলী সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অবগত করেছেন।

وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ

অর্থাৎ পূর্বে বর্ণিত ঘটনাবলী শুধু যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের প্রমাণ তাই নয়; বরং এ ঘটনাবলী অত্যন্ত হেকমতপূর্ণ এবং আল্লাহর মা'রেফোত হাসিল করার মাধ্যমও বটে।[২]

তফসীরকারগণ লিখেছেন এ ঘটনাবলীর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে পবিত্র কোরআন অন্যান্য আসমানী কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী। দ্বিতীয়তঃ চিরন্তন বিজয় শুধু মুসলমানদের জন্যেই নির্ধারিত। তৃতীয়তঃ হযরত ঈসা (আঃ) যখন শেষ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা ২৫১
২। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৩৮

যমানায় পৃথিবীতে আগমন করবেন তখন মুসলমানগণই হবে তাঁর সাহায্যকারী। ইহুদীরা তাঁর সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য করেছে, খৃষ্টানরা তাঁর সম্পর্ক বাড়াবাড়ি করেছে কিন্তু মুসলমানগণ তাঁর সম্পর্কে সঠিক কথা বলেছেন। অর্থাৎ তিনি হলেন আল্লাহর বন্দা এবং রসূল।[১]

হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ পাক ইহুদীদের জুলুম থেকে রক্ষা করে আসমানে তুলে নিয়েছেন আর এটি কোন অসম্ভব কাজও নয়। কেননা আল্লাহ পাক তাঁকে এই অলৌকিক ক্ষমতা দিয়েছিলেন যে তিনি "কুম বিইজনিল্লাহ" বলে ডাকলে কবর থেকে মৃত ব্যক্তি বের হয়ে আসত, তাঁকে যদি আল্লাহ পাক আসমানে উঠিয়ে নেন তাতে আশ্চর্যের কি রয়েছে?

এতদ্ব্যতীত, আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনেও এরশাদ করেছেন যে ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ পাক জিব্রাইল (আঃ) দ্বারা সাহায্য করেছেন। অধিকাংশ সময় জিব্রাঈল (আঃ) ঈসা (আঃ)-এর কাছে থাকতেন। জিব্রাঈল (আঃ)-এর একটি ডানা সমগ্র মানব জাতির জন্যে যথেষ্ট। এমনি অবস্থায় হামলায় উদ্যত ইহুদীদের থেকে হযরত ঈসা (আঃ)-কে রক্ষা করা জিব্রাঈল (আঃ)-এর পক্ষে আদৌ কঠিন নয়।[২]

মূলত আল্লাহ পাক যা ইচ্ছা করেন তাই হয়, আর আল্লাহ পাক যখন হযরত ঈসা (আঃ)-কে হেফাজত করতে চেয়েছেন তখন কাজটি আর কঠিন রয়নি, কেননা আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি সর্বশক্তিমান।

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ
مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا
تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا
جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَ
نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل
لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦١﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا
مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾
فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾

১ খোলাসাতুত তাফাসীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৫৫
২। তফসীরে কবীর খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৭০

তরজমা

(৫৯) নিশ্চয় আল্লাহ পাকের নিকট ঈসা (আঃ)-এর দৃষ্টান্ত আদম (আঃ)-এরই ন্যায়। তিনি আদম (আঃ)-কে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করলেন, তৎপর তাঁকে বললেন 'হও', তাতেই আদম হয়ে গেল।

(৬০) (হে রসূল!) এ সত্য আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে, অতএব যারা সন্দিহান রয়েছে আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

(৬১) (হে রসূল!) আপনার নিকট জ্ঞান আসার পরও যারা এ বিষয়ে আপনার সাথে তর্ক করে তাদেরকে বলে দিন এস! আমরা আহবান করি আমাদের সন্তানদেরকে ও তোমাদের সন্তানদেরকে, আমাদের নারীদেরকে এবং তোমাদের নারীদেরকে, আমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের নিজেদেরকে। অতঃপর আল্লাহ পাকের দরবারে সকলে বিনীত নিবেদন করি যেন মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ পাকের লা'নত হয়।

(৬২) নিশ্চয় এ সমস্ত সত্য ঘটনা, আর আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক পরম শক্তিশালী, সূক্ষ্মজ্ঞানী।

(৬৩) অতঃপর যদি তারা ফিরে যায় তবে আল্লাহ পাক অশান্তি সৃষ্টিকারীদের খুব ভাল ভাবেই জানেন।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

নাযরানবাসী খৃষ্টান দল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়। নাযরানী খৃষ্টানদের এ দলে লোক সংখ্যা ছিল ৬০ তন্মধ্যে ১৪ জন ছিল তাদের নেতা। তারা হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণা পেশ করে। তারা বলে হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনি একথাতো স্বীকার করেন যে কোন মানুষই ঈসা (আঃ)-এর পিতা ছিল না। তাহলে তার পিতা হলেন স্বয়ং আল্লাহ পাক (নাউজুবিল্লাহ মিন জালেক)। তখন এ আয়াত সমূহ নাযিল হয়।[১]

খৃষ্টানদের ভ্রান্ত মতের জবাব দানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর আদেশের অপেক্ষ করলেন। কেননা তিনি সাধারণতঃ নিজের তরফ থেকে কিছুই বলতেন না, বরং আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যা ওহী আসত তাই মানুষকে শুনিয়ে দিতেন।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৭৪
তফসীরে মাজহারী-খন্ড-২ পৃষ্ঠা ২৫২
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৬৪

আলোচ্য আয়াতের মর্ম হচ্ছে এই, পিতা ব্যতীত কোন মানুষের জন্ম হতে পারেনা একথা চির সত্য নয়; বরং তোমরা লক্ষ্য কর আদম (আঃ)-এর পিতা-মাতা কেউ ছিল না। আল্লাহ পাক মাটি দ্বারা তাঁকে তৈরী করেছেন এবং "হও" বলে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি হয়ে গেছেন। যদি বিনা পিতা মাতায়ও মানুষের জন্ম হতে পারে আর ঈসা (আঃ)-এর পিতা না থাকে তবে আশ্চর্যের কি রয়েছে? যদি পিতা থাকা একান্ত জরুরী মনে করা হয় তবে ঈসা (আঃ)-এর পিতৃত্ব নির্ধারণের পূর্বে আদম (আঃ)-এর পিতৃত্ব নির্ধারণের জন্যে তোমরা কেন সচেষ্ট হও না? বরং প্রকৃত অবস্থা এই যে আল্লাহ পাক মহান স্রষ্টা, তিনি বিনা পিতা-মাতায় সৃষ্টি করেছেন আদম (আঃ)-কে এবং শুধু পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করেছেন ঈসা (আঃ)-কে আর পিতা-মাতার মাধ্যমে সমগ্র মানব জাতিকে। কেননা আল্লাহ পাকের নিকট কোন কিছুই অসম্ভব নয়।

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ

অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ পাক যে ঘোষণা দিয়েছেন তাই চিরন্তন সত্য, এ তথ্য সন্দেহাতীত।

মোবাহেলার আহবান

فَمَنْ حَاجَّكَ

অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে এ সুস্পষ্ট নির্ভুল তথ্য পরিবেশনের পর যদি খৃষ্টানরা এ বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হতে চায় তবে তাদের জবাব বিতর্কে নয়; বরং কোন বিষয়ের হক্ব ও বাতিল বা সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্যে উভয় পক্ষের স্ব-স্ব পরিবারবর্গ নিয়ে উন্মুক্ত ময়দানে হাযির হওয়া এবং আল্লাহ পাকের দরবারে বিনীতভাবে নিবেদন করা যে হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী তার প্রতি তোমার লা'নত হোক। সত্যের জয় হোক, মিথ্যা নিপাত যাক, মিথ্যাবাদী ধ্বংস হোক।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন নাযরানবাসী খৃষ্টানদেরকে মোবাহেলার আহবান জানালেন তখন তারা পরস্পর পরামর্শের জন্যে সময় চাইল এবং পর দিন হাযির হওয়ার কথা বলল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সময় দিলেন। তাদের পরামর্শ বৈঠক হলো। তাদের লাট পাদরী ছিল আকেব। সে উপস্থিত খৃষ্টানদেরকে সম্বোধন করে বললো হে খৃষ্টানগণ! (হযরত) মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) নিঃসন্দেহে আল্লাহর রসূল এবং তিনি ঈসা (আঃ) সম্পর্কে যে কথা বলেছেন তা ধ্রুব সত্য। এমন অবস্থায় যদি তোমরা তাঁর সঙ্গে মোবাহেলা কর তবে তাঁর অভিশাপে তোমরা সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

কোন নবীর সঙ্গে মোবাহেলা করার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। অতএব, তাঁর সঙ্গে মোবাহেলার বদলে সন্ধি করে দেশে ফিরে যাওয়াই আমাদের পক্ষে শ্রেয় হবে বলে মনে করি।

এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পরদিন তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ)-কে কোলে নিয়ে এবং ইমাম হাসান (আঃ)-এর হাত ধরে বের হয়ে এসেছেন। তাঁর পেছনে ছিলেন হযরত ফাতেমা (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ)। তাঁদের নূরানী চেহারা দেখে খৃষ্টানদের ধর্মযাজক তাদেরকে বললোঃ আমি এমন সব চেহারা দেখছি যারা দোয়া করলে পর্বত পর্যন্ত তার স্থান থেকে সরে যাবে। অতএব, তাদের সঙ্গে মোবাহেলা করে নিজেদেরকে ধ্বংস করোনা। যদি তা কর তবে ধরা-পৃষ্ঠে একজন খৃষ্টানও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

অতঃপর তারা আরয করলো যে আমরা আপনার সঙ্গে মোবাহেলা করবো না, বরং বছরে দু' হাজার জোড়া পোশাক আদায় করবো।

এক হাজার সফর মাসে এবং আর এক হাজার রজব মাসে। অবশেষে এ শর্তে সন্ধি করে তারা বিদায় গ্রহণ করে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এরশাদ করেন, যদি তারা মোবাহেলা করতো তবে তাদের এলাকা অগ্নি স্তূপে পরিণত হতো। তাদের চেহারা শুকর বানরে পরিণত হতো এবং এক বছরের মধ্যে সমস্ত খৃষ্টান শেষ হয়ে যেতো।[১]

إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ

অর্থাৎ ঈসা (আঃ) এবং মরয়ম (আঃ)-এর যে ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে তা সবই ধ্রুব সত্য। অতএব, তাঁর প্রতি বিশ্বাস করা কল্যাণকামী মানুষের কর্তব্য।

وَمَا مِنْ اِلٰهٍ

আর আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি পরাক্রমশালী এবং বিজ্ঞানময়, তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজ হেকমতপূর্ণ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না, তাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করেও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা; বরং সমাজ জীবনে অশান্তি সৃষ্টি করে আল্লাহ পাক তাদের অন্যায় আচরণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত রয়েছেন। আর তাদের শাস্তি অবধারিত।

কেননা, যারা পৌত্তলিকতা এবং নাফরমানীর প্রচার করে অন্যায় অসত্যকে তুলে ধরে, মানুষকে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন থেকে বিরত রাখে, আল্লাহ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা- ২৫৬

পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করে তারাই সমাজ ও জাতীয় জীবনে অশান্তি সৃষ্টিকারী। আর যারা অশান্তি সৃষ্টিকারী তাদের শাস্তি অবধারিত। যারা সমাজ ও জাতীয় জীবনে শান্তি বিঘ্নিত করে তারা মানবতা বিরোধী কাজ করে, তারা প্রকৃত অর্থে মানবতার দুশমন। আর তারা যে অশান্তি সৃষ্টিকারী বা শান্তির দুশমন, এ বিষয়ে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল।

فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِالْمُفْسِدِيْنَ

"আর নিশ্চয় আল্লাহ পাক অশান্তি সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে অবগত"।

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, একথা সর্বজন বিদিত যে আল্লাহ পাক এক, তাঁর কোন শরীক নাই, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি বিজ্ঞানময়, তিনি সকলের পরিণাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। আর ঈসা (আঃ) আল্লাহ পাকের বন্দা এবং রসূল কিন্তু একথা যারা মেনে নিতে প্রস্তুত হয় না তারাই শান্তির দুশমন, তারাই মানবতার দুশমন, অতএব তাদের শাস্তি হবে কঠিন।

قُلْ يٰۤاَهْلَ
الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ
اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا
اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا
مُسْلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْۤ اِبْرٰهِيْمَ وَمَآ
اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٥﴾
هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ
تُحَآجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ
لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾ مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّ
لٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٦٧﴾

তরজমা

(৬৪) (হে রসূল!) আপনি বলে দিন হে আহলে কেতাব! যে কথায় আমরা এবং তোমরা একমত সে কথার দিকে এস, যেন আমরা এক আল্লাহ পাক ভিন্ন আর আরো বন্দেগী না করি, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক না করি। আর আমাদের কেউ

যেন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ না করি। পরে যদি তারা ফিরে যায় তবে তোমরা বলে দাও (হে কাফেররা) তোমরা সাক্ষী থাক যে আমরা মুসলমান, আমরা আল্লাহ পাকের নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ কারী।

(৬৫) হে আহলে কেতাব! কেন ইব্রাহীম (আঃ) সম্বন্ধে কলহ করছো? অথচ তৌরাত ও ইঞ্জিল তাঁর পরই অবতীর্ণ হয়েছে (পূর্বে নয়)। এরপরও কি তোমরা বুঝতে পার না?

(৬৬) হ্যাঁ তোমরা সে সব লোক, যারা যে বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞান ছিল সে বিষয়ে তোমরা কলহ দ্বন্দ্বে লিপ্ত কিন্তু যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞানই নাই সে বিষয়ে তোমরা কেন তর্ক করছো? এবং আল্লাহ পাক জানেন যা তোমরা জান না।

(৬৭) ইব্রাহীম ইহুদীও ছিলেন না, খৃষ্টানও ছিলেন না কিন্তু তিনি একজন সত্যিকার নেককার মুসলমান ছিলেন এবং তিনি কোন দিনই মুশরেক ছিলেন না।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন নাযরানের খৃষ্টানদেরকে যখন তওহীদের দলিল প্রমাণ বোঝানো হলো তখন তারা সত্য গ্রহণে প্রস্তুত হলোনা। এ পর্যায়ে তাদেরকে মোবাহেলার জন্যে আহবান করা হলো কিন্তু তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বদ দোয়ায় ধ্বংস হয়ে যাবে- এই ভয়ে তাতেও রাজী হলোনা, তখন তারা জিযিয়া বা অমুসলিম কর আদায়ের অঙ্গীকার করলো। অথচ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একান্ত আকাঙ্খা ছিল তারা যেন ইসলাম কবুল করে। তাই আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করলেন। এতদ্বারা যেন আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে একথা এরশাদ করেছেন- হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! তাদের সঙ্গে কথার ভঙ্গী পরিবর্তন করুন এবং নূন্যতম কথায় তাদেরকে একাত্ম হওয়ার আহবান জানান যে হে আহলে কিতাব! এস আমরা এক আল্লাহর এবাদত করি, তওহীদের প্রতি বিশ্বাস করি, আল্লাহ ব্যতীত আর কারো সম্মুখে মাথা নত না করি। এক আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্ম সমর্পণ করি, আল্লাহ ব্যতীত আর কারো এবাদত না করি।

আলোচ্য আয়াতে "আহলাল কিতাব" বলে যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে তারা কারা? এ প্রশ্নের জবাবে তফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন–

(১) আহলে কিতাব বলতে নাযরানের খৃষ্টানদের বোঝানো হয়েছে,

(২) মদীনার ইহুদী সম্প্রদায় এবং

(৩) নাযরানের খৃষ্টান ও মদীনার ইহুদী উভয়ে।

ইমাম রাজী (রহঃ) আলোচ্য আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে আরও একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ইহুদীরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলেছিল আমরা শুধু চাই যেভাবে খৃষ্টানরা ঈসা (আঃ)-কে প্রভু মনে করে আমরাও

যেন আপনাকে তাই মনে করি। আর খৃষ্টানরা বলেছে যেভাবে ইহুদীরা ওজায়ের (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে আমরাও আপনাকে সে মর্যাদা দিতে চাই। তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করেন।[১] যার অর্থ হলো হে আহলে কিতাব! আস আমরা এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো বন্দেগী না করি।

আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করি, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন কিছুর নিকট উন্নত শির নত না করি, আল্লাহর নাফরমানীতে একে অন্যের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ না করি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যদি তারা সত্য গ্রহণে বিমুখ হয় তবে হে মুসলমান! তোমরা তাদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দাও যে তোমরা সাক্ষী থাক যে আমরা নিশ্চয় মুসলমান, আমরা এক আল্লাহর প্রতি পূর্ণ অনুগত।[২]

يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِىٓ إِبْرَٰهِيمَ

শানে নুযুল

ইহুদীরা এ মিথ্যা দাবী করতো যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন আমাদের দলভুক্ত আর খৃষ্টানরাও এ ভিত্তিহীন দাবী করতো যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাদের এই সমস্ত ভিত্তিহীন কথার প্রতিবাদ করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে নাযরানের খৃষ্টানদের নিকট মদীনার ইহুদী ধর্মজাযকরা হাযির হয় এবং স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্মুখে তারা কলহ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। তাদের প্রত্যেক দলই হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে তাদের নিজেদের লোক বলে দাবী করে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে হে ইহুদীরা! তোমরা কিভাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে এই মিথ্যা কথা বল? কেননা যখন তিনি এসেছিলেন দুনিয়াতে তখন মূসা (আঃ) ছিলেন না। তওরাতও নাযিল হয়নি, বরং মূসা (আঃ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অনেক পরে এসেছেন। এমনিভাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে খৃষ্টানদের দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা, কেননা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কয়েক হাজার বছর পর হযরত ঈসা (আঃ) দুনিয়াতে আসেন।

নবুওয়্যতের যুগ

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগ থেকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর যুগ ছিল এক হাজার একশত তেতাল্লিশ বছর পর। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর যুগ থেকে হযরত মূসা (আঃ)

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৮, পৃষ্ঠা- ১৮
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৫

-এর যুগ হলো ৫৭৫ বছর পর। আর হযরত মূসা (আঃ)-এর যুগ থেকে হযরত দাউদ (আঃ)-এর যুগ পর্যন্ত ৫৭৮ বছর।

হযরত দাউদ (আঃ)-এর যুগ থেকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর যুগ হলো ১০৫৩ বছর। হযরত ঈসা (আঃ) থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগ পর্যন্ত ৬০০ বছর।

অতএব, সর্বপ্রথম নবী হযরত আদম (আঃ) থেকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগ পর্যন্ত ৫,২৪৯ বছর অতিবাহিত হয়, আর এটিই নবুওয়্যতের যুগ।[১]

নবুওয়্যতের যুগের এ হিসাব দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে ইহুদী এবং খৃষ্টানদের করা উক্তিগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং নিতান্ত কল্পনাপ্রসূত। তাই আল্লাহ্ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞাসা করেছেন ঃ

فَلِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ

অর্থাৎ হে ইহুদী ও নাসারা সম্প্রদায়! কেন তোমরা এমন বিষয়ে তর্কে লিপ্ত হও যে সম্পর্কে তোমাদের কোন জ্ঞানই নাই। তোমাদের কর্তব্য ছিল তোমরা যে বিষয়ে জান না তা এক আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করা যিনি সব কিছু সম্পর্কে অবগত। আর মনে রেখ আল্লাহ্ পাক সব কিছু জানেন, তোমরা কিছুই জান না।

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا

অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ইহুদীও ছিলেন না খৃষ্টানও ছিলেন না, তিনি ছিলেন খাঁটি মুসলমান। আর তিনি মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তিনি ছিলেন শেরক ও কুফরের নাপাকী থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

আল্লামা তানতাবী তাঁর রচিত বিখ্যাত তফসীর গ্রন্থ তফসীরুল জাওয়াহেরে লিখেছেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ৫৭৫ বছর পর তওরাত নাযিল হয়েছে। এমনিভাবে ইব্রাহীম (আঃ) এবং ঈসা (আঃ)-এর মধ্যে ব্যবধান হলো ২৩০৭ বছরের। অথচ তওরাত নাযিল হওয়ার পরই ইহুদী ইজম এবং ইঞ্জিল নাযিল হওয়ার পর খৃষ্টান ইজমের উৎপত্তি। অতএব, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে ইহুদী ও খৃষ্টানদের বিতর্ক সম্পূর্ণ মূর্খতা প্রসূত এবং ভিত্তিহীন।

১। মলফুজাতে হযরত খাজা ওসমান হারুনী (রঃ)

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرٰهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهٰذَا
النَّبِيُّ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا ۗ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾
وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ ۗ
وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٩﴾ يٰٓأَهْلَ
الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٧٠﴾
يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبٰطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ
وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧١﴾ وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوا بِالَّذِيٓ
أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ اٰمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوٓا اٰخِرَهُۥ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَا تُؤْمِنُوٓا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدٰى
هُدَى اللّٰهِ أَن يُؤْتٰىٓ أَحَدٌ مِّثْلَ مَآ أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَآجُّوكُمْ
عِندَ رَبِّكُمْ ۗ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۗ
وَاللّٰهُ وٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

তরজমা

(৬৮) নিশ্চয় সেসব লোকই ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকটতর যারা তাঁর অনুসরণ করেছে এবং এই নবী (হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এবং যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আর আল্লাহ্ পাক মোমেনদের অভিভাবক।

(৬৯) আহলে কিতাবের মধ্যে একদলের ইচ্ছা এই যে তারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে পারে কিন্তু তারা শুধু নিজেদেরকে পথভ্রষ্ট করছে অথচ তারা তা উপলব্ধি করেনা।

(৭০) হে আহলে কিতাব! কেন আল্লাহ্ পাকের নির্দশন সমূহকে অস্বীকার কর? অথচ তোমরাই তার সাক্ষী।

(৭১) হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর? এবং সত্যকে গোপন কর? অথচ তোমরা জান।

(৭২) এবং আহলে কিতাবের একদল বলে যে মোমেনদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি দিনের প্রারম্ভে বিশ্বাস কর এবং দিনের শেষে অবিশ্বাস কর। হয়তো (এভাবে) মোমেনগণ তাদের বিশ্বাস থেকে ফিরে যাবে।

(৭৩) যারা তোমাদের দ্বীনের অনুসরণ করে তাদের ব্যতীত আর কাউকেই বিশ্বাস করোনা। (হে রসূল!) আপনি বলে দিন যে আল্লাহ পাকের প্রদর্শিত পথই সুপথ। তোমরা যা পেয়েছিলে অন্য কেউ কেন তা পেল অথবা তোমাদের প্রতিপালকের সমীপে কেন প্রাধান্য লাভ করলো এটিই তোমাদের হিংসার কারণ। (হে রসূল!) আপনি বলে দিন নিশ্চয় দান অনুগ্রহ গৌরব একমাত্র আল্লাহর হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে তা দান করে থাকেন এবং আল্লাহ পাক উদার, মহাজ্ঞানী।

(৭৪) তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই বিশেষ রহমত দান করে থাকেন এবং আল্লাহ পাক মহান অনুগ্রহশীল।

তফসীরুল কোরআন

যেহেতু ইহুদী ও খৃষ্টানরা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে মিথ্যা দাবী করতো তার প্রতিবাদ করা হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতে। আর আলোচ্য আয়াতে একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে কারা ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকটতর, এরশাদ হয়েছে যারা ইব্রাহীম (আঃ)-এর আদর্শের অনুসারী তারাই তাঁর নিকটতর। আর এই নবী অর্থাৎ আমাদের প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর প্রতি যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারাই হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর আদর্শের নিকটতর। হে ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়! তোমাদের সাথে ইব্রাহীম (আঃ)-এর কোন সম্পর্ক নাই, কেননা ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন তওহীদের আহবায়ক, তিনি ছিলেন আল্লাহ পাকের প্রতি একান্ত অনুগত, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্ম-সমর্পিত, আল্লাহর প্রতি তাঁর আত্মসমর্পণ নযীর বিহীন, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের তিনি ছিলেন জীবন্ত প্রতীক, তাঁর জীবনের প্রতিটি ঘটনা আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের বিস্ময়কর নমুনা। কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক তাঁর সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন-

اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗۤ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

যখন ইব্রাহীম (আঃ)-কে তাঁর প্রতিপালক বললেন তুমি আনুগত্য প্রকাশ কর তখন তিনি বললেন, "আমি আনুগত্য প্রকাশ করেছি বিশ্ব প্রতিপালকে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রতি"। এ আনুগত্যের কঠিন পরীক্ষা হয়েছিল তাঁর প্রাণাধিক পুত্র ইসমাঈলকে জবেহ করার ব্যাপারে। তিনি স্বপ্নযোগে যে আদেশ পেয়েছিলেন তা পালনে এতটুকু বিলম্ব করেননি, বরং পুত্রকে জবেহ করতে উদ্দত হয়েছেন অকুণ্ঠ চিত্তে। তাই পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর আনুগত্যের কথা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ

অর্থাৎ যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) উভয়ে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করল। আলোচ্য আয়াতে 'আসলামা' শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ, কেননা এর অর্থ হলো হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর হুকুম পালনার্থে স্বীয় প্রাণাধিক পুত্রকে জবেহ করতে উদ্দত হয়েছেন। আর পুত্র ইসমাঈল স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে জবাই হতে প্রস্তুত হয়েছেন, আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের এমনি দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। অতএব, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কে তাদেরই যারা আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে।

আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন–

انا دعاء ابينا ابراهيم عليه السلام

অর্থাৎ আমি আমার পিতামহ ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া স্বরূপ। কা'বা শরীফের ভিত্তি স্থাপনের সময় তিনি যে তিনটি দোয়া করেছিলেন তন্মধ্যে সর্বশেষ দোয়াটি ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে।

পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারায় এরশাদ হয়েছে-

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ- اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ-

"হে পরওয়ারদেগার! তাদের মধ্যে এমন একজন রসূল প্রেরণ কর যিনি তাদের নিকট পাঠ করবেন তোমার আয়াত সমূহ এবং তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা শেখাবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন। নিশ্চয় তুমি প্রবল ক্ষমতাশালী ও মহাজ্ঞানী"।

এতদ্ব্যতীত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথাও এরশাদ করেছেনঃ প্রত্যেক পয়গম্বরেরই পয়গম্বরদের মধ্যে কোন না কোন একজন অভিভাবক রয়েছেন। আমার অভিভাবক আমার পিতামহ ইব্রাহীম (আঃ) এবং আমার বন্ধু আমার প্রতিপালক। যাহোক, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের। আর এ কারণেই আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী মুসলমানদেরকে হিজবে ইব্রাহীম বলে আখ্যা দিয়েছেন। এ সম্পর্কে আল্লামা বগবী কালবীর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন জাফর এবনে আবু তালেব (রাঃ) কয়েকজন সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে মক্কা শরীফ থেকে আবিসিনিয়া হিজরত করলেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করলেন। এরপর বদরের যুদ্ধ হলো, এতে মক্কার অনেক কাফেরের মৃত্যু হলো এবং অনেকেই বন্দী হলো। তখন মক্কাবাসী পরামর্শ করলো এ মর্মে, যে সব মুসলমান আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছেন বদরের রণাঙ্গণে মৃতদের প্রতিশোধ তাদের থেকে নিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে তারা দু' ব্যক্তিকে কোরায়শদের প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো এবং কিছু অর্থ সম্পদ একত্রিত করে নাজ্জাশীর জন্যে উপঢৌকন হিসেবে প্রেরণ করলো। কোরায়শের তরফ থেকে আমর এবনুল আস এবং আম্মারা এবনে আবি মইতকে এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হলো। এ দু' ব্যক্তি আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হলো এবং আরয করলো আমাদের সম্প্রদায় আপনার প্রতি সন্তুষ্ট এবং আপনার কল্যাণকামী। আমাদের সম্প্রদায় আমাদেরকে এজন্যে আপনার নিকট প্রেরণ করেছে যেন আমরা আপনাকে সে সব লোক সম্পর্কে সতর্ক করি যারা আমাদের দেশ থেকে পালিয়ে আপনার দেশে এসেছে। তারা এমন একজন লোকের সাথী যিনি আল্লাহর রসূল হওয়ার দাবী করেছেন। আমরা তাদের প্রতি এমন অত্যাচার করেছি যে তারা একটি ঘাঁটিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে এবং তাদেরই কিছু লোক আপনার দেশে হাযির হয়েছে। তারা এসেছে যেন আপনাদের ধর্মকে বিনষ্ট করে, আপনার সরকরের এবং প্রজা সাধারণের ক্ষতি করে। এজন্যে আপনি তাদের থেকে খুব সতর্ক থাকবেন এবং তাদেরকে আমাদের হাতে সোপর্দ করে দিন যাতে করে তারা আপনার কোন ক্ষতি সাধন না করতে পারে। আমাদের একথার প্রমাণ আপনি লক্ষ্য করতে পারেন যে তারা যখন আপনার দরবারে আসবে তখন দেখবেন তারা আপনাকে সেজদা করবে না। আর অন্যদের ন্যায় আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে না। অতঃপর নাজ্জাশী হযরত জাফর (রাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীদের তলব করলো। হযরত জাফর (রাঃ) ও তাঁর সঙ্গীরা শাহী দরবারে পৌঁছে উচ্চস্বরে চিৎকার করে বললেনঃ আল্লাহর দল উপস্থিত হওয়ার অনুমতি চায়। নাজ্জাসী বললোঃ যে উচ্চস্বরে চিৎকার করে কথা বলেছে তাকে বল একথাগুলো সে যেন দ্বিতীয় বার বলে। হযরত জাফর (রাঃ) তাই করলেন। তখন নাজ্জাশী বললো, জ্বী হ্যাঁ আল্লাহর অনুমতিক্রমে প্রবেশ কর। আমর এবনুল আস তার সাথীকে বললোঃ দেখলে কি কথাবার্তা হলো, যাহোক হযরত জাফর (রাঃ) ভেতরে প্রবেশ করলেন কিন্তু তারা নাজ্জাশীকে সেজদা করলেন না। আমর এবনুল আস তখন নাজ্জাশীকে বললো, দেখলেন? তারা অহংকারের কারণে আপনাকে সেজদা করেনি। নাজ্জাশী সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলো কি কারণে আপনারা আমাকে সেজদা করলেন না এবং কেন সেভাবে দরবারে আদব রক্ষা করলেন না যেভাবে আগন্তুকদের করতে হয়? সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিলেন,

আমরা শুধু সেই আল্লাহকে সেজদা করি যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং বাদশাহী দান করেছেন। সালামের এ প্রথা আমাদের মধ্যে তখন বিদ্যমান ছিল যখন মূর্তি পূজা করতাম (যেন আপনাকেও একটি মূর্তি মনে করে সেজদা করতাম) কিন্তু আল্লাহ পাক আমাদের মধ্যে একজন সত্য নবী প্রেরণ করেছেন যিনি আমাদেরকে এভাবে সালাম দেয়ার আদেশ দিয়েছিলেন, যা আল্লাহর পছন্দনীয়। অর্থাৎ সালাম শব্দটি ব্যবহার করা এটি আহলে জান্নাতের সালাম। এ কথোপকথন শ্রবণ করে নাজ্জাশী উপলব্ধি করেছে এটিই হক্ব কথা। আর একথাই রয়েছে তৌরাতে ও ইঞ্জিলে। তখন নাজ্জাশী জিজ্ঞাসা করলো তোমাদের মধ্যে কে উচ্চস্বরে চিৎকার করে প্রবেশের অনুমতি চেয়েছিল? হযরত জাফর (রাঃ) বললেনঃ আমি। এরপর তিনি বললেন এতে কোন সন্দেহ নেই যে আপনি দুনিয়ার বাদশাহদের মধ্যে অন্যতম এবং আপনি আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত, আপনার সম্মুখে অধিক পরিমাণ কথা বলার সমীচিন নয়। আর কারো প্রতি জুলুম করাও অনুচিত। আমি চাই আমার সকল সাথীর পক্ষ থেকে আমি একা কথা বলি। আপনি এই দু'জনকে আদেশ দিন, তাদের একজন যেন কথা বলে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নীরব থেকে আমাদের কথা শ্রবণ করে। একথা শ্রবণ করে আমর এবনুল আস হযরত জাফরকে বললো 'বল'। হযরত জাফর নাজ্জাশীকে বললেন, এ দু'জনকে জিজ্ঞাসা করুন যে আমরা আজাদ না গোলাম? তখন আমর এবনুস আস জবাব দেয়, তোমরা আজাদ এবং সম্মানিত।

নাজ্জাশী বললঃ গোলাম হওয়ার অভিযোগ থেকে রেহাই পেলে। হযরত জাফর (রাঃ) বললেন, তাকে জিজ্ঞাসা করুন আমরা কি অন্যায়ভাবে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করেছি? যার খুনের বদলা আমাদের থেকে নিতে হবে। আমর বললঃ না। এক ফোটা রক্তও তারা প্রবাহিত করেনি। জাফর (রাঃ) বললেনঃ আমরা কি কারো অর্থ সম্পদ হরণ করেছি যা আদায় করা আমাদের কর্তব্য? নাজ্জাশী বললঃ যদি তোমাদের দায়িত্বে কারো অর্থ-সম্পদ থাকে তা আমি আদায় করব। আমর বললঃ না, তাদের কাছে কেউ কোন অর্থ-সম্পদ পাবে না। নাজ্জাশী বলল, তাহলে তাদের কাছে তোমাদের কি দাবী রয়েছে? আমর বলল, আমরা এবং তারা একই ধর্মাবলম্বী ছিলাম। আমাদের পূর্ব পুরুষের ধর্ম কিন্তু তারা সে ধর্ম পরিত্যাগ করেছে এবং নতুন ধর্মের অনুসারী হয়েছে, এজন্যে আমাদের সম্প্রদায় আমাদেরকে আপনার নিকট প্রেরণ করেছে, যেন আপনি তাদেরকে আমাদের হাতে সোপর্দ করে দেন। তখন নাজ্জাশী বললঃ আমাকে সঠিক বল, পূর্বে যে ধর্মের অনুসারী তোমরা ছিলে তা কি ছিল আর এখন যে ধর্মের অনুসারী হয়েছে তা কি? হযরত জাফর (রাঃ) বললেন, আমরা ইতোপূর্বে যে ধর্মের অনুসারী ছিলাম তা ছিল শয়তানী ধর্ম। আমরা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করতাম, পাথর পূজা করতাম আর এখন যে ধর্মাবলম্বন করেছি

তা হলো আল্লাহর দ্বীন ইসলাম। আল্লাহ পাকের নিকট থেকে তাঁর প্রিয় রসূল এ ধর্ম নিয়ে এসেছেন এবং আল্লাহর তরফ থেকে একটি কিতাবও এসেছে যেমন মরয়ম পুত্র কিতাব নিয়ে এসেছিলেন। এই কিতাব সেই কিতাবেরই অনুরূপ। নাজ্জাশী বললো, তুমি অনেক বড় কথা বলেছো, বিনম্র থাক। এরপর নাজ্জাশীর আদেশে খৃষ্টান ধর্মযাজকরা একত্রিত হয়। নাজ্জাশী তাদেরকে বলে আমি সেই খোদার শপথ করে বলছি যিনি ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ইঞ্জিল নাযিল করেছিলেন, তোমরা আসমানী কিতাবে একথা কি পেয়েছ যে ঈসা এবং কেয়ামতের মধ্যে কোন নবী প্রেরিত হবেন? ধর্মযাজকগণ জবাব দিলেন অবশ্যই এমন হবে, আল্লাহ সাক্ষী! ঈসা (আঃ) আমাদেরকে এ সুসংবাদ দিয়েছেন আর তিনি একথাও বলে গেছেন যারা সেই নবীর প্রতি ঈমান আনবে তারা আমার প্রতি ঈমান এনেছে বলে বিবেচিত হবে। আর যারা তাঁকে অস্বীকার করবে তারা আমাকেও অস্বীকার করেছে বলে মনে করা হবে। তখন নাজ্জাশী জাফর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলো যিনি নবী হিসেবে আগমন করেছেন তিনি কি কাজের আদেশ দেন? হযরত জাফর (রাঃ) জবাব দিলেনঃ তিনি আল্লাহর কিতাব আমাদের নিকট পাঠ করেন, ভালো কাজের নির্দেশ দেন, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখেন, প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখার নির্দেশ দেন, এতিমদের প্রতি দয়া করার আদেশ দেন আর এ শিক্ষা দেন যে, আমরা যেন শুধু এক আল্লাহর বন্দেগী করি যাঁর কোন শরীক নাই।

এরপর নাজ্জাশী বললোঃ যে কালাম তিনি তোমাদের নিকট পাঠ করেন তা আমাকে শোনাও। হযরত জাফর (রাঃ) তখন সূরায়ে আনকাবুত এবং সূরায়ে রুম তেলাওয়াত করলেন যা শ্রবণ করে নাজ্জাশী এবং তার সাথীদের নয়ন থেকে অশ্রু ঝরতে লাগলো। নাজ্জাশীর একজন সাথী বললো– এই পবিত্র কালাম আরও শুনতে চাই। হযরত জাফর (রাঃ) তখন সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করলেন। এ অবস্থা দেখে আমর এবনুল আস চাইলো নাজ্জাশীকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে রাগান্বিত করে তুলতে, তাই সে বললো এরা ঈসা (আঃ)-এর মাতাকে গালি দেয়। তখন নাজ্জাশী হযরত জাফর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলো, তোমরা ঈসা এবং তাঁর মাতা সম্পর্কে কি বল? তখন হযরত জাফর (রাঃ) পবিত্র কোরআনের সূরা মরয়ম তেলাওয়াত করেন। যখন মরয়ম এবং ঈসা (আঃ)-এর বয়ান পর্যন্ত তিনি পৌঁছলেন তখন নাজ্জাশী বললো- ঈসা (আঃ) এ বর্ণনা থেকে এতটুকুও কমও নন, বেশীও নন। তখন নাজ্জাশী হযরত জাফর (রাঃ) এবং তাঁর সাথী মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললো তোমরা আমার দেশে নিঃশঙ্ক চিত্তে বাস কর, যে তোমাদেরকে গালি দেবে বা কষ্ট দেবে সে তার শাস্তি ভোগ করবে। তোমরা সুখে থাক, কোন প্রকার দুশ্চিন্তা

করোনা। ইব্রাহীম (আঃ)-এর যারা মিল্লাতভুক্ত তাদের আজ কোন অসুবিধা নেই। আমর নাজ্জাশীকে জিজ্ঞাসা করলো- হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দল কোন্‌টি? নাজ্জাশী বললোঃ মুসলমানদের এই দল এবং তাঁদের সেই নবী যাঁর নিকট থেকে তাঁরা এসেছেন এবং যারা তাঁর অনুসারী কিন্তু পৌত্তলিকরা একথা মানতে রাজী হলো না; বরং নিজেদেরকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অনুসারী বলে দাবী করলো। তখন নাজ্জাশী সে অর্থ সম্পদ যা উপঢৌকন হিসেবে নিয়ে এসেছিল তা ফেরত দিয়ে বললোঃ এগুলো তোমাদের উপঢৌকন নয়; বরং ঘুষ। এগুলো নিয়ে যাও। আল্লাহ্ পাক আমাকে বাদশাহাত দান করেছেন। হযরত জাফর (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমরা এরপর অত্যন্ত সম্মানিত মেহমান হিসেবে সময় অতিবাহিত করি। এদিকে ঐ একই দিনে আল্লাহ্ পাক মদীনা মুনাওয়্যারায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দ্বীন সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন।

وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ

শানে নুযুল

হযরত মাআয এবনে জাবাল (রাঃ) এবং হযরত হোযায়ফা এবনে ইয়ামান (রাঃ) এবং হযরত আমর এবনে ইয়াসের (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামকে ইহুদীরা তাদের ধর্ম গ্রহণের আহবান জানালে এ আয়াতে নাযিল হয়। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ হে মোমেনগণ! আহলে কিতাবের একটি দল তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে প্রয়াসী হয় অথচ তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার এ অপচেষ্টার শোচনীয় পরিণাম তাদেরকেই ভোগ করতে হবে। আর তারা তা বোঝে না। মুসলমানদেরকে তো আল্লাহ্ পক তাদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করবেন কিন্তু তারা তাদের অন্যায়ের শাস্তি অবশ্যই ভোগ করবে।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ

অর্থাৎ হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা আল্লাহ্ পাকের নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার কর? সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে তওরাত এবং ইঞ্জিলে এবং তাঁর গুণবলীর বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে কিন্তু এতদসত্ত্বেও তোমরা তা অস্বীকার কর। অথবা এর অর্থ হলো- হে আহলে কিতাব! তোমরা কেন পবিত্র কোরআনের আয়াতকে অস্বীকার কর?

وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ

অথচ তোমরা পরস্পর গোপনে নিজেরা স্বীকার স্বীকার কর যে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সত্য নবী, তাঁর বর্ণনা রয়েছে তওরাত ও ইঞ্জিলে। অথবা এর অর্থ হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোযেজা

বা অলৌকিক ক্ষমতা দেখেও তোমরা উপলব্ধি কর যে তিনি সত্য নবী কিন্তু তবু কেন সত্যকে অস্বীকার কর?

يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَٰطِلِ

হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা হক্বের সঙ্গে বাতিলকে মিশ্রিত কর, কেননা তারা তওরাতের আয়াতের সঙ্গে নিজেদের মনগড়া কথাও লিপিবদ্ধ রাখতো।

বলাবাহুল্য পার্থিব লোভ-লালসা চরিতার্থ করার হীন উদ্দেশ্যেই তা করতো শুধু তাই নয়, বরং তারা সত্যকে গোপন করতো।

وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ

(আর তোমরা সত্যকে গোপন কর) কেননা তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলী যা তওরাতে বর্ণিত হয়েছে তা তারা গোপন করতো।

وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

অর্থাৎ এসব অন্যায় তোমরা জেনে শুনেই করছো, তোমরা ইচ্ছা করেই করছো। সত্যকে গোপন করা এবং নিজেদের তৈরী করা কথা তওরাতে অন্তর্ভুক্ত করা, আসমানী গ্রন্থকে বিক্রি করা- এ সমস্ত গর্হিত কাজ তোমরা বুঝে শুনেই করছো (অতএব তোমাদের শাস্তি অবধারিত)।

শানে নুযুল

وَقَالَت طَّآئِفَةٌ

তফসীরকারগণ লিখেছেন, ইহুদী এবং মুনাফেকরা পরস্পর এ পরামর্শ করতোঃ চলো আমরা দ্বীনের প্রারম্ভে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করি এবং সারাদিন মুসলমান হিসেবে জীবন-যাপন করি, দিনের শেষে অর্থাৎ বিকালে ইসলাম পরিত্যাগ করি, এভাবে সাধারণ মানুষ মনে করবে যে ইসলামে কোন ত্রুটি অবশ্যই আছে যে কারণে ধর্মজ্ঞানে পারদর্শী লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেও পরে ছেড়ে দেয়? এভাবে ইসলামের অব্যাহত গতিকে প্রতিরোধ করার অপচেষ্টা করেছিল মদীনা শরীফের তদানীন্তন ইহুদীরা। তাই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে তাদের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন এই পরামর্শ করেছিলো আবদুল্লাহ এবনুদ্দায়ীফ আদী এবনে যায়ীদ এবং হারেস এবনে আওফ গং, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৭১
তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৬৯

ইহুদীদের ষড়যন্ত্র

আল্লামা বগবী (রঃ) হযরত হাসান বসরীর (রঃ) কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে এ পরামর্শ করেছিল খায়বর এবং তার উপকণ্ঠের ১২ ইহুদী ধর্মযাজক। আল্লাহ্ পাক তাদের এ ষড়যন্ত্র পবিত্র কোরআনের ভাষায় ফাঁস করে দিয়েছেন।

وَلَا تُؤْمِنُوْٓا

অর্থাৎ ইহুদীরা সকালে ইসলাম গ্রহণ করে বিকেলে তা পরিত্যাগ করার ষড়যন্ত্র করতো, তারা তখন একে অন্যকে সাবধান করে বলতো দেখ, হুশিয়ার! তোমরা কিন্তু সত্যি সত্যিই মুসলমান হয়ে যেয়ো না। আর তোমরা যে খাঁটি ইহুদী একথা ক্ষণিকের জন্যেও ভুলে যেয়ো না। তোমরা মূলতঃ তাদের কথা মেনে চলবে যারা তোমাদের ধর্মের অনুসারী। তোমাদের নিজেদের ধর্মের জন্যেই নিজেদেরকে মুসলমান বলে জাহির করবে, যাতে করে দুর্বল চিত্তের লোকেরা ইসলাম পরিত্যাগ করে এবং পূর্ব পুরুষের ধর্মে ফিরে আসে। আল্লাহ্ পাক তাদের জবাবে এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ اِنَّ الْهُدٰى

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, হেদায়েতে আল্লাহর দান, এ দানে আল্লাহ্ পাক যাকে ধন্য করেন সে-ই হেদায়েত লাভ করে, তোমরা শত চেষ্টা করেও তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। আল্লাহ্ পাক তাঁর নূর দ্বারা যার অন্তর আলোকিত করবেন তাকে পথভ্রষ্ট করার ক্ষমতা কারোই নেই। অতএব, এ নতুন ষড়যন্ত্র করে ইসলামের অগ্রগতিকে প্রতিরোধ করা যাবে না।

اَنْ يُّؤْتٰٓى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ

অর্থাৎ তোমরা যে ষড়যন্ত্র করছো তা শুধু এ হিংসার কারণে যে তোমাদেরকে যেভাবে আসমানী কিতাব এবং হেকমত দান করা হয়েছিল, এমনিভাবে অন্যদেরকে আজ তা দান করা হচ্ছে (বণী ইসরাঈলকে কিতাব ও হেকমত দান করা হলে তারা আল্লাহ্র অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়। অবশেষে আল্লাহ্ পাকের কোপগ্রস্ত হয় তারা এবং আল্লাহ্ পাক তাঁর নেয়ামতকে বণী ইসরাঈল থেকে তুলে বণী ইসমাঈলকে দান করেন, কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর)। অথবা তোমরা এজন্যে হিংসা করছো যে, কেয়ামতের দিন অন্যরা আল্লাহ্র দানে ধন্য হবে আর তোমরা শাস্তি ভোগ করবে। কেননা তারা হেদায়েত প্রাপ্ত আর তোমরা পথভ্রষ্ট। অতএব তোমাদের এ সত্য উপলব্ধি করা দরকার যে হেদায়েত শুধু আল্লাহর দান। ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এই দান থেকে কাউকে

বঞ্চিত করা যাবে না। দ্বিতীয়তঃ তোমাদের এ ষড়যন্ত্র হলো হিংসা প্রসূত কিন্তু হিংসা করে তোমরা মুসলমানদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ

(হে রসূল!) আপনি জানিয়ে দিন যে দান, ফজিলত শুধু আল্লাহর হাতে তোমাদের হাতে নয়। আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে ফজিলত দান করে থাকেন। যেমন তিনি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথীগণকে এ ফজিলত দান করেছেন।

এ পর্যায়ে ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন যে ইহুদীদের এ ষড়যন্ত্র ছিল অত্যন্ত গোপনীয়। তাদের বিশেষ কুচক্রীরা ব্যতীত আর কেউ এ সম্পর্কে অবগত ছিল না। যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে খবর দিলেন তখন তাদের ষড়যন্ত্র শুধু যে ব্যর্থ হলো তাই নয়; বরং এটি হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একটি মোযেজা বা তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। দ্বিতীয়ত যখন আল্লাহ পাক কোরআনে করীমের মাধ্যমে এ ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিলেন তখন তারা এভাবে আর মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে সক্ষম হয়নি।[১]

"ফজল" শব্দের ব্যাখ্যা

তফসীরকারগণ লিখেছেন আলোচ্য আয়াতে 'ফজল' শব্দটির ব্যাখ্যা হলো রহমত ও নবুওয়্যত, আসমানী কিতাব প্রাপ্তি, অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়া, জনপ্রিয়তা অর্জন করা, মানুষের ভালবাসা লাভ ইত্যাদি।[১]

এ আয়াতে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন আল্লাহ পাক তাঁর রহমত, নবুওয়্যতের দানে যাকে ইচ্ছা তাকেই ধন্য করেন। এ ব্যাপারে কারো হিংসা, পরশ্রীকাতরতা অহেতুক, অনর্থক স্বয়ং হিংসুকের জন্যই তা ক্ষতিকর। এতদ্ব্যতীত সত্যের সন্ধান পাওয়া তথা হেদায়েত লাভ করাও আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত এবং দান। যারা এ দানে ধন্য হয় তাদের হেদায়েতের এ নেয়ামতের জন্যে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা একান্ত কর্তব্য।

বর্তমান যুগে ইসলামের রিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী তাঁর বিখ্যাত তফসীরে মাজেদীতে লিখেছেন যে ইহুদীরা শুধু যে ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমনি ষড়যন্ত্র করেছে তাই নয়, বরং দ্বাদশ শতাব্দীতে যখন স্পেনে ইসলামী

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৯৫
খোলাসাতুত তাফাসীর খন্ড- ১, পৃষ্ঠা-২৬০

হুকুমত কায়েম ছিল তখন ইসলামী রাষ্ট্রের ক্ষতি সাধনের লক্ষ্যে অনেক ইহুদী তাদের ধর্ম যাজকদের ইঙ্গিতে নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করে এবং ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

মাওলানা দরিয়াবাদী এ পর্যায়ে আরও লিখেছেন বর্তমান যুগে অনেক ইহুদী খৃষ্টান প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান জীবনাদর্শ সম্পর্কে তাঁর পূতঃ পবিত্র জীবন সম্পর্কে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছে এবং করছে। প্রকাশ্যে তারা তাদের উদারতার পরিচয় দিচ্ছে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্মের কথা ঘোষণা করছে, কিন্তু এর পাশাপাশি এ সমস্ত গ্রন্থ রচনায় তাদের যে ষড়যন্ত্র রয়েছে তাও প্রকাশিত হচ্ছে। কেননা প্রথমে তারা তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ কিন্তু একটু পরেই তাঁর বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করতে দ্বিধাবোধ করে না।[১]

এভাবে তারা বর্তমান যুগে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে।

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ
بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ إِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا
يُؤَدِّهٖٓ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ۗ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا
لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْأُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ
وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾ بَلٰى مَنْ أَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَإِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ
الْمُتَّقِيْنَ ﴿٧٦﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا
قَلِيْلًا أُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا
يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿٧٧﴾

তরজমা

(৭৫) এবং আহলে কিতাবের মধ্যে একদল আছে যদি তুমি তাদের নিকট বিপুল ধন-দৌলত আমানত রাখ তবে তারা তা তোমার নিকট ফেরত দেবে আবার তাদের মধ্যে এমনও লোক আছে যদি তুমি তাদের নিকট একটি স্বর্ণ মুদ্রাও রাখ তবে তা আদায় করবে না। যে পর্যন্ত না তুমি তার পেছনে লেগে থাক সে ফেরত

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৪০

দেবে না আর তা এ কারণে যে তারা বলে যে আমাদের এ মূর্খদের জন্যে কোন দায়িত্ব নাই। এবং তারা আল্লাহ্ পাকের প্রতিও মিথ্যা কথা আরোপ করে অথচ তারা জানে যে তাদের কথা মিথ্যা।

(৭৬) হ্যাঁ, যারা স্বীয় ওয়াদা পূর্ণ করে এবং আল্লাহ্ পাককে ভয় করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক খোদাভীরু লোকদের পছন্দ করেন।

(৭৭) নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ পাকের ওয়াদা ও শপথকে তুচ্ছ মূল্যের পরিবর্তে বিক্রয় করে পরকালে তাদের কোনই অংশ নাই এবং আল্লাহ্ পাক তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং (রহমতের দৃষ্টিতে) তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদীদের সেসব অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যা দ্বীনদারী সংক্রান্ত ছিল। ধর্মীয় ব্যাপারে তাদের ষড়যন্ত্র ছলচাতুরী প্রকাশিত হয়েছিল। আর আলোচ্য আয়াতে তাদের দুনিয়াদারীর ব্যাপারে সততার যে অভাব রয়েছে তার কথা বর্ণিত হয়েছে। যারা সামান্য টাকা-পয়সার ব্যাপারেও বেঈমানী এবং খেয়ানতের পরিচয় দেয় তারা দ্বীনের ব্যাপারে যদি খেয়ানত করে তবে তা আদৌ বিস্ময়কর নয়।

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ আহ্‌লে কিতাবের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যাদের কাছে অগাধ ধন-সম্পদ আমানত রাখলে তারা তা সঠিক ভাবে ফেরত দেয় যেমন হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে সালাম (রাঃ) এবং তাঁর ন্যায় আরও অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তি, যারা মনে প্রাণে ইসলাম কবুল করেছেন।

শানে নুযুল

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে সালামের (রাঃ) নিকট অনেক স্বর্ণালংকার আমানত রাখে। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে সালাম (রাঃ) তার সে আমানত সঠিকভাবে আদায় করেন। তখন এ আয়াত হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে সালাম (রাঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়।[১]

وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ

পক্ষান্তরে, এ আহ্‌লে কিতাবের মধ্যে এমনও লোক রয়েছে যাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও অপকীর্তি এবং দুর্নীতির অন্ত নেই। তাদের নিকট একটি স্বর্ণ

১। তফসীরে মাজহারী,খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৭২

মুদ্রা আমানত রাখলে তারা তাও ফেরত দেয় না। আল্লামা বগবী (রহঃ) লিখেছেন একজন কোরায়শী ব্যক্তি ফোখাস এবনে আজুরা নামক এক ইহুদীর নিকট একটি স্বর্ণমুদ্রা আমানত করেছিল। সে ঐ স্বর্ণমুদ্রাটির ব্যাপারেও বেঈমানী করেছে।

إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا

তারা এত নীচ যে সামান্য একটি মুদ্রার জন্যেও বিশ্বাসঘাতকতা করতে তাদের বাধে না যতক্ষণ না তুমি তাদের মাথার উপর দাড়িয়ে থাক, এর কারণ এই যে ইহুদীরা মনে করতো যারা আহলে কিতাব নয় তাদের অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না। আরবদের মাল আমাদের জন্যে হালাল; বরং ইহুদীদের ধারণা হলো যারা ইহুদী নয় তাদের উপর জুলুম করা অবৈধ নয়। তাদের ধন-সম্পদ আত্মসাত করা অন্যায় নয়, কাজেই ভিন্নধর্মীদের আমানতে খেয়ামত করায় কোন দোষ নেই। বিশেষ করে যে সব আরব তাদের পূর্ব পুরুষের ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম কবুল করেছে তাদের অর্থ-সম্পদ হ্রাস করায় কোন দোষ হওয়ার কথা নয়। কেননা ইহুদীদের মতে আল্লাহ্ পাক অন্যদের অর্থ সম্পদ তাদের জন্যে হালাল করে দিয়েছেন। আর এভাবে তারা আল্লাহ্ পাকের নামে মিথ্যা আরোপ করতো।

সঠিক নিয়ত সম্পর্কে একটি বিস্ময়কর ঘটনা

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) বোখারী শরীফে সংকলিত একটি ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ বণী ইসরাঈলে এক ব্যক্তি ছিল যে অন্য এক ব্যক্তি থেকে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ঋণ চেয়েছিল। সে ব্যক্তি বললো তুমি যে স্বর্ণমুদ্রা ঋণ গ্রহণ করবে তার জন্যে একজন সাক্ষী হাযির কর। লোকটি বলল, আমার জন্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ পাকই যথেষ্ট। লোকটি বললঃ তুমি যে টাকা ফেরত দেবে এজন্যে জামিন দরকার, সে বললো আমার জামিন স্বয়ং আল্লাহ্ পাক। একথার উপর সন্তুষ্ট হয়ে সে ব্যক্তি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে ঋণ দিল। এরপর সে সামুদ্রিক পথে বিদেশ সফরে চলে গেল। কাজ শেষ হলে সে দেশে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে সমুদ্র তীরে হাযির হলো এবং জাহাজের অপেক্ষা করতে লাগলো কিন্তু কোন জাহাজের ব্যবস্থা হলোনা। এদিকে ঋণ আদায়ের সময় এসে গেল, সে অত্যন্ত ব্যাকুল চিত্তে দিন অতিবাহিত করে কিন্তু জাহাজের কোন ব্যবস্থাই হলোনা। তখন ঐ ব্যক্তি একটি কাষ্ঠ খণ্ড হাতে নিয়ে তার মাঝখানে ফাঁকা করলো এবং এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা এবং একটি চিঠি তন্মধ্যে রেখে দিল, এরপর কাষ্ঠ খন্ডটির মুখ বন্ধ করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলো এবং বললো ঃ

হে আল্লাহ! তুমি তো জান আমি শুধু তোমাকে সাক্ষী করে এবং তোমার জামানতে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ঋণ নিয়েছিলাম। কিন্তু আমি সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও সমুদ্র পার হতে পারছি না। তাই বাধ্য হয়ে তোমার প্রতি ভরসা করে এ কাষ্ঠ খণ্ডে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা রেখে সমুদ্রে ফেলে দিচ্ছি। তুমি তাকে তা পৌঁছে দাও। কাষ্ঠ খন্ডটি পানিতে নিমজ্জিত হলো। এরপরও সে অনেক চেষ্টা করলো সমুদ্র পার হতে কিন্তু তার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। এদিকে ঋণ দাতা সমুদ্র তীরে এসে অপেক্ষা করছে যে ঐ ব্যক্তি আজকের তারিখে তার ঋণ শোধ করবে। কিন্তু পুরো দিন অপেক্ষা করার পরও যখন দেখলো কোন জাহাজ আসলো না তখন সে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসার ইচ্ছা করে। এমন সময় সমুদ্র তীরে একটি কাষ্ঠ খণ্ড দেখতে পেয়ে তা তুলে নেয় এই আশায় হয়তো জ্বালানীর কাজে লাগবে। বাড়ীতে পৌঁছে সে কাষ্ঠ খন্ডটি খুলে দেখে তাতে রয়েছে একটি চিঠি ও এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা। কিছুদিন পর সে ব্যক্তি দেশে ফিরলো এবং ঋণ দাতার নিকট তার বিলম্বে হাযির হওয়ার কারণ প্রকাশ করলো। সে বললো, তুমি যে স্বর্ণমুদ্রা আমার নামে প্রেরণ করেছ আল্লাহ পাক তা আমাকে পৌঁছে দিয়েছেন। এখন তুমি সন্তুষ্ট চিত্তে যেতে পার।[১]

বস্তুতঃ মানুষ যখন আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং ভরসা করে তখন আল্লাহ পাকই তাকে সাহায্য করেন। মানুষের নিয়ত যখন সঠিক থাকে আল্লাহ পাক তখন তার সহায় হন।

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ

অঙ্গীকার রক্ষা করা একান্ত কর্তব্য

যেভাবে ইহুদীরা মনে করতো যে মোমেনদের অর্থ-সম্পদ আত্মসাত করলে তাদেরকে পাকড়াও করা হবে না; বরং কথা সম্পূর্ণ তার উল্টো, কেননা অঙ্গীকার মানুষের সঙ্গে হোক কি আল্লাহর সঙ্গে তা রক্ষা করা একান্ত কর্তব্য। যারা অঙ্গীকার রক্ষা করে আমানতদারী ও ঈমানদারীর পরিচয় দেয় এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, পবিত্র কোরআনের প্রতি ঈমান আনে, তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করে আল্লাহর নাফরমানী এবং খেয়ানত থেকে আত্মরক্ষা করে আল্লাহ পাক এমন মুত্তাকী লোকদেরকে পছন্দ করেন। অতএব, এতে একথা প্রমাণিত হয় যে এ জীবন ও পর জীবনের সাফল্য নির্ভর করছে সম্পূর্ণভাবে তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনের

১। তফসীর এবনে কাসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৭২

ওপর। অঙ্গীকার রক্ষা করা এবং সকল কতর্ব্য যথাযথভাবে পালন করা এবং যাবতীয় মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা হলো তাকওয়া পরহেযগারীর পূর্বশর্ত।

মুনাফেকের আলামত

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত এবং বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যার মধ্যে চারটি আলামত থাকবে সে মুনাফেক হবে (১) আমানতে খেয়ানত করা, (২) মিথ্যা কথা বলা, (৩) অঙ্গীকার রক্ষা না করা, (৪) ঝগড়া হলে অহেতুক কথা বার্তা বলা।

যার মধ্যে উপরোক্ত চারিত্রিক দোষ সমূহের যে কোন একটি থাকবে সে তা বর্জন না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফেকের একটি আলামত থাকবে।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মুনাফেকের তিনটি আলামত রয়েছে (১) যখন কথা বলবে তখন সে মিথ্যা কথা বলবে, (২) অঙ্গীকার করলে তা ভঙ্গ করবে এবং (৩) আমানত রাখা হলে খেয়ানত করবে।

إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ

অর্থাৎ আহলে কিতাবের মধ্যে যারা পার্থিব হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে আল্লাহ পাকের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে নিজেদের পরস্পরের মধ্যকার শপথ ও অঙ্গীকার বিনষ্ট করে, পারস্পরিক আচার ব্যবহারও সঠিকভাবে করেনা, আল্লাহ পাকের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারও রক্ষা করেনা, অর্থ সম্পদের লোভ-লালসায় মত্ত হয়ে শরীয়তের বিধান ও আসমানী কিতাবে পরিবর্তন করতেও ভয় করেনা তাদের সম্পর্কে এ আয়াতে কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

أُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ

(এমন লোকদের জন্যে আখেরাতে কোন অংশ নেই।)

হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে পরের হক্ব গ্রাস করে আল্লাহ পাক তার জন্যে দোযখ অবধারিত করেন এবং জান্নাত তার জন্যে হারাম করে দেন। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো ইয়া রসূলাল্লাহ! যদি সামান্য জিনিস হয় তবু কি এ শাস্তি হবে? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ যদি একটি বৃক্ষের সামান্য ডাল হয় তবু এ শাস্তি হবে শুধু তাই নয়, বরং

কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, তাদের দিকে কেয়ামতের দিন রহমতের নজরে দৃষ্টিপাত করবেন না, আর তাদেরকে পবিত্রও করবেন না।

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তাদের গুনাহ্ মাফ করবেন না, আর তাদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। হযরত আবু জর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তিন ব্যক্তির সঙ্গে আল্লাহ্ পাক কেয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করবেন না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন না, আর তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন আলোচ্য আয়াতখানি তিনবার তেলাওয়াত করেন। হযরত আবু জর (রাঃ) আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! এই ব্যর্থ লোক কারা? তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ (১) যারা অহংকারের কারণে পোশাককে টাখনুর নীচে পরিধান করে (২) যে ব্যক্তি কোন মানুষের উপকার করে পরে সেই উপকারের কথা স্মরণ করিয়ে তাকে বিব্রত করে (৩) মিথ্যা শপথ করে যে নিজের দ্রব্য-সম্ভার বিক্রয় করে। (মুসলিম শরীফ)

বোখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে সংকলিত, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছেঃ তিন ব্যক্তির সঙ্গে আল্লাহ্ পাক কথা বলবেন না (১) যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে বলে যে, আমি এ পণ্যটি এত মূল্যে ক্রয় করেছি অথচ সে কথাটি সত্য নয়, (২) যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ধন-সম্পদ গ্রাস করার জন্যে আছরের পর (যখন বাজারে ক্রেতাদের ভীড় হয় খুব বেশী) মিথ্যা শপথ করে এবং (৩) যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন পূরণের পর অবশিষ্ট পানি কোন পথিককে দান করতে রাজী না হয়, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক তাকে বলবেন, আজকের দিনে আমি তোমার প্রতি দান করা থেকে বিরত থাকব, যেভাবে তুমি তোমার অবশিষ্ট পানি মানুষকে দান করা থেকে বিরত ছিলে।

তেররানী এবং বায়হাকী এ তিন ব্যক্তির পরিচয় হযরত সালমান (রাঃ)-এর বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত করেছেন তা হলো (১) বৃদ্ধ ব্যাভিচারী (২) অহংকারী কাঙ্গাল (৩) যে ব্যক্তি শপথ করে ক্রয়-বিক্রয় করে।[১]

শানে নুযুল

আলোচ্য আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছেঃ বোখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড- ২ পৃষ্ঠা- ২৭৪-৭৭

কোন মুসলমানের অর্থ সম্পদ আত্মসাতের লক্ষ্যে মিথ্যা শপথ করে, আল্লাহ্ পাকের সম্মুখে তাকে এমন অবস্থায় পেশ করা হবে যখন তিনি তার প্রতি অত্যন্ত রাগান্বিত থাকবেন। একথার সত্যায়নে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) যখন এই হাদীস বর্ণনা করলেন তখন হযরত আশআস এবনে কায়েস (রাঃ) ঘরের ভেতর থেকে বের হয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেনঃ আবু আবদুর রহমান তোমাদের নিকট কোন হাদীস বর্ণনা করেছেন? লোকেরা বললোঃ একথা বর্ণনা করেছেন, তখন হযরত আশআস (রাঃ) বললেন এই হাদীস মূলতঃ আমার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। ঘটনা এই, আমার একটি কূপ আমার চাচাতো ভাইয়ের যমীনে ছিল। আমি একথাটি প্রিয়নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরয করলাম, তিনি এরশাদ করলেনঃ তুমি তোমার স্বপক্ষের সাক্ষী উপস্থিত কর, অথবা তার শপথ মেনে নাও। আমি আরয করলামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! সে তো এর উপর শপথ করে নেবে। তখন তিনি এরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের ধন-সম্পদ আত্মসাত করার জন্যে মিথ্যা শপথ করবে, আর জেনে বুঝে সে মিথ্যা কথা বলবে, কেয়ামতের দিন সে আল্লাহ্র দরবারে এমন অবস্থায় হাযির হবে যে, আল্লাহ্ পাক তার প্রতি রাগান্বিত হবেন।

এবনে জরীর একরামার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে কা'ব এবনে আশরাফ, হাই এবনে আখতাব এবং এমনি ধরনের অন্যান্য ইহুদীদের সম্পর্কে, কেননা তৌরাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে তাই কুখ্যাত ইহুদীরা সে গুণাবলী গোপন করত এবং সে স্থলে অন্য কোন কিছু লিপিবদ্ধ করে শপথ করে বলত যে এসব কথাই আল্লাহ্র তরফ থেকে নাযিল হয়েছে এবং এভাবে তারা নিজেদের অনুসারীদের কাছ থেকে অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করতো।

ثَمَنًا قَلِيلًا

অর্থাৎ যারা আমানত আদায়ের বিনিময়ে এবং মিথ্যা শপথের পরিবর্তে সামান্য মূল্য গ্রহণ করে তাদের জন্যে আয়াতে উল্লেখিত শাস্তি রয়েছে। এখানে সামান্য মূল্য বা ثمنا قليلا শব্দের ব্যাখ্যা হলো "দুনিয়ার সম্পদ" তা কম হোক বা বেশী, কেননা জান্নাতের অনন্ত অসীম নেয়ামতের মোকাবেলায় এ পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ সামান্য, নগণ্য, তুচ্ছ।

এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে তফসীরকারগণ আরও একটি বিবরণ পেশ করেছেন। আল ক্বামা তাঁর পিতা হযরত ওয়ায়েলের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে দু' ব্যক্তি হাযির হলো,

একজন হাযারামুতের, আরেকজন কান্দা নামক স্থানের। হাযরানি ব্যক্তি আরয করলো, "ইয়া রসূলাল্লাহ! এ ব্যক্তি আমার জমি ছিনিয়ে নিয়েছে আর কান্দার অধিবাসী লোকটি জবাব দিলো, এই জমিটি আমার আর তা আমার দখলেই রয়েছে, এতে কারো হক্ব নেই, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হাযরানি ব্যক্তিকে বললেন তোমার নিকট সাক্ষী আছে কি? সে বললো 'নেই'। তখন তিনি এরশাদ করলেন, অপর পক্ষ থেকে শপথ নেয়ার অধিকার তোমার রয়েছে। হাযরানি ব্যক্তি আরয করলো, "ইয়া রসূলাল্লাহ! এ ব্যক্তি ফাসেক, সে কোন কিছুকে ভয় করেনা, শপথ গ্রহণেও তার কোন আপত্তি হবে না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, এতদ্ব্যতীত তোমার কোন হক্ব নেই। অতঃপর যখন কান্দার অধিবাসী লোকটি শপথ করতে উদ্দত হলো তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, যদি এ ব্যক্তি অন্যায়ভাবে সম্পদ আত্মসাত করার উদ্দেশ্যে শপথ করে তবে আল্লাহ্ পাকের নিকট তাকে যখন হাযির করা হবে তখন আল্লাহ্ পাক তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না।[১]

আবু দাউদ শরীফে সংকলিত হাদীসে এ দু' ব্যক্তির নামও উল্লেখ হয়েছে। কান্দার অধিবাসী লোকটির নাম ছিলো ইমরুল কায়েস এবনে আবেস আর তার প্রতিপক্ষের নাম ছিলো এবনে আবদান।

বিখ্যাত তফসীরকার ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াত সম্পর্কে লিখেছেন পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে এ আয়াতের সম্পর্ক এই, পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদীরা যে মানুষের অর্থ সম্পদের খেয়ানত করতো তার আলোচনা রয়েছে আর এ আয়াতে রয়েছে ইহুদীরা আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারের ব্যাপারেও খেয়ানত করতো এবং তওরাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যে গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে তা গোপন রাখার চেষ্টা করতো। তাই তাদের জন্যে আলোচ্য আয়াতে কঠোর কঠিন শাস্তির কথা ঘোষিত হয়েছে।[২]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৭৫
২। তফসীরে কবীর খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১০৪

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُنَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَٰبِ لِتَحْسَبُوهُ
مِنَ الْكِتَٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَٰبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ
اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ
هُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَٰبَ
وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن
دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّٰنِيِّۦنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَٰبَ
وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا
الْمَلَٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيِّۦنَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ
أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾

তরজমা

(৭৮) এবং নিশ্চয় তাদের মধ্যে একদল লোক আছে যারা কিতাবকে জিহবা দ্বারা বিকৃত করে। যাতে তোমরা এই ধারণা কর যে তা আল্লাহর কিতাবের অংশ অথচ তা কিতাবের অংশ নয়, আর তারা বলে থাকে যে, তাতো আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে অথচ আদৌ তা আল্লাহর নিকট থেকে আসেনি এবং তারা জেনে শুনে মিথ্যা কথা বলে।

(৭৯) কোন মানুষের জন্যে (কোন অবস্থাতেই) উচিত নয়, যাকে আল্লাহ পাক কিতাব, হেকমত এবং নবুওয়্যত দান করেছেন, পরে সে বলে তোমরা আল্লাহ পাককে পরিত্যাগ করে আমার বন্দেগী কর, বরং সে বলবে তোমরা তোমাদের প্রভূর গোলাম হও, কেননা তোমরাই কিতাব শিক্ষা দান কর এবং তোমরা তা পাঠ কর।

(৮০) এবং তিনি আদেশ দেন না, তোমরা ফেরেশতা ও পয়গম্বরকে পালনকর্তা হিসেবে গ্রহণ কর, তোমাদের মুসলমান হওয়ার পর কি তোমাদেরকে আল্লাহর নাফরমানীর নির্দেশ দেবেন?

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন এ আয়াত নাযিল হয়েছে ইহুদী এবং খৃষ্টানদের সম্পর্কে, কেননা তারা আসমানী কিতাব সমূহের মধ্যে অনেক

পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছিল। তাদের খেয়াল-খুশি মাফিক তারা আসমানী গ্রন্থে সংযোজন করতো এবং বলতো, এসবই আল্লাহর তরফ থেকে অথচ তারা জানতো এসব তাদের মিথ্যা কথা। মদীনাবাসী ইহুদীদের মধ্যে কুখ্যাত কা'ব এবনে আশরাফ, হাই এবনে আখতাব, আবু ইয়াসের, মালেক এবনে দাইফ, সাফনা এবনে আমর গং আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থ পাঠ করার সময় রসনাকে বক্র করে পড়তো এবং নিজেদের মনগড়া কথা সংযোজন করতো। ফলে সাধারণ শ্রোতা তাতে প্রতারিত হতো। তাদের বানোয়াট ভাষাকে আসমানী গ্রন্থের ভাষা মনে করতো। তাদের এ জালিয়াতি এবং প্রতারণা পবিত্র কোরআনের এ আয়াতে ফাঁস করা হয়েছে এবং ঘোষণা করা হয়েছে যে তারা নিজেদের কথাকে আল্লাহর বাণী বলে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে, আর তারা তা জেনে শুনেই করেছে। তৌরাতের যেসব আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে সে আয়াত সমূহকে বিশেষতঃ তারা পরিবর্তন করেছিল।

আল্লাহর কালামে পরিবর্তন অত্যন্ত বড় অপরাধ

পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে তাদের শোচনীয় পরিণাম ঘোষণা করা হয়েছে এভাবে-

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ

অর্থাৎ কঠোর শাস্তি তাদের জন্যে যারা নিজেদের হাতে কিতাব লিপিবদ্ধ করে তৎপর বলে এই কিতাব তো আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।[১]

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الاية

শানে নুযুল

তফসীরকারগণ এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে কয়েকটি বিবরণ পেশ করেছেন।

(১) ইহুদীরা যেমন হযরত ওজায়ের (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে দাবী করে অনুরূপভাবে খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে দাবী করে। তাদের এ মিথ্যা আস্ফালনের জবাবে আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করেন।

(২) বর্ণিত আছে আবু রাফে আল কারযী নামক ইহুদী এবং নাযরান থেকে খৃষ্টানদের যে প্রতিনিধি দল এসেছিল তাদের নেতা উভয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-১০৭

আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলেছিল আপনি কি চান আমরা আপনাকে প্রতিপালক মেনে নেই এবং আপনার বন্দেগী করি? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ মায়াজাল্লাহ! এমন কথা কোন নবীর পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ পাক এজন্যে আমাকে প্রেরণ করেননি আর এমন আদেশও দেননি। এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করার নির্দেশই দিয়েছেন আল্লাহ পাক, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

(৩) এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এ আরযী পেশ করলো- 'ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা যেভাবে একে অন্যকে সালাম প্রদান করি আপনাকেও সেভাবেই সালাম করি, আমরা কি আপনাকে সেজদা করতে পারি না? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এরশাদ করলেনঃ কোন মানুষকে সেজদা করা বৈধ নয়। এক আল্লাহকেই সেজদা করতে হয়। আল্লাহ ব্যতীত আর কোন কিছুকে সেজদা করা যায় না। তোমরা তোমাদের নবীর সম্মান কর এবং হক্বদারের হক্ব সম্পর্কে অবগত হও। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

এবাদতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহ পাক

এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে এবাদত বন্দেগীর যোগ্য একমাত্র আল্লাহ পাক, তিনিই একমাত্র উপাস্য, আল্লাহ ব্যতীত আর কারো সম্মুখে আশরাফুল মাখলুকাত মানব জাতি মাথা নত করতে পারে না। আর আল্লাহ পাক যাকে কিতাব, হেকমত, নবুওয়্যত, জ্ঞান, বিচার বুদ্ধি দান করেন, পয়গম্বরীর মহান দায়িত্ব অর্পণ করেন তাঁর পক্ষে কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয় যে আল্লাহ ব্যতীত তিনি নিজের বা অন্য কারো বন্দেগীর কথা বলবেন, বরং আল্লাহর নবীগণের কাজ হলো মানুষকে তওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি আহবান করা। তারা বলেন তোমরা আল্লাহ ওয়ালা হও, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর, আল্লাহর বিধি-নিষেধ পালন কর, আল্লাহর বিধানের প্রচার কর।

রব্বানীয়্যীন কারা?

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন আলোচ্য আয়াতের রব্বানীয়্যীন শব্দের অর্থ ইসলামী শরীয়তের বিধান সম্পর্কে বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ। আতা (রঃ) বলেছেন এর ব্যাখ্যা হলো সেসব বুদ্ধিজীবি ওলামায়ে কেরাম যারা আল্লাহর সৃষ্টির কল্যাণকামী হন। সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বলেছেন, এ শব্দটির ব্যাখ্যা

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৮, পৃষ্ঠা- ১০৯-১০
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৩২
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২০৭
তফসীরে এবনে কাসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা- ৭৫

হলো সেই আলেম যিনি তার এলম মোতাবেক আমল করেন। আবু ওবায়দা (রঃ) বলেছেন রব্বানী সে ব্যক্তি যিনি হালাল হারামের জ্ঞানের অধিকারী, আল্লাহর বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত এবং উম্মতের অতীত এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে ওয়াকেফহাল। এ সমস্ত কথার মর্মবাণী হলো, রব্বানী সে ব্যক্তিকে বলা হয় যার নিকট দ্বীন ইসলামের এলম বা জ্ঞান রয়েছে এবং সে এলম মোতাবেক সে ব্যক্তি আমলও করেন। শুধু তাই নয়; আমলের সঙ্গে সঙ্গে এখলাসও তার মধ্যে থাকে তথা সে যাবতীয় কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে করে। আল্লাহর নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে উচ্চ মর্তবার অধিকারী হয় এবং অন্যকেও আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথ প্রদর্শন করে।

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেনঃ রব্বানী সেসব লোক যারা নিজেদের আমল দ্বারা এলমকে পরিপূর্ণ করেন। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন রব্বানী সে ব্যক্তি যার সম্পর্ক আল্লাহ পাকের সঙ্গে- যে আল্লাহ ওয়ালা। যেদিন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর এন্তেকাল হয় সেদিন মোহাম্মদ এবনে হানিফিয়া বলেছেন আজ এ উম্মতের রব্বানী এন্তেকাল করলেন।

এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে এ পৃথিবীতে আল্লাহ পাক যাকে নবুওয়্যতের মহান মর্যাদার অধিষ্ঠিত করে দিয়েছেন তার পক্ষে আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কারো বন্দেগী করার কথা বলা শুধু যে অসম্ভব তাই নয়, বরং কল্পনাতীত। আল্লামা শিব্বির আহমদ ওসমানী (রঃ) এ পর্যায়ে বলেছেন আমরা সর্বদা লক্ষ্য করি কোন সরকার যখন কোন ব্যক্তির প্রতি কোন দায়িত্ব অর্পণ করে তখন দুটি বিষয়ে বিশেষভাবে দেখে নেয় (১) সরকারের নীতি বোঝার এবং যথাযথভাবে তার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা আছে কিনা? (২) সরকারী নির্দেশ পালন এবং জনসাধারণকে সরকারের অনুগত করার যোগ্যতা আছে কিনা? এ ব্যাপারে যোগ্যতা এবং বিশ্বস্ততা যাচাইয়ের পরই কোন ব্যক্তির প্রতি দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মানুষের যাচাই বাছাইয়ে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে প্রকট কিন্তু আল্লাহ পাকের ব্যাপারে এ সম্ভাবনা নেই। তিনি যাকে নবী বা রসূল হিসেবে মনোনীত করেছেন তাঁর পক্ষে কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয় যে তিনি আল্লাহ ব্যতীত আর কারো বন্দেগীর কথা বলবেন।[১] নবীগণের পবিত্র দায়িত্ব হলো শেরক ও পৌত্তলিকতার ঘন অন্ধকারকে দূর করা এবং গোমরাহীর আবর্তে নিপতিত মানুষকে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসা। তাই তাঁরা মানুষকে সম্বোধন করে বলেন, তোমরা আল্লাহ ওয়ালা হও, আলেম, গুণী, জ্ঞানী এবং মুত্তাকী পরহেযগার হও।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা- ২৭৯-৮০
ফাওয়ায়েদে ওসমানী পৃষ্ঠা- ৭৭

وَلَا يَأْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ

আর আল্লাহর নবীর পক্ষে আদৌ সম্ভব নয় যে তিনি ফেরেশতা ও নবীদের মা'বুদ বা উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করার আদেশ দেবেন। যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সেজদা করার আকাঙ্খা পেশ করেছিল আল্লাহ পাক তাদের উদ্দেশ্যে বলেছেনঃ

اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

অর্থাৎ তোমরা মুসলমান হওয়ার পর আল্লাহর নবী কি তোমাদেরকে আল্লাহর নাফরমানীর নির্দেশ দেবেন? অথচ তোমরা মুসলমান, আল্লাহর অনুগত। মূলতঃ ইসলামের মূল শিক্ষাই হলো এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা; তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা, তাঁর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা, তাঁর প্রতি ভরসা করা, শুধু তাঁর নিকট আশা করা, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কারো বন্দেগী না করা এমনি অবস্থায় কোন নবীর পক্ষে এমন কথা বলা আদৌ সম্ভব নয় যা ইসলামের মূল শিক্ষা বিরোধী।

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ
اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ
لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ
عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ ؕ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ
مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٨١﴾ فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْفٰسِقُوْنَ ﴿٨٢﴾ اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

তরজমা

(৮১) এবং স্মরণ কর সে সময়কে যখন আল্লাহ পাক নবীগণের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তোমাদেরকে কিতাব এবং হেকমত দিতেছি, অতঃপর একজন রসূল তোমাদের নিকট আসবেন যিনি তোমাদের কিতাবের সত্যতা প্রমাণ করবেন তখন তোমরা অবশ্যই তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে,

তিনি তাদেরকে (আরও) বললেনঃ তোমরা কি এতে রাজী হলে? আর এ সম্পর্কে আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে? তারা বলল আমরা গ্রহণ করলাম। তিনি বললেনঃ তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমি তোমাদের সাক্ষী রইলাম।

(৮২) সুতরাং এরপর যারা ফিরে যায় তারাই ফাসেক, অন্যায়কারী।

(৮৩) তবে কি এরা আল্লাহ্ পাকের ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম চায়? যখন নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সমস্ত কিছু ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁরই নিকট ফিরে যাবে।

তফসীরুল কোরআন

আম্বিয়ায়ে কেরামের নিকট থেকে অঙ্গীকার

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ হযরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সমস্ত নবীগণের নিকট থেকে আল্লাহ্ পাক এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন যে যদি তাদের যুগে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয় তখন তাঁরা যেন তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন। তাদেরকে আল্লাহ্ পাক যে কিতাব, হেকমত, নবুওয়্যত দান করেছেন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাঁরা যেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন থেকে বিরত না হন। হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক প্রত্যেক নবী থেকে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন যে যদি তাদের জিন্দেগীতে আল্লাহ পাক হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেন, তবে তাদের কর্তব্য হবে তাঁর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁকে সাহায্য করা এবং প্রত্যেক নবী নিজ নিজ উম্মতকেও তাঁর প্রতি ঈমান আনার জন্যে হেদায়েত করেন এবং তাঁরা যেন তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ করে।

তফসীরকারগণ (রঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হলো আল্লাহ্ পাক প্রত্যেক পয়গম্বর থেকে এ অঙ্গীকার নিয়েছেন তিনি যেন তাঁর পরবর্তী নবীর সত্যতা বর্ণনা করেন।[১]

মসনদে আহমদে রয়েছে হযরত ওমর (রাঃ) একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি একজন ইহুদীকে বলেছিলাম তওরাতের মূল্যবান কথাগুলো যেন সে আমাকে লিখে দেয়। যদি আপনার অনুমতি হয় তবে আমি সেগুলো পেশ করতে পারি। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন, রাগের কারণে তাঁর

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২য় পৃষ্ঠা-৮৫

চেহারার বর্ণ পরিবর্তিত হলো। তখন হযরত আবদুল্লাহ এবনে সাবেত (রাঃ) বললেনঃ তুমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকের অবস্থা দেখছ না? তখন হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, আমি আল্লাহ পাকের প্রতি প্রতিপালক হিসেবে ইসলামের প্রতি জীবন বিধান হিসেবে এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি রসূল হিসেবে সন্তুষ্ট। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ক্রোধ দূর হলো, তিনি তখন এরশাদ করলেন– সেই আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, যদি আজ মূসা জীবিত থাকতো তবে আমার অনুকরণ ব্যতীত তাঁর গত্যন্তর থাকত না।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত সমূহের মর্মকথা হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে আহলে কিতাবের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণিত করা, কেননা তারা শুধু যে তাঁর নবুওয়্যতের প্রতি বিশ্বাস করত না তাই নয়; বরং তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষণ করত। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ যে সমস্ত নবীকে আল্লাহ পাক কিতাব এবং হেকমত প্রদান করেছেন তাদের থেকে আল্লাহ পাক এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন যে তারা যেন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁকে সাহায্য করে এবং আল্লাহ পাক এ খবরও দিয়েছেন যে, সমস্ত নবীগণ এ অঙ্গীকার করেছেন আর আল্লাহ পাক এ আদেশও দিয়েছেন যে, যারা সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাসী হবে না, তারা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে আল্লাহ্ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনাকে সমস্ত নবীগণের প্রতি অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছেন। অতএব, হে আহলে কিতাব! তোমরা যে সমস্ত নবীগণের অনুসারী বলে নিজেদেরকে মনে কর, তারাও হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার অঙ্গীকার করেছেন। তাই তোমাদের একান্ত কর্তব্য হলো তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা।

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ

আয়াতের মর্মকথা

এবনে জরীর তাবারী লিখেছেন যে, এ বাক্যটির অর্থ হলো হে আহলে কেতাব! সে সময়কে স্মরণ কর যখন আল্লাহ পাক সমস্ত নবীদের থেকে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপনের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন।[২]

১। খোলাসাতুত তাফাসীর খন্ড- (১) পৃষ্ঠা-২৬৫
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৭৬
তফসীরে কবীর খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৭

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে হযরত আলী (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে আল্লাহ্ পাক আদম (আঃ) থেকে নিয়ে প্রত্যেক নবীর নিকট থেকে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন যে যদি তাদের জীবদ্দশায় হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হন তবে তাঁরা যেন তাঁর প্রতি অবশ্যই ঈমান আনেন এবং তাঁকে সাহায্য করেন। ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন এর আরেকটি অর্থ হতে পারে এই সমস্ত নবীগণ- তাঁদের উম্মতের নিকট থেকে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন যে, যদি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হন, তবে তাঁর প্রতি যেন তারা ঈমান আনয়ন করে এবং তাঁকে সাহায্য করে।

ইমাম রাজী (রঃ) আরো লিখেছেন, এ আয়াতের উদ্দেশ্যে হলো যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যমানা পায়, তারা যেন তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করে আর যেহেতু অঙ্গীকারের কারণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা যখন আম্বিয়ায়ে কেরামের কর্তব্য রয়েছে, তখন তাঁদের উম্মতের প্রতিও এ কর্তব্য আরোপিত হয়েছে। অতএব, যারা পূর্বের কোন নবীর প্রতি বিশ্বাসী বলে দাবী করে তাদের একান্ত কর্তব্য হলা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।[১]

তিনটি অঙ্গীকার

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাকের গৃহীত তিনটি অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ আছে।

প্রথমত আল্লাহ্ পাক সৃষ্টির প্রথম দিনে সমগ্র মানব জাতি থেকে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন তার উল্লেখ রয়েছে পবিত্র কোরআনের সূরায়ে আ'রাফে, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

আল্লাহ্ পাক সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? সেদিন সমগ্র মানব জাতির তরফ থেকে যিনি আল্লাহ্ পাকের এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন, যিনি সেদিন সমগ্র মানব জাতির নেতত্ব গ্রহণ করেছেন তিনি হলেন আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সর্ব প্রথম অঙ্গীকার করেছিলেন তিনি আর এ পর্যায়ে তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম। এরপর মর্তবা অনুসারে সকল আউলিয়ায়ে কেরাম, এরপর সমগ্র মানব জাতি।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১১৫-১১৬

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্ পাক অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন আহলে কেতাব ধর্মযাজকদের নিকট থেকে যেন তারা সত্যকে গোপন না করে। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ

তৃতীয়তঃ আল্লাহ্ পাক প্রত্যেক নবীর নিকট থেকে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন যেন তারা সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁকে সাহায্য করে আর এ অঙ্গীকারের কথাই রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّبِيّٖنَ

প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহ্ পাক আম্বিয়ায়ে কেরামের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন তা কবে কোথায় নিয়েছেন? তফসীরকারগণ এর জবাবে বলেছেনঃ আল্লাহ্ পাক এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন এ পৃথিবী সৃষ্টির বহু পূর্বে আত্মার জগতে।[১]

হাকীমুল উম্মত হযরত মওলানা থানবী (রঃ) তাঁর বয়ানুল কোরআনে লিখেছেন হতে পারে আল্লাহ পাক এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন এ পৃথিবীতে ওহীর মাধ্যমে।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, প্রত্যেকটি অঙ্গীকারের বিষয়বস্তু আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন।

আরো একটি প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহ্ পাক অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত সব কিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত রয়েছেন যে কোন নবী সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগ পাবেন না এমতাবস্থায় এ অঙ্গীকারের সার্থকতা কোথায়? তত্ত্বজ্ঞানীগণ এর জবাব দিয়েছেন যে নবীগণ যখন আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন তখন থেকে তাঁরা সওয়াব লাভ করবেন।

দ্বিতীয়তঃ এতে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শুধু উম্মতের নবী নন, বরং নবীগণেরও নবী। তিনি বিশ্বনবী, বিশ্বজনীন তাঁর আদর্শ। বিশ্ব মানবের কল্যাণ তাঁর লক্ষ্য। হাদীস শরীফে উল্লেখিত আছে শেষ যমানায় হযরত ঈসা (আঃ) দুনিয়াতে ফিরে আসবেন এবং আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মত হওয়ার গৌরব অর্জন করবেন।

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড- পৃষ্ঠা- ১৪২

এতদ্ব্যতীত, শবে মে'রাজে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সমস্ত নবীগণের ইমামতি করেছেন এবং কেয়ামতের দিন তিনিই সমগ্র মানব জাতির জন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সুপারিশ করবেন। ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, যদি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অন্য কোন নবীর যুগে আগমন করতেন তবে তাঁর প্রতি নবীগণ ঈমান আনতেন, এটি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হওয়ার এবং নবীগণের দলপতি হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আর এজন্যেই তিনি এরশাদ করেছেনঃ

بُعِثْتُ اِلَى النَّاسِ كَافَّةً

অর্থাৎ আমি প্রেরিত হয়েছি সমগ্র মানব জাতির নিকট।

প্রিয়নবীর (সঃ) নবুওয়্যতের যুগ

এ পর্যায়ে একথাও উল্লেখ্য, সাধারণত ধারণা করা হয় তাঁর নবুওয়্যতের যুগ শুরু হয়েছে তাঁর আমল থেকে এবং অব্যাহত থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত কিন্তু কথা এখানেই শেষ নয় এবং সর্বশেষ সত্যও নয়; বরং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগ শুরু হয়েছে হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির পূর্ব হতে, কেননা তিনি বলেছেন আদমের সৃষ্টির পূর্বেই আমি নবী ছিলাম আর আলোচ্য আয়াতে ঘোষিত হয়েছে যে, সমস্ত নবীগণের নিকট থেকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে। অতএব, তিনি নবী সর্বকালের জন্যে। তাঁর যুগ মানব জাতির সৃষ্টির পূর্ব থেকে কেয়ামত পর্যন্ত। এ মর্যাদা শুধু তাঁরই।

قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক নবীগণ থেকে শুধু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অঙ্গীকারই গ্রহণ করেননি, বরং তাঁদেরকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করছেন, তোমরা কি এ অঙ্গীকারের কথা স্বীকার করলে? তাঁরা বললেন, আমরা স্বীকার করলাম। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ তবে তোমরা এ স্বীকৃতির উপর সাক্ষী থাক। আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম। কিন্তু এরপরও যদি কেউ অবাধ্য হয়, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে তবে তারা হবে পাপীদের অন্তর্ভুক্ত, তাদের শাস্তি অবধারিত।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, বর্তমান পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা।

أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ الاية

ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়

ইসলাম চিরন্তন সত্য। সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ এতে নিহিত। ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা আল্লাহ্ পাকের মনোনীত এবং পছন্দনীয়, এ কারণেই আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে ঘোষণা করেছেন যে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম আল্লাহ্ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়।

শানে নুযুল

আল্লামা বগবী লিখেছেনঃ ইহুদী এবং খৃষ্টানদের দু'টি দল নিজেদেরকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দ্বীনের অনুসারী বলে দাবী করে, পরস্পরের দাবী এবং পাল্টা দাবীর কারণে তাদের পরস্পরের মধ্যে কলহ দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং এ দ্বন্দ্ব নিয়ে তারা উভয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান দরবারে হাযির হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, "তোমরা উভয়ে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্ম থেকে দূরে রয়েছ"। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ মন্তব্যের কারণে তারা উভয় পক্ষ অসন্তুষ্ট হয় এবং বলে যে আমরা আপনার সিদ্ধান্ত মানি না এবং আপনার প্রচারিত ধর্মেও বিশ্বাস করিনা। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে আল্লাহ্ পাক তাঁর রসূলগণের মাধ্যমে যে ধর্ম বা জীবন বিধান নাযিল করেছেন তা ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না, আর এ ধর্ম হলো এক আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা, এক আল্লাহর এবাদত করা, সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি এতদ্ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের প্রতি বিশ্বাস করে তবে তা আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না আর একথা সর্বজন- বিদিত যে আসমান যমীনে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহ্ পাকের অনুগত, সব কিছুই আল্লাহ্ পাকের কর্তৃত্বাধীন এবং নিয়ন্ত্রণাধীন।

এখানে একথাও উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে আদম (আঃ) থেকে নিয়ে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত প্রত্যেক নবীর নিকট থেকে আল্লাহ্ পাক এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন যে তারা যেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন। অতএব,

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১২২
তফসীরে মাজহারী খন্ড- ২, পৃষ্ঠা-২৮৩

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা প্রত্যেক নবী এবং তাঁর উম্মতের অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু যারা এ কর্তব্য পালন না করে অন্য ধর্ম অবলম্বন করে তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছেঃ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন জীবন বিধান আল্লাহ পাকের মহান দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না।

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَ
اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَ
عِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ
لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿٨٤﴾ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ
مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٨٥﴾

তরজমা

(৮৪) (হে রসূল!) আপনি বলে দিন, আমরা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনেছি এবং যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে তার উপর ঈমান এনেছি এবং ইব্রাহীম, ইসমাঈল, এসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁদের বংশধরদের উপর নাযিল হয়েছে, এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণের উপর তাদের পালনকর্তার নিকট হতে নাযিল হয়েছে তাতেও ঈমান এনেছি, এবং আমরা তাদের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য করি না এবং আমরা আল্লাহ পাকের নিকট আত্মসমর্পণকারী মুসলিম।

(৮৫) এবং যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন জীবন-ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা কখনও কবুল করা হবে না এবং সে হবে পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে আল্লাহ পাক প্রত্যেক নবীর নিকট থেকে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন যে তারা যেন সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। আর এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন যে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলীর মধ্যে একটি হলো এই যে, তিনি তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণকে সত্য ঘোষণা করেন। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন যে

(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি এক আল্লাহর প্রতি আর যে কিতাব আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে তথা পবিত্র কোরআন আর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, এসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি আর যা কিছু নাযিল হয়েছে মূসা (আঃ) সহ সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রতি।

মূলতঃ ইসলাম বিশ্ব ধর্ম, বিশ্ব মানবের কল্যাণই এর লক্ষ্য। তাই মুসলমান মাত্রের কর্তব্য হলো বিশ্ব গ্রন্থ পবিত্র কোরআনের প্রতি বিশ্বাস করা, বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনা। এর পাশাপাশি পূর্ববর্তী সমস্ত নবীগণে প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থগুলোকে সত্য জানা। আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে কোন পার্থক্য না করা।

আলোচ্য আয়াতে ইসলামের উদারতা, বিশ্বজনীনতার ঘোষণা রয়েছে। ইসলাম চায় সমগ্র বিশ্ব মানবকে প্রীতি বন্ধনে আবদ্ধ করতে, এক আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে অনুগত এবং সেজদারত করতে, তওহীদের সোনালী সূত্রে আবদ্ধ করতে। মূলতঃ এ উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হয়েছেন লক্ষাধিক আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং তাঁদের দলপতি ঈমামুল আম্বিয়া হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ

(আমরা মুসলমান, আমরা এক আল্লাহর অনুগত।)

এ বাক্যে ইসলামের মর্মকথা প্রকাশিত হয়েছে আর তা হলো আল্লাহর প্রতি আনুগত্য। এক আল্লাহর প্রতি আনুগত্য থাকলে আল্লাহর প্রেরিত নবীগণের প্রতিও ঈমান আসবে, তাঁর তরফ থেকে অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থ সমূহের প্রতিও ঈমান আনা সহজ হবে।

আলোচ্য আয়াতে সর্ব প্রথম আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা আল্লাহ্র প্রতি ঈমানই হলো প্রকৃত ঈমান, সবার ওপরে আল্লাহর প্রতি ঈমান। এরপর পবিত্র কোরআনের প্রতি ঈমানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা অন্যান্য আসমানী কিতাব সমূহকে আহলে কেতাবরা পরিবর্তন করে ফেলেছে অতএব, প্রকৃত অর্থে এখন আসমানী কিতাব বলতে পবিত্র কোরআনই সম্পূর্ণ সংরক্ষিত রয়েছে। এজন্যে আল্লাহর প্রতি ঈমানের কথার পরই পবিত্র কোরআনের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপনের উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর কয়েকজন বিশিষ্ট নবীর নাম উল্লেখিত হয়েছে। পূর্বেই ঘোষণা করা হয়েছে যে প্রত্যেক নবী আল্লাহ্ পাকের নিকট অঙ্গীকার করেছেন যে সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁরা বিশ্বাস করবেন আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও তাঁদের সত্যতার কথা ঘোষণা করেছেন।

প্রশ্ন হতে পারে পূর্ববর্তী নবীগণের সমস্ত শরীয়ত রহিত করেছে আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শরীয়ত এবং সমস্ত নবীগণের নবুওয়্যতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এখন নবুওয়্যত শুধু হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের। তাঁর নবুওয়্যত অব্যাহত থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত। এখন যদি পূর্ববর্তী কোন নবী আগমন করেন যেমন আখেরী যমানায় হযরত ঈসা (আঃ) আগমন করবেন, তাঁকে উম্মতভুক্ত হতে হবে আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের। তিনি নবী হিসেবে নন, উম্মত হিসেবেই আগমন করবেন, এমনি অবস্থায় পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি ঈমানের তাৎপর্য কি? এ প্রশ্নের জবাবে ঈমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন যে তাঁদের প্রতি ঈমানের তাৎপর্য হলো আমরা একথা বিশ্বাস করব যে তারা নবী রসূল হিসেবে আগমন করেছিলেন। আর তাঁরা এখনো নবী আছেন একথা বিশ্বাস করি না।[১]

এখন সমগ্র মানব জাতির চির শান্তি চির মুক্তি চির নাজাতের একমাত্র পন্থা হলো সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা মেনে চলা আর এটিই ইসলামের মহান শিক্ষা, এজন্যেই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا

অর্থাৎ যারা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন কিছুকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করবে তা আল্লাহ পাকের দরকার গ্রহণযোগ্য হবে না, তারা আখেরাতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত, কেননা তাদের শাস্তি অবধারিত। আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেনঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহর মনোনীত ধর্ম, আল্লাহ পাকের প্রদত্ত জীবন বিধান পূর্ণ পরিণত, বাস্তবের কঠিন পরীক্ষায় বারে বারে পরীক্ষিত। অতএব ইসলাম ব্যতীত আর যা কিছুই ধর্মের নামে পৃথিবীতে রয়েছে তা আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়।

আল্লামা আলুসী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন- আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আদেশ দিয়েছেন যে তিনি যেন নিজের তরফথেকে এবং উম্মতের তরফ থেকে আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহর কালামের প্রতি এবং আল্লাহর প্রেরিত নবীগণের প্রতি ঈমানের কথা ঘোষণা করেন।[২]

১। তফসীরে কবীর খণ্ড- ৮, পৃষ্ঠা- ১২৪-২৫
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড- ৩, পৃষ্ঠা ২১৪

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা মাজেদী লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে এ চিরন্তন সত্যকে পুনরায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, ইসলাম কোন নতুন বা অপরিচিত বিধান নয়; বরং এটিই সেই জীবন বিধান যার মৌলিক শিক্ষা হলো তওহীদ বা একত্ববাদ। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত সকল নবীই তওহীদের তবলীগ করেছেন এজন্যেই মুসলমানগণ সমস্ত পয়গম্বরগণের সত্যতার প্রতি বিশ্বাস করে।[১]

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا

আল্লামা বগবী লিখেছেন যে এ আয়াত এবং এর পরবর্তী কয়েকটি আয়াত ১২ জনের একটি দল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যারা ইসলাম পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়েছিল এবং মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফ চলে গিয়েছিল, এদের মধ্যে হারেস এবনে সোয়াইদ আনসারীও ছিল। (অবশ্য) তিনি পরে আন্তরিকভাবে তওবা করে পুনরায় ইসলাম কবুল করেন।[২]

আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন জীবন বিধান আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কবুল হবে না। যারা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মাবলম্বন করবে তারা আখেরাতে চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। ইতোপূর্বে যে সব ধর্ম পৃথিবীতে প্রচলিত ছিল বা আজও আছে সেগুলোর অবস্থা অচল মুদ্রার মত যা পূর্বে প্রচলিত ছিল, এখন অচল ঘোষিত হয়েছে। আর এমনিভাবে খাঁটি এবং প্রকৃত ইসলাম ব্যতীত যত বাতিল মতবাদ আত্মপ্রকাশ করেছে- এগুলোও জাল টাকার মতই অচল।

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا
كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ
الْبَيِّنَاتُ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٦﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ
أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾
خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٨٨﴾
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٨٩﴾

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা- ১৪৩
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ২১৫
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৮৫

তরজমা

(৮৬) কিভাবে আল্লাহ পাক সেই সম্প্রদায়কে হেদায়েত করবেন, যারা ঈমান আনার পর নাফরমানী করেছে এবং তারা রসূলের সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছে এবং তাদের নিকট নির্দশন গুলোও এসেছিল আর আল্লাহ পাক জালেমদের হেদায়েত করেন না।

(৮৭) তারাই সে দল, যাদের কর্মফল এই হবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ পাকের ও ফেরেশতাগণের এবং সমগ্র মানব জাতির লা'নত তাদের উপর হবে।

(৮৮) তারা উক্ত আযাবের মধ্যে সর্বদা থাকবে এবং তাদের শাস্তি কম করা হবে না এবং তাদেরকে বিরামও দেয়া হবে না।

(৮৯) কিন্তু সে সব লোক যারা এরপর তওবা করেছে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করেছে, আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময়।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন জীবন বিধান আল্লাহর পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। আর এ আয়াতে যারা ইসলাম পরিত্যাগ করে তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

শানে নুযুল

(১) ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন এ আয়াতের শানে নুযুল সম্বন্ধে কয়েকটি বিবরণ রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) বক্তব্য হলো এ আয়াত নাযিল হয়েছে তাদের সম্পর্কে যারা মুরতাদ হয়ে মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফ চলে গিয়েছিল (ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে)।

(২) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে আরেকটি বিবরণও রয়েছে তিনি বলেছেন এ আয়াত নাযিল হয়েছে মদীনা শরীফের ইহুদী গোত্র বনু কোরায়যা ও বনু নযীর সম্পর্কে, কেননা তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর নবুওয়্যতের সাক্ষ্য দিত, তাঁর যেসব গুণাবলীর উল্লেখ তওরাতে রয়েছে সেগুলো বর্ণনা করতো কিন্তু যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্ট দলিল এবং মোযেজা সহ আগমন করলেন তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করলো, হিংসার বশবর্তী হয়ে তাঁর সাথে শত্রুতা করলো। তাই এ আয়াত নাযিল হয়েছে এবং তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

(৩) এ আয়াত নাযিল হয়েছে হারেস এবনে সোয়াইদ সম্পর্কে। তিনি একজন মদীনাবাসী। ইসলাম পরিত্যাগ করে মুরতাদ হলেও পরে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করেছিলেন এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে একথা জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছিলেন যে আমার জন্যে কি তওবার ব্যবস্থা আছে? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হ্যাঁ সূচক জবাব দিলে তিনি তাঁর দরবারে হাযির হন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাতে হাত রেখে তওবা করেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর তওবা কবুল করেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয় এবং পবিত্র কোরআনে একথা ঘোষণা করা হয়।[১]

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ

কিন্তু যারা তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে (আল্লাহ্ পাক তাদের তওবা কবুল করেন)।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ
ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّوْنَ ﴿٩٠﴾
اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ
مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ ؕ
اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٩١﴾

তরজমা

(৯০) নিশ্চয় যারা ঈমান আনয়নের পর কাফের হয়েছে আর কুফরকে বৃদ্ধি করেছে তাদের তওবা কখনও গ্রহণ করা হবে না। আর তারা পথভ্রষ্ট।

(৯১) নিশ্চয় যারা কাফের হয়েছে আর কাফের অবস্থায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে তাদের কারো নিকট থেকে সারা পৃথিবীর সম পরিমাণ স্বর্ণও গ্রহণ করা হবে না যদিও তারা তা আখেরাতের শাস্তি থেকে নাজাত লাভের জন্যে দিতে চায়, তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আর তাদের জন্যে কোন সাহায্য করাও হবে না।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১২৬-২৭
তফসীরে মাজহারী খন্ড- ২, পৃষ্ঠা-২৮৭

এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনার পর ঈমান পরিত্যাগ করে তাদের মৃত্যু-কালীন তওবা কবুল করা হবে না।

আর এজন্যেই পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক পাপী-তাপী মানুষকে তওবা করে ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْآ اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا

"হে মোমেনগণ! তোমরা প্রকৃত তওবা করে আল্লাহ পাকের দরবারে মনের পবিত্রতা অর্জন কর, সকল কলংক কালিমা মুছে ফেল, তাঁর সমীপে ক্ষমাপ্রার্থী হও"।

তওবার তাৎপর্য

তওবার তাৎপর্য হচ্ছে কৃত অন্যায়ের জন্যে মনে মনে লজ্জিত হওয়া, মুখে তওবার কথা উচ্চারণ করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা যাবতীয় গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করা। তওবার এ তিনটি শর্ত পূর্ণ করতে হবে, যদি এর একটিও ব্যতিক্রম হয় তবে তওবা গ্রহণযোগ্য হয় না। যদি অপরাধ হক্কুল্লাহ বা আল্লাহ পাকের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কীয় হয় তবে আল্লাহ পাকের নিকট তওবা করতে হবে, যদি নামায রোজা প্রভৃতির ব্যাপারে অপরাধ হয়ে থাকে তবে কাযা আদায় করতে হবে এবং ক্ষমা প্রার্থী হতে হবে। আর যদি মানুষের ব্যাপারে তথা হক্কুল এবাদ সম্পর্কে অপরাধ হয় তবে তার জন্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হতে হবে, যদি অর্থ সম্পদের ব্যাপারে অপরাধ হয়ে থাকে তবে পাওনাদারকে তার পাপ্য অবশ্যই আদায় করতে হবে অথবা ক্ষমাপ্রার্থী হতে হবে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْآ اِلَيْهِ

(তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও, তাঁর নিকট তওবা কর।)

বস্তুত মানুষ যখন অবনতি এবং অধঃপতনের পথ পরিত্যাগ করে, যখন মানুষ পাপ পংকিলতার শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত হয় এবং পরিত্রাণের জন্যে সচেষ্ট হয়, মনে প্রাণে তওবা করে তখন আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা গ্রহণযোগ্য হয়। তাঁর রহমতের দ্বার হয় তখন অবারিত। কেননা ইসলামের আদর্শ যখন রূপায়িত হয়, পবিত্র কোরআনের শিক্ষা যখন বাস্তবায়িত হয় তখন আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম রহমতও অবতীর্ণ হয়। এটিই পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা আর

এটিই স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাকের শাশ্বত বিধান। হযরত আদম (আঃ) যখন পৃথিবীতে পদার্পণ করেন তখন তিনি আল্লাহ্ পাকের দরবারে কান্না কাটি করেছিলেন এবং এই বলে মুনাজাত করেছিলেন ঃ

হে পরওয়ারদেগার! আমি তওবা করেছি, আমি আত্ম সংশোধন করেছি, তুমি কি দয়া করে আমার তওবা গ্রহণ করবে? তখন আল্লাহ্ পাক হযরত আদম (আঃ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করে এরশাদ করলেন ঃ হে আদম! আসমান যমীন সৃষ্টির পূর্বেই আমার আরশে একথা লিপিবদ্ধ রেখেছি, যারা আমার সমীপে তওবা করবে আমি অবশ্যই তাদেরকে ক্ষমা করবো, যারা তওবাকারী তারা হাশরের ময়দানে আনন্দিত হয়ে সমবেত হবে, তাদের দোয়া কবুল করা হবে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সে ব্যক্তির জন্যে মুবারক হোক যার আমলনামায় অধিক পরিমাণে এস্তেগফার বিদ্যমান। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি এই আশা করে যে, কেয়ামতের দিন সে যেন স্বীয় আমলনামা দেখে আনন্দিত হতে পারে তবে সে যেন দুনিয়াতে অধিক পরিমাণে আল্লাহ্র দরবারে এস্তেগফার করে তথা ক্ষমাপ্রার্থী হয়।

হাদীসে কুদসীতে রয়েছে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ আমি বন্দার ধারণার একেবারে নিকটবর্তী যখন সে আমাকে ডাকে, আমি তার আওয়াজের একেবারেই নিকটবর্তী থাকি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি কখনও পাপ কাজ করে ফেলে যদি সে তৎক্ষণাত অজু করে দু' রাকাআত নামায পড়ে এবং তওবা করে তবে আল্লাহ্ পাক তাকে ক্ষমা করেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেছেনঃ যখন কোন বন্দা দোযখ থেকে সাতবার পরিত্রাণ কামনা করে তখন দোযখ আল্লাহ্ পাকের দরবারে আরজ করেঃ হে আল্লাহ্! অমুক বন্দা আমার নিকট থেকে পরিত্রাণ কামনা করেছে, তুমি তাকে পরিত্রাণ দাও। আর যখন কোন বন্দা সাতবার জান্নাত কামনা করে তখন জান্নাত আল্লাহ্ পাকের দরবারে দরখাস্ত করে, হে আল্লাহ্! তোমার অমুক বন্দা আমার আরযু প্রকাশ করেছে তুমি তাকে আমার মধ্যে প্রবেশাধিকার দাও।

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে আল্লাহ্ পাক মানুষের দিনের অপরাধ ক্ষমা করার জন্যে রাত্রিকালে এবং রাত্রের অপরাধ ক্ষমা করার জন্য দিবাভাগে হস্ত প্রসারিত করেন যদি বদকার লোকেরা তওবা করে তবে তিনি তাদের তওবা গ্রহণ করেন।

মুসলিম শরীফে সংকলিত অন্য একখানি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ পশ্চিম গগনে সূর্য-অস্তমিত হওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত গুনাহগারের তওবা কবুল হয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ কিছু লোক মুসলমান হয় অতঃপর ইসলাম পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়, এরপর পুনরায় ইসলাম কবুল করে তৎপর আবার মুরতাদ হয় অতঃপর তাদের সম্প্রদায়ের লোকদেরকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট প্রেরণ করে জিজ্ঞাসা করে এখনো কি তাদের তওবা কবুল হবে? তখন এ আয়াতে নাযিল হয়। এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যারা মুরতাদ হয় এবং মৃত্যুর সময়, মৃত্যু ভয়ে তওবা করে তাদের তওবা কবল হবে না। তাদের জন্যে তওবার দরজা বন্ধ।

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেনঃ আহ্‌লে কিতাব ইহুদী ও ঈসায়ীরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর প্রতি বিশ্বাস করতো কিন্তু যখন তিনি আগমন করলেন তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করলো। এরপর তাদের নাফরমানী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো। তারা তাদের কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করলো। মোমেনদেরকে হত্যা করলো এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোযেজা সমূহকে অস্বীকার করলো, তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا الاية

অর্থাৎ যারা কাফের হয়েছে ঈমান লাভের পর এবং তাদের কুফর ও নাফরমানী বৃদ্ধি পেয়েছে, তাদের তওবা গ্রহণযোগ্য হবে না। তারা পথভ্রষ্ট।

এ আয়াতের অন্য একটি ব্যাখ্যা হলো, ইহুদীরা হযরত মূসা (আঃ)- কে বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু ঈসা (আঃ) ও ইঞ্জিলকে অস্বীকার করে তারা কাফের হয়। তাদের এ কুফর, পথভ্রষ্টতা এবং ঔদ্ধত্য আরও বৃদ্ধি পায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ও পবিত্র কোরআনকে অস্বীকার করার মাধ্যমে।[১]

তৃতীয়তঃ এ আয়াত নাযিল হয়েছে সেসব লোকদের সম্পর্কে যারা ইসলাম পরিত্যাগ করে মদীনা মুনাওয়্যারা থেকে মক্কা শরীফ চলে যায় এবং আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হয়, এরপর মুনাফেকী করে পুনরায় ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করে। যেহেতু প্রকৃত অবস্থায় এটি ছিল তাদের মুনাফেকী তাই আল্লাহ পাক এ নেফাককে কুফর বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং তাদের তওবা কবুল করা হবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাদের শাস্তি অবধারিত একথাও সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত হয়েছে।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৩০-৩১
তফসীরে মাজহারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা- ২৮৮

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ

“নিশ্চয় যারা কাফের আর কাফের থাকা অবস্থায়ই তাদের মৃত্যু হয় তারা যদি সারা বিশ্বের সম পরিমাণও স্বর্ণ আল্লাহর রাহে দান করে তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না”।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ প্রশ্ন করা হয়েছে যে আবদুল্লাহ এবনে যাজআন নামক এক ব্যক্তি অত্যন্ত দানবীর ছিল, তার অতিথি পরায়ণতা তদানীন্তনকালে সারা আরবে খ্যাতি লাভ করেছিল, সে গোলাম আজাদ করতো, তাদের মুক্তিপণ আদায় করতো, দারিদ্র-পীড়িত মানুষকে সাহায্য করতো তার এসব সৎ কাজ আখেরাতের নাজাতের ব্যাপারে উপকারী হবে কি? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন ঃ না, সে সারা জীবনে একবারও

رَبِّ اغْفِرْلِىْ خَطِيْئَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ

(অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! কেয়ামতের দিন আমার গুনাহ্ সমূহ মাফ করে দিও) বলেনি। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ

তাদের নিকট থেকে কোন বদলা গ্রহণ করা হবে না, কোন সুপারিশ তাদের জন্যে উপকারী হবে না। এমনিভাবে অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

لَا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ

অর্থাৎ কেয়ামতের কঠিন দিনে কোন ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকবে না এবং কোন বন্ধুত্বও উপকারী হবে না।

আরো এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ الاية

সারা পৃথিবীতে কাফেরদের নিকট যে ধন-সম্পদ রয়েছে এর দ্বিগুণও যদি তারা কেয়ামতের দিন আযাব থেকে নাজাত লাভের উদ্দেশ্যে ব্যয় করেতে চায় তবু তা গ্রহণযোগ্য হবে না, তাদের জন্যে কঠোর শাস্তি অবধারিত। তাদের কোনই সাহায্যকারী থাকবে না।

মসনদে আহমদে সংকলিত একখানি হাদীসে রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন দোযখবাসীকে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসা করা হবে সারা পৃথিবীতে যত ধন-সম্পদ ছিল তার যদি তুমি মালিক হও আর যে দোযখের শাস্তির সম্মুখীন হয়েছ এর বিনিময়ে সেই ধন-সম্পদকে তুমি ব্যয় করতে রাজী হবে? সে বলবে অবশ্যই। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, আমি তো তোমার নিকট এর চেয়ে অনেক কম চেয়েছিলাম, আমি তো সমগ্র মানব জাতি থেকে এ অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে তোমরা আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করোনা তবু তোমরা শেরক করেছ। এই হাদীস বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে।

মসনদে আহমদে অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, হযরত আনাস এবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ একজন জান্নাতবাসীকে আল্লাহর দরবারে হাযির করা হবে। আল্লাহ পাক তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কেমন স্থান পেয়েছ? সে জবাব দেবে হে আল্লাহ! অত্যন্ত উত্তম স্থান পেয়েছি। আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করবেন, আর যদি কোন আকাঙ্খা তোমার মনে থাকে তাহলে তা বল। তখন সে বলবে হে আল্লাহ! একটি আকাঙ্খা রয়েছে আর তা হলো আমাকে পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হোক এবং এমন অবস্থায় যে আমি তোমার পথে জেহাদ করে শাহাদাত বরণ করবো পুনরায় আমাকে জীবন দেয়া হোক অতঃপর আমি আবার শাহাদাত বরণ করি। এভাবে দশবার আমাকে সুযোগ দেয়া হোক, কেননা সে ব্যক্তি শাহাদাতের ফজিলত দেখেছে। এমনিভাবে একজন দোযখীকে আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কেমন স্থান পেয়েছ? সে বলবে অত্যন্ত মন্দ স্থান। আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, সারা বিশ্বের স্বর্ণ দিয়ে তুমি দোযখ থেকে নাজাত লাভ করা পছন্দ করবে? সে আরয করবে, জ্বী হ্যাঁ অবশ্যই। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ তুমি মিথ্যাবাদী, কেননা আমি তোমার নিকট এর চেয়ে কম এবং অনেক সহজ জিনিস চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি তা করোনি। অতঃপর লোকটিকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।[১]

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) বলেছেনঃ কাফের তিন প্রকার–

(১) যারা কুফর বা আল্লাহর নাফরমানী থেকে খাঁটি তওবা করে তাদের সম্পর্কে পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

১। তফসীরে এবনে কাসীর খন্ড-৩, পৃষ্ঠা- ৭৯-৮০

(কিন্তু যারা তওবা করেছে এবং নিজেদের সংশোধন করেছে। নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময়।)

(২) যে সব কাফের তওবা করে আর সেই তওবাতেও থাকে মুনাফেকী তাদের সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ

(তাদের তওবা গ্রহণযোগ্য হবে না।)

(৩) যে সব কাফের সারা জীবন কাফের অবস্থায় অতিবাহিত করে এবং কাফের অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করে তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ নিশ্চয় যারা কাফের হয়েছে এবং কাফের অবস্থাতেই মৃত্যু বরণ করেছে তারা যদি সারা বিশ্বের সম পরিমাণ স্বর্ণ নিজেদের মুক্তির জন্যে দিতে ইচ্ছুক হয়, তবু তাদের শাস্তি এতটুকু লাঘব হবে না।

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

(এরা সেসব লোক যাদের জন্যে রয়েছে কঠোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।)

وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ

আর তাদের কোন সাহায্যকারী হবে না, যার মাধ্যমে শাস্তি লাঘব হতে পারে, বরং তারা চিরকাল দোযখের শাস্তি ভোগ করবে।[১]

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন ঃ প্রশ্ন হতে পারে যে, একথা সর্বজন বিদিত কেয়ামতের দিন কাফেরদের নিকট একটি কপর্দকও থাকবেনা এমনি অবস্থায় কাফেরদের নিকট থেকে পৃথিবীর সম পরিমাণ স্বর্ণও গ্রহণ করা হবে না, একথার তাৎপর্য কি?

এ প্রশ্নের দুটি জবাব রয়েছে ঃ

(১) আয়াতের অর্থ হলো যদি কাফেরের কুফরের অবস্থায়ই মৃত্যু হয় আর সে তার জীবদ্দশায় পৃথিবীর সম পরিমাণ স্বর্ণ দান করে তবুও তা গ্রহণযোগ্য হবেনা, কেননা কাফের বা অবাধ্য অবস্থায় কোন এবাদত গ্রহণযোগ্য হয় না। আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কোন নেক কাজ কবুল হওয়ার জন্যে ঈমান পূর্বশর্ত।

(২) আলোচ্য আয়াতে একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। আর "যাহাব" বা স্বর্ণের তাৎপর্য "সর্বাধিক মূল্যবান বস্তু", এমনি অবস্থায় আয়াতের অর্থ হলো যদি কোন কাফের কেয়ামতের দিন সর্বাধিক মূল্যবান বস্তুর মালিক হয়, আর সে তা

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৩১

দোযখের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্যে ব্যয় করতে ইচ্ছুক হয় তবু তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অতএব, তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এ শাস্তি থেকে রেহাই পাবার জন্যে অর্থ-সম্পদ কোন প্রকারেই উপকারী হবে না। হয়তো কারো মনে ধারণা হতে পারে যে দুনিয়াতে যেমন বিপদগ্রস্ত মানুষ পরস্পরের সাহায্যে বিপদমুক্ত হয়, হয়তো আখেরাতেও এমন ব্যবস্থা হতে পারে। এ সম্ভাবনাও যে নেই তার ঘোষণা রয়েছে পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّصِرِينَ

এবং তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবেনা। অতএব, তাদের শাস্তি অবধারিত (আল্লাহ পাক আমাদেরকে রক্ষা করুন)।

আলহামদুলিল্লাহ! তফসীরে নূরুল কোরআনের তৃতীয় খন্ড সমাপ্ত হলো।

হে আল্লাহ! কবুল করুন। ভুল ত্রুটি মাফ করুন।

(তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত)